বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং দাজ্জাল

১ম খন্ড

মাওলানা আসেম উমর

আপনি কি জানেন.....?

- *সাম্প্রতিক চলমান যুদ্ধসমূহ কি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভূমিকা..?*
- *দাজ্জালের ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন ? আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে আপনি কতটুকু জ্ঞান রাখেন !*
- *দিনদিন অবনতি হতে যাওয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার সাথে দাজ্জালের কোন সম্পর্ক আছে কি ?*
- *মুসলিম ব্যবসায়ী ও কৃষক ভাইদের সফলতা কিভাবে সম্ভব..!!*
- *বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের অজানা গুপ্তরহস্য সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন..!!*
- *ফ্লাইং সোসার্স কি এবং দাজ্জালের সাথে এর কি কোন সম্পর্ক রয়েছে..?*
- *ভারত কি অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ মুসলমানদের দখলে চলে আসবে ?*
- *মিডিয়ার প্রচারকৃত মিথ্যা প্রোপাগান্ডা থেকে নিজেকে আপনি কিভাবে রক্ষা করতে পারেন..!*
- *ইমাম মাহদী প্রকাশের পর আপনি কি ইমাম মাহদীর বাহিনীর সাথে হবেন ? নাকি আমেরিকা এবং তার মিত্রদের সাথে ?*
- *আপনি যদি ইমাম মাহদীর সাথেই থাকার ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সময়ে ইমাম মাহদীর বাহিনীকে শক্তিশালীকারী দলকে কেন সহযোগীতা করছেন না..!!*

সূচী......

দ্বিতীয় অধ্যায়..

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের নিদর্শনাবলী..

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, দাজ্জালের সহযোগী..

لا إله إلا الله
الله
رسول
محمد

পঠনের পূর্বে কিছু কথা

রহস্যময় বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে লেখার মাধ্যমে আপনার জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধি করা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সা. এর ঐ শিক্ষার উপর আমল করা উদ্দেশ্য, যা তিনি জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামকে বিভিন্ন ফেতনা সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য দিতেন। নবী করীম সা. সদা উম্মতের ভবিষ্যত ফিকির নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, যদ্দরুন সাহাবায়ে কেরামকে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল ফেতনা সম্পর্কে অবহিত করে তাদেরকে বারবার সতর্ক করতেন। শুধু সতর্কই নয় বরং যেখানে ফেতনার আশংকা করতেন, নিজে সেখানে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে ফেতনার বিবরণ শুনাতেন। মদীনায় এক ইহুদী ছেলের মাঝে দাজ্জালের আলামত প্রকাশের কথা শুনে স্বয়ং নবিজী সা. তার ব্যাপারে যাচাই করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে ছেলের বাড়ী পর্যন্ত গিয়েছিলেন, চুপিসারে তার ব্যাপারে তদন্ত করতেন, তার মতিগতি লক্ষ্য রাখতেন। তেমনি হযরত উমর রা. স্বীয় খেলাফতকালে যখন জানতে পারলেন- ইয়েমেনে টিড্ডি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, ভিষন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এবং পরিস্থিতি তদন্তের জন্য বিশেষ টিম প্রেরণ করেছিলেন। কারণ টিড্ডি বিলুপ্ত হওয়া কেয়ামত ঘনিয়ে আসার একটি অন্যতম নিদর্শন।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল, শয়তানী সমুদ্র এবং ফ্লাইং সোসার্স সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে, কিন্তু এ সকল গ্রন্থ আর বিবরণ শুধুমাত্র অলৌকিক কিছু ঘটনা বর্ণনা করে অথবা বেশি থেকে বেশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এর বিশ্লেষণ করে। মুসলিম গবেষকদের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ ঈসা দাউদ মিসরী'ই বারমুডা এবং ফ্লাইং সোসার্স নিয়ে সুগভীর গবেষণা করে বিষয়টিকে হাদীসের আলোকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টান্ত একজন দোকানদারের ন্যায়; যে তার সওদা বিক্রির আশায় বিভিন্ন পায়কার থেকে মালামার সংগ্রহ করে তা বিক্রির চেষ্টা করে। নিজের এই সওদাটুকু হচ্ছে "উম্মতের দরদ"। এই সামান্য দরদকে স্বীয় মুসলিম ভাইবোনদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার আশায় মনের ছোট্ট গহীনে যে পন্থাই দৃষ্টিগোচর হয়েছে সে তাই বেছে নিয়েছে। অন্যথায় বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলই কি আর ফ্লাইং সোসার্স অধিপতিরাই বা কোন জাতি ??।। ছোট্ট একটি জীবন, যা মহান আল্লাহ তা'লা আমানতস্বরূপ দান করেছেন, যখন ইচ্ছা ডাক দিয়ে কাছে নিয়ে নেবেন। প্রত্যেককেই নিজ কর্মের জবাবদিহিতা খোদার সামনে করতে হবে। এ দরদটুকু আরো বেড়ে যায় যখন বিবেকবান শিক্ষিত ব্যক্তিদের দেখি তারাও দলে দলে এই মতিভ্রষ্টতার দিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। পরিস্থিতি না কুরআনী দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করছে, না প্রিয়নবী মুহাম্মদ সা. এর বাতানো হাদীসসমূহ দ্বারা বর্তমান প্রেক্ষাপট বুঝার চেষ্টা করছে। বিবেকবান ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাচেতনা আর ভবিষ্যতবাণী শুনলে কখনো আসে হাসি আর কখনো কান্না। এভাবে হক আর বাতিলের বিষয়ে স্বীয় কথা আর কাজের মাধ্যমে সে দাজ্জালের সৈন্যদের সাহায্য করছে আর ইমাম মাহদী আ. ও তার মুজাহিদীনের অন্তরে দুঃখ আর বেদনার ষ্টীম রুলার চালাচ্ছে।

গ্রন্থটি দুটি ভাগে লিপিবদ্ধ হয়েছে, প্রথম ভাগের তিনটি অধ্যায়ে যথাক্রমে শয়তানী সমুদ্র, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং ফ্লাইং সোসার্স নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে ফেতনা সম্পর্কে মহানবী সা. যে সকল ভবিষ্যতবাণী আর সতর্কবাণী করেছেন তার বিবরণ দেয়া হয়েছে। লেখক এ গ্রন্থে ঐ হাদীসসমূহ পূণরোল্লেখ করেননি, যেগুলো দ্বিতীয় গ্রন্থ "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং ইমাম মাহদী আ. এবং দাজ্জালের বিষয়ে যদি কোন পাঠক বিস্তারিত আরো তথ্য জানার আগ্রহ করেন তবে দ্বিতীয় গন্থটি অধ্যয়নের অনুরোধ রইল। এখানে যতদূর আমার গবেষণার সম্পর্ক- দাজ্জাল বারমুডার ট্রাইএঙ্গেলে নাকি শয়তানী সমূদ্রে ? ফ্লাইং সোসার্স এর প্রকৃত গডফাদার সে নাকি অন্যকেউ ? এ ধরনের যাবতীয় আলোচনা আর গবেষকদের বিভিন্ন মতামতগুলোকে আমি এখানে একত্রিত করেছি। কেননা দাজ্জাল আবির্ভাবের প্রকৃত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'লারই জানা। তাই অধমের এ ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ী নেই। তবে হ্যাঁ... কারো মতামত যদি হাদীসের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে তা বর্ণনা করেছি। ফ্লাইং সোসার্সের ব্যাপারেও আমি একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছি।

সুতরাং গ্রন্থে বর্ণিত গবেষকদের মতামত আর দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে কারো কাছে যদি কোরআন-

হাদীসের কোন দলীল বিদ্যমান থাকে, তবে সেটাই অধিক গ্রহণযোগ্য। অধমের আসল উদ্দেশ্য- এ ভয়ানক ফেতনার অনুভূতি সরলমনা মুসলমানদের অন্তরে জাগিয়ে দেয়া যা তাদের ঘরের বারান্দা পর্যন্ত ইতিমধ্যে পৌছেঁ গেছে এবং ঘরের দরজার জিঞ্জিড় খটখটিয়ে জিজ্ঞেস করছে- হক আর বাতিলের সর্বশেষ এ মরণযুদ্ধে তুমি কার সাথে ? দাজ্জাল ফ্লাইং সোসারে করে উড়ে আসুক বা প্রকৃত গাঁধায় চড়ে আসুক, সে শয়তানী সমুদ্রে হোক বা ইস্ফাহানে, আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি তার সাথে সাক্ষাত করুক বা না করুক; এ নিয়ে আমাদের কিছু যায় আসেনা। কিন্তু ঐ ভবিষ্যতবাণীগুলো অবশ্যই সত্য যা আমাদের প্রিয়নবী সা. দাজ্জাল এবং তার শক্তিসামর্থের ব্যাপারে উম্মতের সামনে বর্ণনা করে গেছেন। দাজ্জাল থেকে নিজেকে রক্ষা করা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং সামনে আসলে তার মুখে থুথু মারা সকল মুসলমানের জন্য ফরজ। আর এই ফরজ বিষয়টিকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

কিছু বন্ধুবান্ধব আমার দ্বিতীয় গ্রন্থ "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল" পড়ার পর বলেছে যে, এতে খুবই ভয় দেখানো হয়েছে আর তা পাঠকালে অন্তরে অত্যাধিক ভীতির সঞ্চার হয়।

প্রথমতঃ মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে অনেক ভীতি প্রদর্শণ করেছেন, যাতে উম্মত এ ফেতনাকে কখনো অবহেলার দৃষ্টিতে না দেখে। সাহাবায়ে কেরাম যখন দাজ্জালের ফেতনা সম্বলিত হাদীসগুলো শুনতেন, তারাও ভয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। তাই বিষয়টিই এরকম; যা পড়ে অবশ্যই ভীত হওয়া উচিত। ভয় আসাটাই সাক্ষী যে, আপনি একজন মুমিন, ঈমান রক্ষার ফিকির আপনার ভেতরে আছে। দ্বিতীয়তঃ লেখকের উদ্দেশ্য ভয় দেখানো নয়; বরং সতর্ক করা, যাতে এ মহাঅন্ধকার ফেতনা থেকে বাঁচার প্রস্তুতি গ্রহণে বিলম্ব না করা হয়। ভীতি প্রদর্শন এই অর্থে নয় যে, আপনি ভেঙ্গে পড়বেন। তাই এ পেরেশানী দূর করার জন্য লেখক জিহাদ ও মুজাহিদীনের তরতাজা বিজয়সমূহেরও বর্ণনা এনেছেন, যাতে বিশাল দাজ্জালী শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে জ্ঞান হওয়ার পর জানতে পারেন যে, এত কিছুর পরও ময়দানের পরিস্থিতি কি; এবং বিজয় কাদের পদচুম্বন করছে। তাই দাজ্জালের ফেতনা এবং তার সংগঠনসমূহের শক্তির ব্যাপারেও অবগত হোন, পাশাপাশি রণাঙ্গন থেকে আসা (মুজাহিদীনের মুখে, মিডিয়া কর্তৃক নয়) সংবাদগুলোও শুনেন। মহান রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করেন, যে মুজাহিদীনের এ ক্রান্তিকালেও আল্লাহ ইমাম মাহদীর সৈন্যদলকে ক্রমেই শক্তিশালী করছেন।

স্মরণ রাখবেন !! ফেতনাসমূহ থেকে বাঁচার জন্য যদি কোন দ্রুত ব্যবস্থা না নেয়া হয়, তবে মূলসময়ে ঈমান রক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে। ইমাম মাহদী এবং দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসসমূহ অধ্যয়নের পর আপনার অন্তর সাক্ষী দেবে যে, যে যুগের মধ্য দিয়ে আমরা অতিক্রম করছি, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যুগ। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যদি আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হন, তবে অদূর ভবিষ্যতে ঘরবাড়ী, এলাকা ও মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোকে রক্ষা করা আপনার কঠিন হয়ে পড়বে।

গ্রন্থ পড়ার পর যতবেশী মানুষ পর্যন্ত সম্ভব, আপনি আপনার পয়গাম পৌঁছিয়ে দেবেন; অবশ্যই পৌঁছাবেন।। বন্ধুবান্ধবকে হাদীসের আলোকে পরিস্থিতি বুঝার দিকে আহবান করবেন। ঘরে নিজের স্ত্রী-সন্তানদেরকে দাজ্জাল এবং তার শক্তির ব্যাপারে অবহিত করেন।

শুধুমাত্র দোস্ত-আহবাবের সহযোগীতার কল্যাণে আজ গ্রন্থটি আপনাদের হাতে। দুনিয়াবী ব্যস্ততার দরুন বেশী সময় ব্যয় করতে পারিনি। কোন ভুল দৃষ্টিগোচর হলে লেখকের জ্ঞানশূন্যতাই দায়ী। অনেকেই কিতাব প্রস্তুতকরণে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছে; বরং কেউ কেউ তো জোরপূর্বকভাবেই গ্রন্থ লেখিয়েছেন।

আল্লাহ তা'লা তাদের অন্তরে জান্নাতের বাসনা পয়দা করে দেন। আল্লাহর দরবারে হাত উঠানোর সময় দাজ্জালী শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থানকারী মর্দে মুজাহিদদের অবশ্যই স্মরণ করবেন। আল্লাহ এবং তার রাসূলের দুশমনের বিরুদ্ধে বদদোয়া করবেন যেন আল্লাহ তা'লা তাদের চক্রান্তকে তাদেরই ধ্বংসের উপকরণ বানিয়ে দেন।

অধম গুনাগারকেও দোয়ার মধ্যে শরিক রাখবেন। নিজের এই দুদোল্যমান জীবনের ছোট্র তরীটি

দূরাবস্থার ভাসমান তরঙ্গমালার ভীড়ে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। দোয়া করবেন- শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির স্থায়ীবাহক ও সুসংবাদ প্রদানকারী কোন তরঙ্গ এসে যেন এটাকে প্রত্যাশিত ঠিকানায় পৌঁছে দেয়।

মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে আমার প্রার্থণা- তিনি যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটিকে শুধুমাত্র তার রেযামন্দির জন্য কবুল করেন এবং উম্মতে মুসলিমার জন্য তা উপকারের পাথেয় বানান। (আমীন.........)

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

হক আর বাতিলের সারিগুলো খুব দ্রুত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বহু মানুষ ও জনগোষ্ঠী প্রকাশ্যে বাতিলের লসকরের সাথে নিজের ভবিষ্যত চুক্তি করে বসেছে। পুরাতন সংগঠনগুলোও অনেক সুসংগঠিত হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত যে মুখগুলো চুপ ছিল তাও এখন কারো না কারো বিরুদ্ধে খুলতে শুরু করেছে। কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা সরাসরি নয়; বরং কোন না কোন মাধ্যমে তার মুখ, কলম বা চেষ্টা দাজ্জালের বাহিনী শক্তিশালী করার মধ্যে ব্যয় হচ্ছে, যদিও তার অন্তর বিষয়টিকে পুরোপুরি অস্বীকার করছে ।

যে সকল লোক প্রকাশ্যে দাজ্জালের বহিনীর সামনে মাথা নত করার জন্য মুসলিম উম্মাহকে আহবান করছে তারা গোপনে বা মাথা ঢাকা দিয়ে নয়। পোঁজভর্তি যখম থেকে পোঁজ টপকানোর ন্যায় প্রতারণা তাদের লম্বা জিহবা থেকে টপটিকেয় পড়ছে। ইসলামী শাসনব্যবস্থা দূরে ঠেলে দিয়ে কুফরী শাসনব্যবস্থাকে গলায় পরে নেয়া হয়েছে, কালেমা তথা মুসলমানদের ছেড়ে ইহুদী-হিন্দু-খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে, ভারতের ব্রাহ্মণগোষ্ঠী এবং আমেরিকার ইহুদীদের ব্যথা শরিরে মেখে নেয়া হয়েছে। অপরদিকে ইসলামের জন্য জান কোরবানকারীদের বিরুদ্ধে বিশাক্ত তীর গোলা, কামান আর পরমাণূ বারুদের গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

এই প্রকৃতির লোকেরা নিজেদেরকে দাজ্জালের কাতারে দাড় করিয়েছে। মুসলমান নামটা শুধু এ জন্য অবশিষ্ট রেখেছে, কারণ সে মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করছে। যদিও তার মনের বাসনা হচ্ছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকেও একে একে নিঃশেষ করে ওদের নামে করে দেয়া হোক। মুসলমান জাতিকে ব্রাহ্মণদের গোলামীতে আবদ্ধ করা হোক। এছাড়া যে সকল লোক গণতান্ত্রিক বা সরকারী পদের লোভ-চক্করে ফেসে আছেন, তাদের এখনই ভাবা উচিত যে, এই গণতান্ত্রিকতার মূলকড়ি কার হাতে ? পেছনে দাড়িয়ে কে এই ছড়ি ঘুরাচ্ছে ? কার ইশারায় সরকার প্রতিষ্ঠিত আর পরিবর্তিত হয় ? কার কথায় সারা বিশ্বের মিডিয়াজগত (সরকারী বা বেসরকারী) "গোপন শক্তি"র চাহিদামত নির্বাচনের পূর্বেই নির্দিষ্ট পার্টির গুণ গাওয়া শুরু করে।

আর আমরাই না কত সাধারণমনা!! এক দিক দিয়ে সারাবিশ্বকে গ্লোবাল ভিলেজ মেনে নিয়েছি আর অন্যদিক দিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপারে এ ধারণা করছি যে, নির্বাচনে বিজয়ী সরকার তো জনসাধারণের সমর্থন আর ভোট দ্বারা বিজয়ী হয়েছে। বাস্তবে এর সবকিছুই হচ্ছে দাজ্জাল কর্তৃক দাজ্জালী মিডিয়ার ধোকা।

আমাদেরকে একটি ব্যাপার ভাল করে বুঝতে হবে যে, ওই গ্লোবাল ভিলেজ নামক তৈরীকৃত নয়া পৃথিবীতে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোন থেকে পাকিস্তান দাজ্জালের জন্য খুবই গুরুত্ব বহন করে। আর তাই পাকিস্তানকে আয়ত্বে রাখার জন্য তার সংগঠনসমূহ বিশেষতঃ আইএমএফ (বিশ্ব ব্যাংক) ও ফ্রেমেসনসহ সকলের দৃষ্টি এদিকে যে, পাকিস্তান যেন আমাদের সংঘের ভিতরে থাকে, যাতে করে এতদাঞ্চলে অবস্থিত দাজ্জালের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে লড়াই করা সহজ হয় এবং ইমাম মাহদীর দলকে শক্তিশালী করার জন্য গমণকারীদেরকে এখান থেকেই যেন শেষ করে দেয়া যায়। দাজ্জালের কাছে পাকিস্তান বিশেষ গরুত্ব বহন করার দ্বিতীয় কারণ- এতদাঞ্চলের মুজাহিদীন দাজ্জালের ঘনিষ্ঠ সংগঠন ভারতকে পরাজিত করে সারা হিন্দে ইসলামের পতাকা উড্ডিন করবে। তাই পাক-আফগান অঞ্চলে কোন সৈন্যদল শক্তিশালী হওয়া মানেই হল দাজ্জালবাহিনীর মওতের ছামান। একারণেই পাকিস্তানে অবস্থিত দাজ্জাল গোলামদের একটাই প্রচেষ্টা- পাকিস্তানী সৈনিকেরা যেকোন মূল্যে এ মুজাহিদীন গোত্রকে মেটানোর বৃথা চেষ্টায় নিমজ্জিত থাকুক।

আর মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দিকে তাকালে মন সাক্ষী দেয়, যতদূর সম্ভব- দাজ্জাল এদের প্রতি খুশিই হবে। কারণ সরকারী ঐ পদ সমূহে বসে তারা দাজ্জাল আগমণের পথই সুগম করছে। যেখানেই কোন ইসলামী সংগঠন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে সেখানেই একে দমন করার জন্য দাজ্জালের

চাহিদামত তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর বাহ্যিক, আভ্যন্তরীণ এবং অর্থনৈতিক পলিসি দাজ্জালের মর্জিমতই চলছে। কোন ব্যাপারেই কোন বাধার সম্মুখিন হচ্ছেনা। বিশেষ করে পানীয় দ্রব্যাদীর ব্যাপারে তারা দাজ্জালের ওই পলিসির উপর এত কঠোরভারে আমল করছে যে, তারা চায়- প্রতিটি মুসলমান যেন প্রতিটি ফুটা পানির জন্য ওদের মুখাপেক্ষি হয়ে যায়। এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কাফের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বাঁধ বানিয়ে তারা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের নদী আর সমুদ্রগুলো শুকানোর প্রোগ্রাম শুরু করেছে। এভাবে সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, জর্ডান, ফিলিস্তিন এবং মিসরের সমস্ত সাগর-নদীগুলোকে পানিশূন্য করার প্ল্যান বাস্তবায়ন তারা ইতিমধ্যেই শুরু করেছে। এ সকল রাষ্ট্রের নেতারা তাদের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ দাজ্জালের দয়ামায়ার উপর ছেড়ে দিয়েছে। আর আইএমএফের কার্যক্রমগুলো দেখলেও মনে হয়না যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করার জন্য এর বিরুদ্ধে কেউ উঠে দাড়াবে।

তবে দাজ্জালের জন্য আসল সমস্যা হচ্ছে এ রাষ্ট্রগুলোর মুসলিম জনসাধারণ। বিশেষত আফগানিস্তানের মধ্যে তালেবান, ইরাকের মুজাহিদ বাহিনী এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন গোত্র আল্লাহ তা'লার সাহায্যে দাজ্জালের বাহিনীকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানের সাধারণ মুসলমান আর পাকিস্তানের মহব্বতের দাবিদার লোকদের এই অনুভূতি এখনো হয়নি যে, আল্লাহ তা'লা ইসলামী সংগঠনগুলোকে শুধু শক্তিশালীই করেননি; বরং একসাথে কয়েক দাজ্জালের সাথে লড়াই করার জন্য তাদের দাড় করিয়েছেন।

উত্তর পাকিস্তানে বড় একটি ইহুদী চক্রান্ত বাস্তবায়নের প্রোগ্রাম চলছে, যেদিকে জনসাধারণের কোন খেয়াল নেই। এই ষড়যন্ত্রের প্ল্যান ইস্ফাহানী ইহুদী আগাখান ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাথে মিলে প্রস্তুত করেছে। তাদের উদ্দেশ্য পুরো পাক-আফগান ভূখন্ডকে এক করে নতুন এক "আগাখান স্টেট" নির্মাণ করা। যার সীমানা উত্তর পাকিস্তানের "জাত" এলাকা থেকে শুরু করে আফগানিস্তানের কুনাড ও নুরিস্তান প্রদেশ হয়ে তাজিকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। কুনাড ও নুরিস্তান প্রদেশে আমেরিকা আগেই সেনাবাহিনী মুতায়েন করেছে। ২০০৭-২০০৮ সাল ওই প্রদেশে মুতায়েনকৃত বাহিনীর জন্য খুবই ধ্বংসাত্মক অতিবাহিত হয়েছে। আর এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ পাকিস্তানকে বিশেষ অপরেশনের তাগিদ দিয়েছিল।

আফগানিস্তান এবং এতদাঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠির সামর্থ্য সম্পর্কে দাজ্জাল খুব ভাল করেই জানে। আর তাই তার সংগঠনসমূহের মুখে যখনই আপনি শুনবেন যে, এখানে বিদ্যমান ইসলামী সংগঠনসমূহ গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বড় বাধা, তখন এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- এই ইসলামী সংগঠনসমূহের বর্তমানে দাজ্জালী স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এদেরকে নিঃশেষ না করা গেলে না ইমাম মাহদীর দলকে দমন করা যাবে, না আগাখান ষ্টেট প্রতিষ্ঠা করা যাবে আর না ভারতকে সম্মুখ পরাজয় থেকে বাঁচানো যাবে। আর তাই পাকিস্তানে অবস্থিত পাক দুশমনেরা এই জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করছে। বিপরীতে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ আশ্রয়স্থল হিসেবে ভারত ও আমেরিকাকে অধিক নিরাপদ মনে করে এ এলাকাগুলোকে পাকিস্তানের অস্তিত্বের জন্য হুমকিস্বরুপ দাবী করছে। তাদের একটা কথা স্পষ্ট করে জেনে রাখা দরকার যে, এ সংগঠনসমূহকে আল্লাহ পাক সৃষ্টিই করেছেন এ ক্ষুদ্র অঞ্চলের মজলুম জনসাধারনের জান, মাল ঈমান ও ইজ্জত হেফাজত করার জন্যে। নিকট ইতিহাস এর সাক্ষী। অদূর ভবিষ্যতেও আল্লাহ তা'লা এ মজলুম মসলমানদের রক্ষার্থে আফগান জাতির মাধ্যমে যে চ্যালেঞ্জ বাস্তবায়ন করে দেখাবেন তার বিস্ফোরণে সকল মুনাফিকের কলিজা ফেটে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে।

সামনের ভয়ানক এ কঠিন পরিস্থিতির ভবিষ্যদ্বাণী তো সকলেই করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়- হাদীসের আলোকে এগুলো বিশ্লেষণ করে এ থেকে বাঁচার উপায় খুব কম মানুষই তালাশ করছে। যেমনিভাবে নূহ আ. এর যমানায় তুফান থেকে বাঁচার জন্য উপায় একমাত্র নূহ আ. এর কিশ্তি ছিল, ঠিক তদ্রুপ বর্তমান যমানায় কওমে আফগান হচ্ছে মুসলমানদের জন্য ঐ ভয়ানক ফেতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র বাহন। মুসলিম জাতির প্রকৃত পরিচয় ইহুদী এবং হিন্দুরা খুব ভাল করেই জানে এবং তাদের কিতাবে আজও এ মহান

উম্মতের কথা স্পষ্ট বিদ্যমান। কিন্তু পাক মুনাফিক (যারা সর্বদায়ই মুসলমানদের মুকাবেলায় ভারতকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে) তারা বিষয়টি কখনোই উপলব্ধি করতে পারেনা- তারা গতকাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের কারণে পেরেশান ছিল। আজ দাজ্জালের গোলামেরা তাদের অন্তরে এই কুমন্ত্রণা গেড়ে দিয়েছে যে, অল্পকিছু অপেক্ষা কর, এতদাঞ্চলের এ কট্টর জনগোষ্ঠীর নিশানা মাটির সাথে মিশিয়ে মার্কিন-ভারতীয় পতাকা উড্ডীন করা হবে। তাদের মনের বাসনা হচ্ছে- এ কঠোর সংবিধানকে এখানেই নিঃশেষ করা হোক, যাতে মাদকদ্রব্য পান আর ভারতীয় নর্তকী ভোগের জন্য তাদের আর মুম্বাই না যেতে হয়।

এটা হচ্ছে শুধুই শয়তানী কুমন্ত্রনা, যা তার গোলামেরা বুঝতে ভুল করেছে। এটাই বাস্তব কথা- শয়তান আর দাজ্জালের গোলামদের বানানো সংবিধানগুলো মিটানোর সময় এসে গেছে। কাশ্মিরের খুনরাঙ্গা ইতিহাসের জবনিকা টানার সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। মুনাফিকদের ধারণানুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক নয়। এ ইতিহাস ঐ সকল মর্দে মুজাহিদীনের পায়ের দ্বারাই পিশে ফেলা হবে, যাদের মাধ্যমে বরাবরই শয়তানী শক্তি পিশে ফেলার ইতিহাস হয়। অখন্ড ভারতের স্থলে এক নতুন পাকিস্তানের জন্ম হবে, যা এখানে থেকেই স্বীয় মাথা উচুঁ করে পৃথিবীর সামনে আবিভূত হবে, না ভারতীয় অত্যাধুনিক টেকনোলজী একে বাধা দিতে পারবে, না পাকিস্তানে অবস্থিত ব্রাক্ষণগোলামেরা এর কিছু করতে পারবে।

এ কথাগুলো ঐ সকল বুদ্ধিজীবীদের জন্য খুবই আশ্চর্যের মনে হবে, যারা বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসগুলো অধ্যয়ন করেনি। যাদের জ্ঞানের ভিত্তি শুধুমাত্র দাজ্জালী মিডিয়ার রিপোর্ট, সংবাদ আর পশ্চিমা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রেক্ষাপট মহানবী সা. এর বাতানো হাদীসের আলোকে বুঝে তারপর পলিসি বানানো হয়, তাহলে দাজ্জালের সব ধোকা আর প্রতারণা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। বুঝতেও পারবেননা- যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ বাহ্যিক অবস্থা আর পশ্চিমা মিডিয়ার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ ও জনমনে আতংক ছড়াতো তারাই পর্দার পিছনে চলে যাবে।

বর্তমান সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়। হক-বাতিলের মধ্যকার চলতি লড়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। প্রত্যেক মুসলমান অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে বেশি অবগত যে, তার অন্তরে কোন জিনিসের মহব্বত সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান। প্রত্যেকেরই জানা যে, সে তার ঈমানকে কতটুকু ভালবাসে এবং কি পরিমাণ মূল্য দিয়ে সে তার ঈমানকে রক্ষা করতে পারবে।

প্রত্যেক মুসলমান যেন এখনই চিন্তা করে যে, সে কোন দলের অংশ হতে চায়। এক দিকে হক আর অপরদিকে বাতিল। একদিকে আমেরিকা দাজ্জালের কাতারে দাড়ানোর জন্য মানুষকে আহবান করছে অপরদিকে জিহাদের ময়দান হতে মুষ্টিমেয় কিছু অপরিচিত লোকের তাকবীর ধ্বনি ভেসে আসছে। উলামাগণ খুব ভাল করেই জানেন- এহেন পরিস্থিতিতে তাদের উপর কিরূপ দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার কথা। আপনি যখন এই কথা স্বীকার করছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি বিগত চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতি এবং এটা একটা বিশেষ মুহূর্ত যেখানে উম্মতে মুহাম্মদী প্রবেশ করেছে, তাহলে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে আপনি কেন ঘাবড়াচ্ছেন। পরিস্থিতি যেহেতু কঠিন, সিদ্ধান্তও তবে কঠিনই নিতে হবে। তাহলেই আপনি নিজেকে এবং জাতিকে এথেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন।

অফিসারদেরকে ঘর থেকে বের হতে হবে। সরকারকে বাধ্য করতে হবে যে, গলায় লটকানো মার্কিন ঐ নিশানটুকু এখনই খুলে ফেলুন, যাতে এমনটা না হয়- কেয়ামতের দিন ঐ নিশান সহই আপনাকে উঠানো হবে। সাথে সাথে পাকিস্তানের সমস্ত মুসলমানদের এটাও ভাবতে হবে যে, ইমাম মাহদী আ. এর আবির্ভাব যদি হয়েই যায়, তবে ঐ সময়ও কি সরকার মার্কিন সংগঠনের হয়েই যুদ্ধ করে যাবে ??।

পারভেজ মুশাররফের জারিকৃত ঐ পলিসি থেকে পাকিস্তানকে মুক্ত করার মধ্যেই পাকিস্তানের সফলতা এবং কামিয়াবি। এটার মধ্যেই আখেরাতের ভালাই। এতদাঞ্চলে অবস্থিত সকল দাজ্জালী শক্তিই মুসলমানদের দুশমন। তারা যে কোন মূল্যে এদেরকে নিঃশেষ করতে চায়। আপনি যদি চান যে, আপনার

কাজেও কোন সমস্যা হবেনা পাশাপাশি উচ্চ পর্যায়ের কেউই আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেনা- এটা অসম্ভব। বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেক সামলানোর জন্য কিছু বিশেষ সিদ্ধান্ত আর দৃঢ় পদক্ষেপের প্রয়োজন পড়ে। আর এখনই বিশেষ সিদ্ধান্ত নেবার সময়। যদি সরকার পাকিস্তানকে বিক্রির জন্য একমত হয়ে যায়, তাহলে আপনিও কি ব্রাহ্মণদের গোলামী করার জন্য তাদের সাথে একমত হবেন। হ্যাঁ পাকিস্তানে কিছু দেশদরদী লোক এখনও আছে যারা ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রকে রুখার চেষ্টা করছে। সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি আর জনসাধারণের মধ্যে যৎসামান্য লোকই এই ষড়যন্ত্র টের পেয়েছে। অপরদিকে পাকিস্তানের জাতশত্রু পাকিস্তানের প্রতিটি অংশে রন্ধ্রে রন্ধ্রে কবজা করতে সক্ষম হয়েছে। বড় বড় টিভি চ্যানেল, প্রসিদ্ধ লেখক-সাংবাদিকগণও আজ দেশদরদী জনসাধারণের কন্ঠকে আস্তে আস্তে বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে। মুম্বাই হামলার সময় মনে হয়েছিল যে, দুশমন পূণরায় পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হবে। পাকদরদীগণও সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় অন্য কোন সংগঠন হয়ত দেশকে আয়ত্ব করে ফেলেছে। আর মুশাররফ তো পূর্বেই সবকিছু ধ্বংস করে তাদের রাস্তা প্রসস্তই করে রেখে গিয়েছিল।

এমন সময় হকপন্থী উলামাগণের দেশদরদী মুসলমানদের সাথে মিলে ঘোষনা করে দেয়া উচিত ছিল (যা এখনও ঘোষনা করা হয়নি) যে, সমস্ত পাকিস্তানকে বলে দেয়া উচিত- পাকিস্তানে অবস্থিত ইসলামী সংগঠনগুলো পাকিস্তানের অস্তিত্বের শত্রু নয়; বরং সামনের ভয়ানক তুফান আর মরনযুদ্ধ থেকে না শুধু ইসলাম ও পাকিস্তানকেই তারা রক্ষা করবে; বরং উপমহাদেশের সকল মুসলমানকে হিন্দু-ব্রাহ্মান আর দাজ্জালের গোলামী হতে নাজাত দেবে ইনশাআল্লাহ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এবং এখানকার মসজিদ-মাদ্রাসাগুলোকে হিন্দু-শিখদের আস্তাবলে রুপান্তরিত করার পথ সুগমকারীরা স্বয়ং সরকারের ভিতরেই বিদ্যমান। পাঞ্জাব এবং সিন্ধের ঈমানদার মুসলমানদের এ কথা ভালভাবে স্মরণ রাখা চাই যে, এ অলসতা আর গাফলতি যদি দিন দিন প্রলম্বিত হয়, তাহলে আফসোস করা ছাড়া আর কোন রাস্তা বাকী থাকবেনা।

ওহে মুসলমান ভাইয়েরা ! ইসলামের জন্য জান কুরবান যদি আপনার পছন্দ না হয়, আপনার দেশের প্রতিও এতটুকু মহব্বত অন্তরে না থাকে, তবে আপনার ঘর আর আল্লাহর দেয়া সন্তানদেরই একটু ফিকির করেন, আপনার জান-মাল-ক্ষেতখামার-ঘরবাড়ী নিয়েই একটু চিন্তা করেন। যদি অলসতা করে বসেন- তবে কিছুই বাকী থাকবেনা। এখানে আরেকটি কথা স্পষ্ট করা দরকার- আমাদের মনে একটি সুধারনা আছে যে, পাকিস্তান ইসলামের নামে স্বাধীন হয়েছে, তাই একে কেউ খতম করতে পারবেনা। হ্যাঁ এমনটাই হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যদি এ কথা সত্য হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তা'লা এই যমিনকে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তৈরী করেছেন, তাহলে এত উত্তম যমিনে আল্লাহ তা'লা-ও আমাদের মত কাপুরুষ, মুনাফিক আর এমন সুধারণাপোষনকারীদের কখনোই আশ্রয় দেবেননা। পাকিস্তান অবশ্যই পৃথিবীর মানচিত্রে কেয়ামত পর্যন্তের জন্যই মাথা উচুঁ করে জিয়ে থাকবে; বরং তার সীমানা কাশ্মির থেকে শুরু করে কুহেকাফ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এখানকার মানুষ (যারা এ মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জান কুরবান করতে দ্বিধাবোধ করে) তাদের সরিয়ে এদেশকে এমন কিছু নিষ্ঠাবান হস্তে সোপর্দ করা হবে, যাদের দেখে ১৯৪৭ এর শহীদী আত্মাগণ পর্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠবে।

"কম ছে কম মেরা নেহি বনতা না বন আপনা তো বন"

একথাগুলো যদিও অলসব্যক্তিদের জন্য দিবাস্বপ্ন মনে হয়। কিন্তু একদিন বিশ্ব ঠিকই দেখবে- পাকিস্তানে বসে মার্কিন ও ভারতীয় সংগঠনগুলো যে চক্রান্ত করছে, তা পাক মুসলমানদের ধ্বংসের ছামান। তাদের বিরুদ্ধে এখনই যারা উঠে না দাড়াবে, কেয়ামতের দিন চক্রান্তকারীদের মধ্যেই তাকে উঠানো হবে.. নাউযুবিল্লাহ।

আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ইসলামী দলগুলোকে আল্লাহ তা'লা দিনবদিন শক্তিশালীই করছেন। মার্কিন হোক আর ভারতীয় হোক বা পাকআভ্যন্তরীণ কোন মুনাফিক সাংবাদিক কলামিষ্ট হোক-

তাদের কথা, কলম আর ষড়যন্ত্র আল্লাহ তা'লার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সময়ই সফল হতে পারবেনা। আল্লাহ তা'লা আফগান জাতিকে ইমাম মাহদী আ. এর লস্কর হিসেবে নির্বাচন করেছেন এবং তাদের হাতেই সারা হিন্দুস্তানে ইসলমের পতাকা সমুন্নত করার ফায়সালা করেছেন। সুতরাং সমস্ত কুফরী শক্তি আর মুনাফিক শক্তি মিলেও কওমে আফগানকে কখনোই খতম করতে পারবেনা।

অধমের এ কথা যাদের বুঝে না আসে, না আসুক; তাতে কিছু যায় আসেনা। কিন্তু এ গুনাগার যে সকল উলামাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চায়, তারা অবশ্যই জানে যে, এতদাঞ্চলের মুসলমানদের হেফাজত আল্লাহ তা'লা স্বীয় শক্তি আর কুদরতের মাধ্যমেই করবেন। ঠিকযেমন পূর্ববর্তী লোকদের শহীদী খুনের বিনিময়ে ইসলাম রক্ষা করেছিলেন।

এ বিষয়ে লেখার মাধ্যমে লেখকের উদ্দেশও এটাই- মুসলমানদেরকে বর্তমান শংকা থেকে সতর্ক করে ঐসকল হকপন্থী দলের সাথে শামিল হওয়ার দাওয়াত দেয়া। বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল অথবা শয়তানী সমুদ্রে দাজ্জাল থাকুক বা না থাকুক। দাজ্জাল দ্রুত প্রকাশ হোক বা দেরীতে হোক; কিন্তু দাজ্জাল প্রকাশের পূর্বে যে ফেতনা সৃষ্টি হবে, তার মধ্যেই হক আর বাতিল পৃথক পৃথক হয়ে যাবে। যারা তার প্রকাশের পূর্বেই হকপন্থীদের কাতারে শামিল হয়ে যাবে, দাজ্জাল তাকে কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।

আল্লাহ তা'লা সকল মুসলমানকেই হকের লস্করে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। দাজ্জাল ও তার ভয়ানক ফেৎনা থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

আসেম উমর

১ম অধ্যায়

শয়তানী সমুদ্র, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং ফ্লাইং সোসার্স

শয়তানী সমুদ্র, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং ফ্লাইং সোসার্স এমন রহস্যময় বিষয়, যা আপনি বিভিন্নভাবে শুনে এবং পড়ে আসছেন। রহস্যময় ঘটনাবলী, ভয়ানক বিজ্ঞানী আর অবিশ্বাস্য সত্য ও বাস্তব কাহিনী সম্বলিত ঐতিহাসিক সাক্ষীসমূহকে এমনভাবে গড়বড় করে দেয়া হয়েছে যে, পাঠক পাঠান্তে কোন সঠিক ফলাফলে পৌছতে সক্ষম হচ্ছেনা। বরং তার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এটি এমন একটি অনানুভূবনীয় আকৃতি ধারন করে, যাতে থাকে কিছু তদন্ত, কিছু ভয়, জনমন আকৃষ্ট করার মত কিছু নতুন নতুন তথ্য আর বানোয়াট কাহিনী।

কিন্তু বাস্তবে তা আসলে কি ? এবং একজন মুসলমান হিসেবে এ বিষয়গুলিকে কোন দৃষ্টিতে দেখা উচিত ??। দুনিয়ার সামনে এ মুহূর্তে যা কিছু এ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এর সবই কি বানোয়াট নাকি বাস্তব ??!! যদি বাস্তবই হয়ে থাকে, তাহলে সমুদ্রের ঐ পানির ভিতরে এমন কি আছে যা আজ পর্যন্ত হাজারো মানুষকে গিলে ফেলেছে, অজস্র সামুদ্রিক জাহাজ তাতে গায়েব হয়েছে, কারো কাছে এর কোন জ্ঞান নেই ??!! তাহলে কি ইবলিসের সাথে ঐ এলাকার কোন সম্পর্ক আছে ??!! নাকি কানা দাজ্জাল ঐ এলাকায় বিদ্যমান ??!!

বড় বড় বিশালাকৃতির সামুদ্রিক জাহাজসমূহ নিরব নিস্তব্ধ সমুদ্র এলাকায় কোন প্রকার ক্ষতি বা দুর্ঘটনা ছাড়াই আকস্মিক অদৃশ্য হয়ে যাওয়া। কখনো যাত্রীদের বেঁচে যাওয়া এবং শুধু জাহাজকে গায়েব করে দেয়া। আর কখনো জাহাজ নিরাপদ বেঁচে যাওয়া এবং যাত্রীদের হারিয়ে যাওয়া। এগুলি এমনসব ঘটনা ও রহস্যময় বিষয়, যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষেণ আজ পর্যন্ত মনকে তুষ্ট করতে পারেনি। এদের গায়েব হওয়া এত দ্রুত প্রকৃতির হয় যে, বিমানের পাইলট বা জাহাজের ক্যাপ্টেনদের পর্যন্ত জরুরী সংবাদ বা সংকেত প্রেরণেরও সুযোগ হয়না। এথেকেও আরো আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- গায়েব হয়ে যাওয়া বিমান, জাহাজ বা যাত্রীদেরও পরবর্তীতে কোন অস্তিত্ব বা খোজ পাওয়া যায়নি। যদিও কতিপয় গবেষকের পক্ষ থেকে এর উত্তর এভাবে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, ওখানকার সমুদ্রের গভীরে এমনসব তুফান আর মারাত্মক দ্রুত বাতাসের সৃষ্টি হয়, যারফলে জাহাজগুলি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায় এবং পানির বিশালাকৃতির ঢেউ এগুলিকে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা মানুষের জ্ঞান এজন্য মেনে নিতে অস্বিকার করে যে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এ যুগে যেখানে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের সুগভীর এলাকায় পৌছে মৎস্য এবং পানির অন্যান্য প্রাণীদের উপর গবেষণা করার জন্য তাদের দেহের সাথে আধুনিক ক্যামেরা ফিট করে প্রাণীদের সার্বিক মতিগতি নিয়ে সর্বদায় দৃষ্টি রাখছে। তারা কি আজও বারমুডার ঐ ট্রাইএঙ্গেলে গায়েব হয়ে যাওয়া বড় বড় জাহাজগুলির কোনই হদিস বের করতে পারেনি ??!! এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, অদ্যাবধি ওখানে অদৃশ্য হওয়া সকল বিমান, সামুদ্রিক জাহাজ আর পাইলট-ক্যাপ্টেন-যাত্রীরা ছিল যুগের অত্যাধুনিক আর সুদক্ষ সব মানুষ। পাশাপাশি অদৃশ্য হওয়ার সময় ওখানকার আবহাওয়াবস্থাও ছিল খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং ঋতু খারাপ হওয়ারও কোন ব্যাখ্যা এখানে করা ঠিক না। এসব বিমান আর জাহাজগুলির সাথে হেডকোয়ার্টারের যোগাযোগও হঠাৎ এমনভাবে বিছিন্ন হয়ে গিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল কে যেন রেডিও সিগনেল জাম করে দিয়েছে।

অধিকাংশ গবেষকই এব্যাপারে একমত যে, শয়তানী সমুদ্র এবং বারমুডার ট্রাইএঙ্গেলে এমনসব রহস্যময় এবং ভয়ানক বস্তু রয়েছে, যা আমাদের স্বাভাবিক বিষয়াবলী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অস্বাভাবিক প্রকৃতির। বারমুডার ট্রাইএঙ্গেল এবং শয়তানী সমুদ্র আশপাশের মানুষের জন্য এমন ভীতিকর এলাকা হিসেবে পরিচিত, যা মানুষের জন্য জ্ঞানের চাহিদাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। কতিপয় মুসলিম গবেষকের ধারণা, শয়তানী সমুদ্র আর বারমুডার ট্রাইএঙ্গেলের ভিতরে দাজ্জাল গোপন আস্তানা করেছে, যেখান থেকে সে দুনিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি কন্ট্রোল করছে। এ ব্যাপারেও আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে জানার পূর্বে শয়তানী সমুদ্র সম্পর্কে কিছু তথ্য গ্রহণ করুন!!!

Dragon's Triangle/Devil Sea

ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল/শয়তানী সমুদ্র

ট্রাইএঙ্গেল মানে হচ্ছে ত্রিভোজ সীমানা।

বারমুডার ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে তো সারা পৃথিবী জুড়েই নানানরকম তথ্য লেখা হচ্ছে এবং সব মানুষের কাছেই এ ব্যাপারে সাধারণ জ্ঞান বিদ্যমান। কিন্তু বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের মতই রহস্যময় ও ভয়ানক সব ঘটনাবলীর কেন্দ্রস্থল জাপানের ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল তথা শয়তানী সমুদ্রের ব্যাপারে অবগত ব্যক্তিদের সংখ্যা খুবই কম। জাপানের জনসাধারণের এ ব্যাপারে খুব ভাল করেই জানা এবং ওখানকার লোকদের উপর এথেকে দূরে অবস্থান করার সরকারী আদেশ এখন পর্যন্ত জারী। কিন্তু জাপানবহির্বিশ্বের লোকেরা এ ব্যাপারে বেশি কিছু জানেনা। অথচ বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের মত এখানেও সামুদ্রিক জাহাজ, সাবমেরিন ও উড়ন্ত জাহাজ গায়েব হওয়ার ঘটনা অজস্র সংখ্যায় ঘটে আসছে। বরং গবেষকদের ধারণা, এখানকার গায়েব হওয়ার ঘটনা বারমুডা থেকেও বেশি। এখানেও যুগের অত্যাধুনিক আর সর্বাধিক দক্ষ ব্যক্তি এবং পরিপক্ক পাইলটদের গায়েব করা হয়েছে। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হচ্ছে, এখানে গায়েব করা সামুদ্রিক জাহাজগুলির তালিকায় এমন সব জাহাজও বিদ্যমান যেগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ধ্বংসাত্মক রাসায়ণিক পদার্থ বিদ্যমান ছিল।

শয়তানী সমুদ্রের অবস্থান :-

এ এলাকা Pacific Ocean তথা প্রশান্ত মহাসাগর এরিয়ায় জাপান এবং ফিলিপাইনের সীমান্তে অবস্থিত। এ ট্রাইএঙ্গেল জাপানের উপকূলীয় শহর (Yokohama) "য়োকোহামা" থেকে ফিলিপাইনের (guam) "গুয়াম" দ্বীপ পর্যন্ত এবং "গুয়াম" থেকে আবার জাপানের "মারিয়ানা" দ্বীপ পর্যন্ত এবং "মারিয়ানা" থেকে "য়োকোহামা" পর্যন্ত বিস্তৃত সামুদ্রিক এলাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকা "মারিয়ানা" দ্বীপ আয়ত্ব করে নিয়েছিল।

জাপানীরা এ এলাকাকে তাদের ভাষায় (ma-na Umi) বলে, যার অর্থ "শয়তানের সমুদ্র"। বারমুডা এবং শয়তানী ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে গবেষণাকারীদের মধ্যে চার্লস ব্রিল্টাস হচ্ছেন অন্যতম। তিনি "দি ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল" নামক গ্রন্থে লিখেন :-

"১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত ঐ এলাকায় জাপান সরকারের বড় বড় পাঁচটি সৈন্যবাহী জাহাজ গায়েব হয়েছে। সেনাবাহিনী গুম হয়েছে ৭০০ (সাতশত)-এরও উপরে। এ ঘটনার রহস্য যাচাই করার জন্য তখন

জাপান সরকার একটি অত্যাধুনিক জাহাজে করে একশরও বেশি গবেষকদের এক তদন্ত টিম প্রেরণ করে। কিন্তু শয়তানী সমুদ্রের রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে উনারাই রহস্যের চাদরে ঢাকা পড়ে গেছেন। এর পর থেকে জাপান সরকার ঐ এলাকাকে ভয়ানক এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে দেয়।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সামুদ্রিক যুদ্ধে জাপানকে তার পাঁচটি জঙ্গি বিমান ওখানে গায়েব হওয়ার খবর শুনতে হয়েছে। এছাড়াও ৩৪০ টি জঙ্গি বিমান, ১০ টি যুদ্ধজাহাজ, ১০ টি নৌযান, ৯ টি স্পীডবুট এবং আরো ৪০০ টি জঙ্গি ফাইটার ঐ এলাকায় ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধের সময় আপনি বলতে পারেন যে, শত্রুবাহিনী কর্তৃক এগুলো ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু ঐ সকল ঘটনা সম্পর্কে আপনি কি বলবেন, যেগুলো ঐ এলাকায় কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই অদৃশ্য হয়েছে, অথচ সেখানে না কোন বৃটেনের যুদ্ধ জাহাজ পৌছেছিল না কোন মার্কিন সেনাবাহিনী।

গবেষকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, এগুলো কোন শত্রুবাহিনীর হাতে ধ্বংস হয়নি। কেননা এক গবেষকের বক্তব্য :-

"It is extremely doubtful that they were sunken by enemy action because they were in home waters and there were no British or American ships in these waters during the beginning of the war".

অর্থাৎ এ কথা অত্যন্ত সন্দেহপূর্ণ যে, এ জাহাজগুলি শত্রুদের হাতে ধ্বংস হয়েছে। কেননা জাহাজগুলি সামুদ্রিক সীমানার ভিতরেই অবস্থান করছিল এবং যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ওখানে কোন মার্কিন বা বৃটিশ জাহাজ পৌছেছিল না।" তাহলে কি আমরা বলতে পারিনা যে, এ এলাকায় অন্য কোন গোপন শক্তি বিদ্যমান ছিল, যারা ঐ সময় আমেরিকা এবং তার সমর্থনকারীদেরকে বিজয়ী দেখতে চেয়েছিল।

বারমুডা এবং শয়তানী ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে এতগুলি সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনা ঘটার পরও কি আমরা এ কথা মানতে পারি যে, এগুলো শুধুই ঘটনাক্রমে হয়েছে ???!! কখনো নয়!! প্রসিদ্ধ গবেষক চার্লস ব্রিল্টার্স বলেন :-

"The mysterious disappearances in the Bermuda and Dragon Triangles may not be coincidental; since both areas are so similar, the same phenomenon might be behind the lost ships and planes"

অর্থাৎ বারমুডা এবং শয়তানী সমুদ্রে রহস্যময় অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘটনাবলী ঘটনাক্রমে বা এমনিতেই হতে পারেনা। কারণ, উভয় এলাকা সাদৃশ্যপূর্ণ ঘটনার জন্ম দিয়েছে। জাহাজ এবং বিমান গায়েব করার ক্ষেত্রে উভয় এলাকা একই পথ বেছে নিয়েছে। (দি ড্রাগন ট্রাইএঙ্গেল-চার্লস ব্রিল্টার্স)

সামুদ্রিক জাহাজ... অজানা গন্তব্যের দিকে :-

এখানে সংগঠিত প্রসিদ্ধ কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানুন :-

(১) জাপানী পেট্রোলবাহী জাহাজ "কায়োমারো-৫" (kaio maro No-5)। এটি একটি বড় পেট্রোলবাহী জাহাজ, ৩১ জন কর্মী ছিল। গায়েব হওয়ার সময় পাঁচশত টন পেট্রোল তাতে মজুদ ছিল। ৯ জন বিজ্ঞানী/গবেষকও তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। হেডকোয়ার্টারের সাথে তার সর্বশেষ যোগাযোগ হয়েছিল ২৪-০৯-১৯৫২। এরপর আর তার কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

(২) জাপানী মালবাহী জাহাজ "কোরোশিয়োমারো-২"। এটিও একটি বিশালাকৃতিরি মালবাহী জাহাজ। যাতে ১৫২৫ টন মাল মজুদ ছিল। একেও সমুদ্র গিলে ফেলেছে, কোন তথ্য পরবর্তীতে পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ যোগাযোগ হয়েছিল ২২-০৪-১৯৪৯।

(৩) ফ্রান্সিস জাহাজ "জিরানিয়োম"। এই জাহাজ সর্বশেষ ২৪-১১-১৯৪৭ বার্তাটি প্রেরণ করেছিল-

"আবহাওয়া স্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে"। এরপর ২৯ জন কর্মী সহকারে স্থায়ীভাবে সমুদ্রের বুকে বিলীন হয়েছে। কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি।

(৪) মালবাহী জাহাজ "বানালোনা। এটি একটি লাইবেরিয়ান জাহাজ। মালের পরিমাণ ছিল তাতে ১৩৬১৬ টন। কর্মীর সংখ্যা ৩৫। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসে শয়তানী সমুদ্রে বিসর্জিত হয়েছে।

(৫) মালবাহী জাহাজ "মাছজোছার"। এটিও লাইবেরিয়ান জাহাজ। প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যানুযায়ী এটি শয়তানী সমুদ্রের সীমানায় ছিল। হঠাৎ জাহাজের চারপাশে আগুন প্রদর্শিত হলো। এ আগুন জাহাজ থেকে নয়; বরং পানি থেকে সৃষ্টি হয়ে জাহাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তৎক্ষনাৎ অনেকেই এ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করে ফেলেছিল; যাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল যে, জাহাজের চারপাশে পানির উপরিভাগে আগুন। আশ্চর্যের বিষয়- জাহাজে বারুদ বা পেট্রোল জাতীয় কোন পদার্থ ছিলনা। এথেকেও আরো আশ্চর্যের বিষয়- জাহাজের চারপাশে বেষ্টনকারী আগুন তৃভোজের আকৃতিতে ছিল। আরোহী ছিল ১২৪ জন। এ ঘটনা ১৯৮৭ সালের মার্চ মাসে ঘটেছিল।

(৬) মালবাহী জাহাজ "সূফিয়াবাবাছ"। জাহাজ জাপানের রাজধানী টোকিও সমুদ্রবন্দর থেকে রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষন পর দুই টুকরা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গায়েব হয়নি। সামুদ্রিক রহস্য উন্মোচণকারী সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এর রহস্য উদঘাটনে অপারগ। কারন অজানা। তদন্তের দরজা বন্ধ। চিন্তা করেন !!!

(৭) গ্রীক জাহাজ "আজয়োছ জিয়োরজিছ"। এটি একটি বড় ধরনের ব্যবসায়ীক জাহাজ। যা ২৯ জন কর্মী সহকারে গায়েব করা হয়েছে। ১২৫২৫ টন রসদ তাতে মজুদ ছিল। না জাহাজের কোন খবর পাওয়া গেছে, না কর্মীদের, না এত অধিক পরিমান রসদ বিলীন হওয়ার কোন চিহ্ন পানির উপর পাওয়া গেছে।

রাসায়ণিক সাবমেরিন গায়েব

জাহাজ গায়েব হওয়ার ব্যাপারে তো বাহানা পেশ করা যায় যে, জাহাজ ডুবে গেছে। কিন্তু অত্যাধুনিক সাবমেরিন গায়েব হওয়ার ব্যাপারে আপনি কি বলবেন; যাতে অত্যাধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি ওয়ারলেস সিষ্টেম বিদ্যমান ছিল ??!! আবার সাবমেরিনগুলিও সাধারণ মানের নয়; রাসায়ণিক সাবমেরিন। এখন চিন্তা করুন- কোন সুপারপাওয়ারের রাসায়ণিক সাবমেরিন বিনাকারণে গায়েব হয়ে গেল। অথচ এত বড় ঘটনার পরও কোন পেরেশানী বা অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়নি। মনে হয় যে, যে দিয়েছিল সেই ফেরৎ নিয়ে নিয়েছে।

(১) রাশিয়ান সাবমেরিন ভেক্টর-১। এটি ছিল একটি অত্যাধুনিক রাসায়ণিক সাবমেরিন। ১৯৮৪

সালের মার্চ মাসে কর্মীদের সহ শয়তানী সমুদ্রের গোপন শক্তির কাছে চলে গেছে। কর্মীদের সংখ্যা অজানা (মনে হয় অনেক বিশেষ ব্যক্তিবর্গ এতে শামিল ছিল)।

(২) রাশান সাবমেরিন একো-১। প্রথম সাবমেরিন গায়েব হওয়ার পাঁচ মাস পরেই সেপ্টেম্বর মাসে উপকূল থেকে ৬০ কি: মি: দূরে এটাকেও শয়তানী সমুদ্রের গোপন শক্তি কোন জরুরী কাজের জন্য কাছে টেনে নেয়। একটু চিন্তা করেন- রাসায়ণিক সাবমেরিন, পথে ঘাটের কোন খেলনা নয় যে, কোন বিষয়ই না।

(৩) রাশিয়ান সাবমেরিন একো-২। জানুয়ারী ১৯৮৬ তে এটাও ওই এলাকার নজরবন্দী হয়েছে। এটিও রাসায়নিক সাবমেরিন।

(৪) রাশায়নিক সাবমেরিন জুলেফ-১। এপ্রিল ১৯৬৮ তে গায়েব হয়েছে। কর্মীদের সংখ্যা ৮৬ জন। ৮০০ কিঃ গ্রাঃ রাসায়ণিক পদার্থ মজুদ ছিল। কোন কারণ ছাড়াই সবকিছু সহ পানির অতল গহবরে চলে গেছে।

(৫) ফ্রান্সিস সাবমেরিন চারলি। রাসায়নিক সাবমেরিন। সেপ্টেম্বর ১৯৮৪ তে ৯০ জন কর্মচারীসহ ঐ এলাকায় গায়েব হয়েছে।

(৬) ব্রিটিশ সাবমেরিন কেস্ট্রেল। নভেম্বর ১৯৮৬ তে সকল কর্মচারীদের সহ গায়েব।

শয়তানী সমুদ্রে গায়েবকৃত বিমান

মার্চ ১৯৫৭ তে দশ দিনের ভিতরে তিন মার্কিন জঙ্গি বিমান পাইলটসহ গায়েব হয়েছে। পরবর্তীতে এদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। না পাইলটের কাছ থেকে কোন আবহাওয়া গুলযোগের বার্তা পাওয়া গেছে। বিমানগুলো ছিল যথাক্রমে JD-1, KB-50, C-97। এছাড়াও জাপানী জঙ্গি বিমান P-J2 ১৬ জুলাই ১৯৭১ সালে গায়েব হয়েছে। কোন বার্তা প্রেরণে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীতে ২৭ এপ্রিল ১৯৭১ জাপানেরই আরো একটি জঙ্গি বিমান P2V-7 গায়েব হয়। এর দুই মাস পর আবার জাপানী ট্রেনিং বিমান IM-1 গায়েব হয়।

JA-341 যাত্রীবাহী বিমান (যাতে সাংবাদিকদের একটি টিমও ছিল) ঐ এলাকার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। এটি পূর্বে গায়েবকৃত মার্কিন কেলিফোর্নিয়ামারো নামক জাহাজের তদন্তের জন্য ওখান দিয়ে যাচ্ছিল। তারা গায়েবকৃত জাহাজের তদন্ত তো করতে সক্ষম হয়নি; বরং দুনিয়াকে তারা নিজেদের তদন্তে অবশ্যই লাগিয়েছে। পরবর্তীতে তাদের বাতাসও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। না সাংবাদিকদের, না যাত্রীদের।

১৯ মার্চ ১৯৫৭, সাবেক ফিলিপাইনী প্রেসিডেন্টের বিমান ২৪ জন সরকারী অফিসার সহ সামুদ্রিক আকাশে অদৃশ্য হয়েছে। কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় ভাগ

(Bermuda Triangle)

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের অবস্থান

বারমুডা আটলান্টিক সাগরের সর্বমোট ৩০০ টি দ্বীপ নিয়ে বিস্তৃত এলাকার নাম। যার মধ্যে বেশির ভাগেই অনাবাদী। শুধুমাত্র বিশটি দ্বীপের মধ্যে মানুষের অবস্থান পাওয়া যায়। আর যে এলাকাকে আশংকাজনক মনে করা হয়, তাকে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল বলা হয়। এ এঙ্গেলের আয়তন চারপাশ থেকে ১১৪০০০০ বর্গ কি: মি:। উত্তরে বারমুডার বিভিন্ন দ্বীপ, দক্ষিনপূর্বে পোরটোরিকো এবং দক্ষিনপশ্চিমে মার্কিন গণতান্ত্রিক সরকার শাসিত প্রসিদ্ধ ফ্লোরিডা শহর। অর্থাৎ এই এঙ্গেলের মূল অবস্থান ফ্লোরিডায়। হ্যাঁ.... ফ্লোরিডা। (ফ্লোরিডার অর্থ হচ্ছে- ওই খোদার শহর যার অপেক্ষা করা হচ্ছে বা ওই খোদা যার অপেক্ষা করা হচ্ছে)।

প্রায় চারশত বছর পূর্ব থেকে ওই বিরান এলাকায় কোন মানুষ বসবাস করেনি। এমনকি জাহাজের ক্যাপ্টেন পর্যন্ত ভয়ে ওই এলাকা থেকে দূরে থাকে। ওখানে একটি কথা খুবই প্রসিদ্ধ যে, "ওখানাকার পানির গভীরে ভয়ংকর সব শয়তানী রহস্য লুকায়িত রয়েছে।" এমনকি ওখানকার আকাশপথের ভ্রমণকারীরা এয়ারহোষ্টেসকে পর্যন্ত সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করে- আমাদের বিমান কি বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের উপর দিয়ে যাবে ?? কোম্পানীর জবাব যদিও নেতিবাচক হলেও বাস্তবে তার বিপরীত।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল কি আসলেই ট্রাইএঙ্গেলের আকৃতিতে....

বারমুডার ট্রাইএঙ্গেলের পুরো এরিয়াটাই সমুদ্রে। যা আটলান্টিক সাগরে অবস্থিত। সুতরাং চিন্তার বিষয়- চারিদিকে পানি আর পানি, এখানে এঙ্গেল বা ত্রিভোজের আকৃতি কি করে সম্ভব ?!! সুতরাং প্রথমেই জানতে হবে যে, এঙ্গেল বাস্তব নয়; বরং এটি একটি বিশেষ এলাকার নাম যেখানে অবিশ্বাস্য সব ঘটনার জন্ম হয়। ওই এলাকাকে ট্রাইএঙ্গেল হিসেবে সাধারণ নাম দেয়া হয়েছে। এ নামের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ আছে যে, ১৯৪৫ সালে ওই এলাকায় একসাথে কয়েকটি বিমান গায়েব হওয়ার পর এক প্রেস কনফারেন্সে সর্বপ্রথম এই নাম ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এটা খুবই রহস্যপূর্ণ যে, নামটি কেন ট্রাইএঙ্গেল রাখা হল।

ওই দুর্ঘটনার পূর্বেও ওখানে বহু ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তখন ওই এলাকাকে বারমুডা

ট্রাইএঙ্গেলের পরিবর্তে শয়তানের দ্বীপ হিসেবে চেনা হত। ক্রেস্টোফার কোলাম্বিস (১৪৫১-১৫০৬) সামুদ্রিক ভ্রমণের সময় যখন ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেও ওখানে কিছু অচীন ও আশ্চর্য বিষয় প্রত্যক্ষ করেছিল। যেমন- আগুনের গোলা সমুদ্রের ভেতরে প্রবেশ করা, ওই সীমানায় প্রবেশ করলেই কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই কোম্পাস খারাপ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

কোলাম্বিসের আমেরিকা ভ্রমন পাঁচ শতাব্দি পার হয়ে গেল। কিন্তু এ প্রশ্ন আজও বাকী রয়ে গেছে যে- ওখানাকার পানির গভীরে বা পানির উপরিভাগে-আকাশপথে কি এমন রহস্যময় বিষয় গোপন রয়েছে, যার ব্যাখ্যা বর্তমান অত্যাধুনিক স্যাটেলাইটের যুগেও খুজে বের করা সম্ভব হচ্ছেনা। ১৮৫৪ সালের পূর্বে আরব বনিকেরাও ওই এলাকা দিয়ে আসা-যাওয়া করত, কিন্তু তাদের জাহাজ তো কখনো দুর্ঘটনা বা কোন অস্বাভাবিক রহস্যের কবলে পড়েনি। অথচ এরকম ঘটনা ওখানে ১৮৫৪ সালের পূর্বেও বহুবার ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাহাজের কবরস্থান.. বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল

১৮১৩ সালে আমেরিকার তৃতীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট এরন বার (Aaron Burr)এর কন্যা থিউডোসিয়া (Theodosia)(দক্ষিন কেরোলিনা রাজ্যের গভর্ণর জোসেফ এস্টোনের স্ত্রী, খুবই বুদ্ধিমতি এবং সুন্দরী কন্যা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল) বারমুডার ওই এলাকায় গায়েব হয়েছে। থিউডোসিয়া তার পিতার সাক্ষাতের জন্য তখনকার সর্বাধুনিক জাহাজ পেট্রিয়াটে করে নিউয়োর্কের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পেট্রিয়াটের ক্যাপ্টেন তখনকার সুদক্ষ নাবিক হিসেবে আমেরিকায় প্রসিদ্ধ ছিল। সাথে তার ব্যক্তিগত ডাক্তার এবং আরো কিছু ঘনিষ্ঠজনও ছিল। কিন্তু তারা কখনোই নিউয়োর্কে পৌছতে পারেনি। ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে এরন বার তার কন্যাকে খুজে পাওয়ার জন্য তখন সাধ্যমত অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু না পাওয়া গেছে কন্যার খবর, না জাহাজের কোন হদিস।

১৮১৪ সালে আমেরিকার প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক জাহাজ WASP কেও বারমুডা গিলে ফেলেছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন কোন সাধারণ মানের ক্যাপ্টেন ছিলনা; মার্কিন জনসাধারণের কাছে নায়ক হিসেবে পরিচিত জনষ্টন ব্লেকলে। সে ব্রিটিশ শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজ Reindeer কে স্বীয় দক্ষতা দিয়ে মাত্র ২৭ মিনিটেই পরাজিত করেছিল। এরপর আর কেউ জানতে পারেনি যে- ব্লেকলে তার ষ্টাফ এবং জাহাজ নিয়ে কোন জগতে গিয়ে পৌছেছে। না মার্কিন সরকার, না মার্কিন সামুদ্রিক গবেষক টিম। অথচ তখনকার মার্কিন সামুদ্রিক গবেষক টিম পানির গভীর পর্যন্ত এত ভাল করে চিনত, যেমননাকি পাড়ার অলি-গলিকে মানুষ চেনে। কিন্তু অত্যাধিক খোজাখোজির পরও কোনই নাম-নিশানা কি তারা পায়নি ?!! তাহলে কি বারমুডার ট্রাইএঙ্গেল

তাদের গিলে ফেলেছে ? নাকি ব্লেকেলের অত্যাধিক যোগ্যতা দেখে "গোপন শক্তি" তাকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছে।
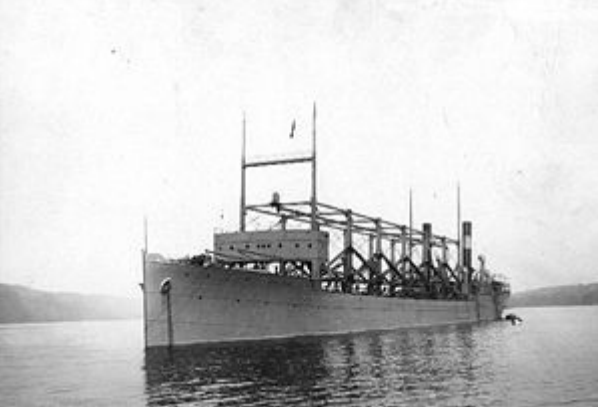
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় মার্চ ১৯১৮ তে মার্কিন সামুদ্রিক জাহাজ সাইক্লোপিস (Cyclops U.S.A) ওই এলাকায় গায়েব হয়েছে। যাতে যুদ্ধকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য সাড়ে চৌদ্দহাজার টন মাল মজুদ ছিল। তাছাড়া তিনশত কর্মীও তাতে কর্মরত ছিল। এরও কোন নাম-নিশানা পাওয়া যায়নি।
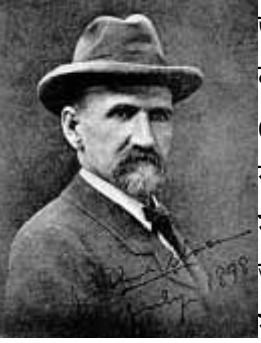
জাশোয়াস্লোকোম (Jashua Slocum) এমন এক ক্যাপ্টেন। শুধু মার্কিন ইতিহাসেই নয়; সামুদ্রিক বিষয়ে সে সারাবিশ্বজুড়ে সুনাম অর্জন করেছিল। বাল্যকাল থেকেই পানির ঢেওয়ের সাথে খেলে বেড়ে ওঠা এক যুবক। সেই সর্বপ্রথম সমুদ্র পথে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছিল। সর্বদা সামুদ্রিক ঝড় আর তুফান মোকবেলা করাই যার অভ্যাস ছিল। ১৯০৯ সালে Spray নামক নিজস্ব জাহাজে করে রওয়ানা হয়েছিল। অতপর বারমুডার ঐ ভয়ানক এলাকায় সে তার জাহাজ সহ চিরদিনের জন্য গায়েব হয়ে যায়। গায়েব হয়ে যাওয়া জাহাজের তালিকায় নাম যুগ হওয়া ছাড়া আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

যাত্রী গায়েব...... জাহাজ উপকূলে.......

এটাও কি বিশ্বাসযোগ্য ? যদি আপনাকে বলা হয়- একটি জাহাজ বারমুডার সমুদ্র সীমানায় দাড়ানো, কিন্তু যাত্রী এবং ক্যাপ্টেন গায়েব!! খানার টেবিলে এমনভাবে খানা গুছিয়ে রাখা; দেখলে মনে হবে- হাত ধোয়ার জন্য মনে হয় তারা উঠে গেছে। না আছে দুর্ঘটনার চিহ্ন, আর না কোন লুটপাটের নিদর্শন। নিরব সমুদ্রের মাঝে হঠাৎ খানা পিনা রেখে তারা কার মেহমান হয়ে গেছে ?!! ঘটনাটি ঘটেছে "কেরল ডীরিং (Caroll Deering)নামক জাহাজের সাথে। তীরে জাহাজের সম্মুখভাগ বালুতে গাড়া ছিল আর পেছনের অংশ পানিতে ছিল। খানার টেবিলে খানা রাখ ছিল। চেয়ারগুলি কিছু পেছনের দিকে ঝুকা অবস্থায় ছিল। মনে হবে, যাত্রীরা কোন অলৌকিক কিছু দেখে আপন আপন চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছিল এবং পরে ফিরে আসার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা আর পারেনি। চেয়ারটেবিলে খানা আর ফলফ্রুট দেখে কোন হাঙ্গামা বা দুর্ঘটনার চিহ্ন বা নিদর্শন উপলব্ধি হয়না। জাহাজের অবস্থা দেখেও এ কথা মনে হয়না যে, এখানে লুটপাট বা ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। আশ্চর্যের বিষয়- এতবড় জাহাজকে তীরে কে আনল ?? আর যাত্রীরাই বা কিরূপ দুর্ঘটনার স্বীকার হল ?? কেননা এত বড় জাহাজ এত অল্প পানিতে আসা অসম্ভব।। জাহাজটি ছিল "জি জি ডেয়রিং কোম্পানী অফ পোর্টলেন্ড" এর মালিকানায়।

হেরি কোনোভার (Herrey Conover) প্রসিদ্ধ মার্কিন কোটিপতি, সুদক্ষ জঙ্গি পাইলট, সামুদ্রিক জাহাজ প্রতিযোগীতায় বিজয়ী ক্যাপ্টেন ১৯৫৮ সালে তার সাথীদের নিয়ে বারমুডার অতল গহবরে গায়েব হয়েছে। কিন্তু এইবার শুধু যাত্রীরাই নিখোজ হয়েছে। কেননা পরবর্তীতে তাদের জাহাজ ফ্লোরিডার সী-বিচ থেকে ৮০ মাইল উত্তরে এক কিনারায় যাত্রীবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়।

ডুবে যাওয়া জাহাজ ফেরত ....

এ ধরনের কোন সংবাদও কি আপনি এ পর্যন্ত শুনেছেন যে, কোন জাহাজ সম্পূর্ণরূপে সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে এবং কিছুদিন পর তা পূর্বাবস্থায় কোন কিছু নষ্ট হওয়া ছাড়াই উপরে এসে গেছে। একটি জাহাজ বারমুডার ট্রাইএঙ্গেলের সীমানায় চলছিল। সমুদ্রের ঢেও একে নিয়ে খেলছিল। কিন্তু তাতে কেউ ছিলনা; ভেতরে সম্পূর্ণ খালী ছিল। না ক্যাপ্টেন, না যাত্রী আর না কোন কর্মচারী। জাহাজের নাম "লাদাহামা"। এস.এযটেক নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং কর্মচারীরা যে দৃশ্য অবলোকন করেছিল, তা নিম্নরূপ :

"সবকিছু ঠিকঠাক, সঠিক জায়গায় বিদ্যমান। না কেউ কিছু উঠিয়েছে, না ছিন্নভিন্ন করেছে। না আছে লুটমারের চিহ্ন, না কোন দুর্ঘটনার আলামত। এমনকি ক্যাপ্টেনের ব্যবহৃত কলম আর দূরবীন পর্যন্ত সঠিক জায়াগায় ছিল।" এথেকেও অবিশ্বাস্য খবর হচ্ছে- সামুদ্রিক জাহাজ "রানী"র রেকর্ডে এটি ডুবে যাওয়া জাহাজের তালিকায় ছিল যাকে ইটালীর রেক্স (Rex) নামক জাহাজের যাত্রী এবং কর্মচারীরা ডুবে যাওয়ার সময় প্রত্যক্ষ করেছিল।

চিন্তার বিষয়...... কে এই গায়েবকারী ?? গায়েব করার পর জাহাজ থেকে কোন মূল্যবাণ জিনিস আটক করেনা, কারো কাছে কোন দাবীও পেশ করেনা। বরং চিরদিনের জন্য নিজের কাছে নিয়ে যায়। এরপর যায়ই বা কোথায় ?? এমন সব ঘটনা; যার কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাও আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। বারমুডার সমুদ্রের অভ্যন্তরের সকল ঘটনাই কি আকস্মিক ??! নাকি সুসংগঠিত কোন শক্তি নির্দিষ্ট কোন টার্গেট লক্ষ্য করে এসব ঘটনার জন্ম দিচ্ছে ??!!!!

বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে নিরব। বরং তাদের চুপ করিয়ে দেয়া হয়েছে। গবেষণার সকল দরজা বন্ধ। সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। বরং মৃত্যুর হুমকি। তাহলে এসব কেন ?? গবেষকদের কাছে একটি কথা স্পষ্ট যে, সামুদ্রিক ঝড়-তুফান বা স্বাভাবিক দুর্ঘটনার সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। এমনও কখনো হয়নি যে, জাহাজের সকল মূল্যবাণ সম্পদ আসবাবপত্র লুট করা হয়েছে। পাশাপাশি গায়েবকৃত জাহাজ থেকে আশপাশের হেডকোয়ার্টারগুলিতেও কোন সাহায্যের বার্তা প্রেরণ করা হয়নি। তবে কখনো কখনো কিছু বার্তা পৌছেছিল, যা সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ছিল।

এ সকল অস্পষ্ট বার্তায় গবেষণা ও তদন্ত করে গবেষকরা একটি ফলাফলে ঠিকই উন্নিত হয়েছেন যে, এ ঘটনাগুলি খুবই দ্রুততার সাথে ঘটানো হয়েছে এবং ঘটনার সময় জাহাজের ক্যাপ্টেন ও যাত্রীদের উপর হঠাৎ ভয়ানক এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

১৯২৪ সালে জাপানী মালবাহী জাহাজ "রিভোকোমারো" (Rivoco Maro)গায়েব হওয়ার পূর্বে উপকূল হেডকোয়ার্টারে এই বার্তা প্রেরণ করে :- " আমাদের উপর এক ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে.......। ভয়........ ভয়...........। দ্রুত আমাদের সাহায্য কর।"

তবে ১৯৬৭ সালে গায়েব হওয়া ভ্রমণজাহাজ "ভিচক্রাফট" থেকে সর্বশেষ যে বার্তা পৌছেছিল, তা জাহাজের মালিক নিজে (তখন সে জাহাজের মধ্যে ছিল) নিকটস্থ হেডকোয়ার্টারে নিম্নুক্ত বার্তা দিয়েছিল :- "জাহাজ পানির নিচে কোন অজানা বস্তুর সাথে ধাক্কা খেয়েছে....। পেরেশানীকর কোন কিছু সামনে আসেনি.....। জাহাজে কোনরূপ সমস্যা হয়নি.....। তবে সবকিছু ঠিকঠাকরূপে কাজ করছেনা......।" এই বার্তা পাওয়ার তিন মিনিটের মধ্যে বিশেষ সাহায্য টিম জাহাজের স্থানে পৌছেছিল। কিন্তু এই তিন মিনিটের মধ্যেই জাহাজ তার মালিক ও মালিকের বন্ধু (মার্কিন সিনেট জর্জ চার্চের পাদ্রী ফোর্চ লোডার ডেল) সহ যাত্রীদেরকে নিয়ে কোন অজানা স্থানে চলে গেছে। ঠিক পনের মিনিট পরেই আরো একটি টিম ওখানে পৌছে আশপাশের দুইশ কি: মি: এলাকাজুড়ে তন্ন তন্ন করে খোজাখোজির পরও এর কোন হদিস তারা বের করতে সক্ষম হয়নি।

আরো একটি আশ্চর্য বার্তা........

"আমি আমার বড় জাহাজটি নিয়ে মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমার জাহাজের পেছনে কিকোস ট্রেডার (Kikos Trader) নামক আরেকটি ছোট জাহাজ বাঁধা ছিল, যাকে আমার জাহাজ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আবহাওয়া সম্পূর্ণ পরিস্কার ছিল। এমন পরিস্কার আবহাওয়াই শিকারের উপযুক্ত সময়। আমরা "বাহামা"র দ্বীপসমূহের মাঝখানে এমন জায়গায় এসে পৌছেছি যেখানে পানি খুবি গভীর। যখন অন্ধকার ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল তখন দিক নির্দিষ্ট করার জন্য আমি ক্যাপ্টেনের কক্ষে আসলাম। অতপর চিন্তা করলাম- কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নেয়া যাক। তাই আমি আমার কক্ষে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ ঢেওয়ের একগুচ্ছ পানি আমার চেহারায় এসে পড়ল। আমি বিছানা থেকে উঠে বসে দেখি চারিদিক থেকে পানি কক্ষে প্রবেশ করছে। খুব কষ্ট করে দরজার কাছে এলাম। দরজা খুলব এমন সময় দরজার কপাট আমার উপর এসে পড়ল (অথচ দরজার খিল লক করা ছিল) দেখলাম যে, আমি সমুদ্রের নিচে। সাতরিয়ে সমুদ্রের উপরিভাগে আসার চেষ্টা করলাম। আমার অনুভব হচ্ছিল- কে যেন নিচের দিক থেকে টেনে আমাকে সমুদ্রের গভীরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি দ্রুত উপরিভাগে আসার চেষ্টা করছিলাম। পরিশেষে চেষ্টা সফল হল। উপরে এসে দেখি আমার জাহাজ গায়েব, আর কিকোস ট্রেডার (যাকে আমার জাহাজ টেনে আনছিল) পানির উপর বিদ্যমান। সে মাইক দিয়ে আমাকে ডাকছে।"

উল্লেখিত বক্তব্য Wildjaw নামক জাহাজের ক্যাপ্টেন জুয়ে টিলির। কিন্তু জুয়ে টিলিও বলতে পারেনি যে, তার জাহাজ ওখানে কিরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখিন হয়েছিল। অথচ সাগর ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও পরিস্কার। আর বেচেঁ যাওয়া জাহাজ কিকোস ট্রেডারের ক্যাপ্টেন শুধু এটুকু বলতে পেরেছে যে- "হঠাৎ জাহাজের নিয়ন্ত্রণ আমার হাত থেকে ফসকে গেছে।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে গায়েব হওয়া প্রসিদ্ধ কয়েকটি জাহাজ

(১) ১৮০০ সালের আগষ্ট মাসে মার্কিন জাহাজ এন্স্যারজেন্ট কোনরূপ দুর্ঘটনা ছাড়াই গায়েব হয়েছে। তাতে ৩৪০ জন যাত্রী আরোহী ছিল।

(২) ১৮৮০ সালের জানুয়ারী মাসে আটলান্টা নামক ব্রিটিশ জাহাজ গায়েব হয়। তাতে ২৯০ জন যাত্রী আরোহন করেছিল।

(৩) ১৯০২ সালের অক্টোবর মাসে ফেরিয়া (Feria)নামক জার্মান জাহাজ গায়েব হয়। পরবর্তীতে জাহাজ উদ্ধার হলেও যাত্রী এবং কর্মচারীদের কোন খবর পাওয়া যায়নি।

(৪) ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে মার্কিন মালবাহী জাহাজ সাইক্লোপ (Cyclop) সমস্ত কর্মচারী সহ গায়েব হয়। তাদের সংখ্যা- ৩০৯ জন।

(৫) ১৯২৪ সালে জাপানী মালবাহী জাহাজ রাইনোকো (Raynoko) গায়েব হয়।

(৬) ১৯৩১ সালে মালবাহী জাহাজ ষ্টাফজার (Stafger)গায়েব হয়। একই বছরের এপ্রিল মাসে "জন এন্ড মেরি" (Jhon & Mary)নামক মার্কিন জাহাজ গায়েব হয়। এর কিছুদিন পর বারমুডা থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে পানির উপর ভাসমান অবস্থায় তা উদ্ধার হয়।

(৭) ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ-অষ্ট্রেলিয়ান মালবাহী "ইংলো-অষ্ট্রেলিয়াজ" নামক জাহাজ গায়েব হয়।

(৮) ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে "গ্লোরিয়া কোল্ড" (Gloria Cold)নামক ভ্রমণজাহাজ গায়েব হয়। এর কিছুদিন পর ওই স্থান থেকে আরো দুইশ মাইল দূরে তা যাত্রীবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়।

(৯) ১৯৪৪ সালের ২২ অক্টোবর কিউবার "রেড পিকোন" (Red Peakon) নামক জাহাজ গায়েব হয়। কিছুদিন পর "ফ্লোরিডা"র উপকূল এলাকার নিকটবর্তী এক জায়গায় তা যাত্রীবিহীন পানির উপর ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়।

(১০) ১৯৪৮ সালে ফ্রান্সিস "রোযালী" (Rozali) নামক জাহাজ থেকে কর্মচারী গায়েব করা হয়। অতপর ওই এলাকা থেকেই জাহাজ কোন ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া উদ্ধার হয়।

(১১) ১৯৫০ সালের জুন মাসে "সেন্ড্রা" (Sandra)নামক জাহাজ ওই এলাকায় গায়েব হয়।

(১২) ১৯৫৫ সালে Queen Mayrio নামক ভ্রমণজাহাজ গায়েব হয়।

(১৩) ১৯৬৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারী "মেরিন সেলফার কুইন" (Marine Sulpher Queen) নামক মার্কিন মালবাহী জাহাজ গায়েব হয়। তাতে ৩৮ জন সামুদ্রিক গবেষক ও প্রচুর পরিমাণে "সালফার" মজুদ ছিল।

(১৪) ১৯৬৩ সালের ১ জুলাই "স্নো বয়" (Snow Boy) নামক জাহাজ গায়েব হয়।

(১৫) ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে "ভিচক্রাফট" (Withe Craft)নামক জাহাজ গায়েব হয়। উজন ছিল বিশ হাজার টন। কর্মচারী সংখ্যা-৩২।

(১৬) ১৯৬৭ সালের মে মাসে প্রসিদ্ধ মার্কিন সাবমেরিন "স্কোরপিয়ন" (Scorpion)নিরানব্বই জন সেনাসহ গায়েব হয়।

(১৭) ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন মালবাহী জাহাজ "মিল্টন ট্রেড" (Milton trade) গায়েব হয়।

(১৮) ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে জার্মান মালবাহী জাহাজ "এনেটা" (Aneta)গায়েব হয়।

এগুলো হচ্ছে প্রসিদ্ধ ঘটনা যা রেকর্ড করে রাখা হয়েছে, অন্যথায় এ তালিকা অনেক লম্বা।

বারমুডার আকাশ...... বিমান শিকারস্থল...

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে বড় বড় জাহাজ গায়েব হয়ে যাওয়া কি কম রহস্যের বিষয়; কিন্তু আকাশে উড়ন্ত বিমানও যদি কোন অজানা ঠিকানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা শুরু করে পরে আর ফিরে না আসে। যুদ্ধ বিমান এবং যাত্রীবাহী বিমান উড়তে উড়তে হঠাৎ বারমুডার আকাশে গায়েব হয়ে যাওয়া। অথচ আকাশ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পরিস্কার!! তাহলে আপনি কি বলবেন! আকাশ কি এগুলো গিলে ফেলেছে ?? বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের পানির অভ্যন্তরে বিদ্যমান কোন গোপন শক্তি তাকে ধরাশায়ী করেছে ?? পরবর্তীতে না এর কোন পাত্তা পাওয়া যায়। না পাইলট এয়ারপোর্টে দ্রুত কোন বার্তা প্রেরণে সক্ষম হয়। কখনো কোন বার্তা পৌঁছলেও তা বুঝা যাচ্ছিলনা।

১৯৪৫ সালে সন্ধাকালীন একটি ঘটনা তার রহস্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। সবেমাত্র আকাশ সন্ধা হতে শুরু করেছে। আবহাওয়া এবং আকাশ ছিল খুবই সাধারণ ও পরিস্কার। পাইলটদের প্লেন ট্রেনিংয়ের জন্য এমন স্বচ্ছ আকাশ খুবই মানানসই। আমেরিকা শাসিত "ফ্লোরিডা" শহরের এক এয়ারবিস থেকে বারটি জঙ্গি বিমান ট্রেনিংয়ের জন্য আকাশে উড্ডয়ন করে। সবগুলো বিমানই একসাথে প্রথম রাউন্ড সম্পন্ন করেছে। অতপর কেন্দ্র থেকে সবগুলোকে পৃথক পৃথক রাউন্ডের আদেশ দেয়া হয়। সুতরাং সবকটি প্লেন পৃথকভাবে রাউন্ড দিতে থাকে। রাউন্ড দেয়ার সময় কোন পাইলটের কাছ থেকে কোন পেরেশানী বা সমস্যার বার্তা পাওয়া যায়নি। তাহলে বুঝা গেল- সবকিছু ঠিকঠাকমতেই চলছিল। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর সবগুলো প্লেনই এয়ারবিসে লেন করার উদ্দেশ্যে ফেরত আসতে লাগল। দশটি আসল কিন্তু দুটি প্লেন গায়েব হয়ে গেল। মার্কিন আকাশ পথ গবেষকদের একটি টিম ওই এলাকার আকাশপথ ও সমুদ্রপথে এদের তন্ন তন্ন

করে খুজল। কোন হদিস পেলনা। এয়ারবিসে কোন দুর্ঘটনা বা সাহায্য প্রার্থণার বার্তাও পৌছেনি। এতবড় বিমান বারমুডার আকাশে গায়েব হল নাকি পানির নিচে চলে গেল। কোন পাত্তা নেই।!!

ফ্লাইট ১৯.... ছয়টি প্লেনেরে ঐতিহাসিক ভ্রমণ..

একই বৎসর (১৯৪৫) ডিসেম্বর মাস। কারো কি জানা ছিল ?! যে, ওই এলাকার প্রসিদ্ধ নাম "শয়তানী দ্বীপ" পরিবর্তন করে "বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল" দেয়া হবে। পানিতে ট্রাইএঙ্গেলের আকৃতি কি করে সম্ভব ?! তা গবেষণা ছাড়াই সারাবিশ্বের মানুষ তাকে ওই নামেই চিনতে শুরু করবে!! তা সত্ত্বেও প্রেস কনফারেন্সে মার্কিন দায়িত্বশীলগণ এক্ষেত্রে ট্রাইএঙ্গেলের নাম কেন ব্যবহার করল ??!! তাহলে কি দাজ্জালের ট্রাইএঙ্গেল বা ইহুদীদের গোপন সংগঠন "ফ্রেমেসন" এর ট্রাইএঙ্গেলের সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে ??!!

সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক পাইলট, ৩০০ থেকে ৪০০ ঘন্টা একাধারে প্লেন কেন্ট্রোলের অভিজ্ঞতা যার মধ্যে বিদ্যমান। কালের সর্বাধুনিক জঙ্গি বিমান যার মালিনাকায়। তাছাড়া আবহাওয়াবস্থা সম্পর্কেও যিনি খুব ভাল জ্ঞাত। এমন এক পাইলট তার প্লেনসহ হঠাৎ বারমুডার আকাশে গায়েব হয়ে যাওয়া। তাও আবার একটি দুটি নয়; পাঁচটি প্লেন একসাথে!!

১৯৪৫ সালে বারমুডার আকাশে গায়েব হওয়া কিছু প্লেনের চিত্র

সময়টা ছিল ১৯৪৫ সালের ৫ ডিসেম্বর। আনুমানিক দুইটা দশ মিনিটে আমেরিকা শাসিত "ফ্লোরিডা"র ফোর্ট লাডারডেইল (Fort Lauderdale) এয়ারপোর্ট থেকে ফ্লাইট-১৯ এর পাঁচটি এভেঞ্জার প্লেন উড্ডয়ন করে এবং নির্দিষ্ট এরিয়ায় কয়েকটি রাউন্ড সম্পন্ন করে। এরপর আনুমানিক চারটার সময় এক পাইলটের কাছ থেকে এয়ারপোর্ট অফিসে নিম্নোক্ত বার্তা প্রেরিত হয় (স্কোয়াডার্ন কমান্ডার আহবান করছে):-

পাইলট : আমরা আশ্চর্য ও বিরল পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়েছি...। মনে হচ্ছে- আমরা আমাদের এরিয়া থেকে সরে গেছি...। ভূমি দেখতে পাচ্ছিনা...। আমি ভূমি দেখতে পাচ্ছিনা...।

এয়ারপোর্ট : আপনি এখন কোন জায়াগায় আছেন ?

পাইলট : জায়গা নির্দিষ্ট করতে পারছিনা...। বুঝতে পারছিনা.. আমরা এখন কোথায় আছি ...। আমার ধারনা... আকাশেরই কোথাও আমরা হারিয়ে গেছি...।

এয়ারপোর্ট : পশ্চিম দিকে ফ্লাইং করতে থাকুন...।

পাইলট : আমি বুঝতে পারছিনা... পশ্চিম কোন দিকে...! সবকিছুই অচেনা এবং আশ্চর্য ধরনের দেখা যাচ্ছে...। এমনকি আমাদের সামনে সমুদ্রও আশ্চর্য আকৃতিতে দেখা যাচ্ছে...। এটাও আমি চিনতে পারছিনা...।

এয়ারপোর্টের কর্মরত সকলেই অবাক ছিল। বুঝে আসছিলনা- এত দক্ষ পাইলট দিক কেন দির্ধারণ করতে পারছেনা ?!! কেননা প্লেনের নেভিগেশন সিষ্টেম (দিক নির্ধারনের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি) যদি কাজ নাও করে, তবুও সময়টা তো ছিল বিকালবেলা; সূর্যাস্তের সময়। সূর্য দেখে সহজেই পশ্চিম দিক নির্ধারণ করার কথা। কিন্তু পাইলট বলছে যে, সে দিক নির্ধারণ করতে পারছেনা। তাহলে সে কোথায় চলে গিয়েছিল ??!! অতপর এয়ারপোর্টের সাথে পাইলটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এছাড়াও তখন ওই পাঁচ পাইলট একে অপরের কাছে যে বার্তা পেরণ করছিল; তাও এয়ারপোর্ট অফিস রেকর্ড করতে সক্ষম হয়েছে। যাতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছিল যে, বাকী চারটি প্লেনও একই পরিস্থিতির সম্মুখিন হয়েছে। কিছুক্ষণ পর জর্জ স্টিউর্জ নামক আরেক পাইলটের বিচলিত কন্ঠ শুনা যায় : "আমরা সঠিক বলতে পারছিনা যে, এই মুহুর্তে আমরা কোথায় আছি...। আমরা ধারনা যে, আমরা এয়ারপোর্ট থেকে ২২৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ফ্লাই করছি...।" এর কিছুক্ষণ পর সে বলতে লাগল : "মনে হচ্ছে আমরা সাদা পানিতে প্রবেশ করছি...। আমরা সম্পূর্ণরূপে দিকভ্রান্ত হয়েছি...।" এরপর ওই পাঁচটি প্লেন চিরদিনের জন্য সমুদ্রের পানিতে হারিয়ে যায়।

ওইদিন সন্ধা ৭:৩০ মিনিটে মার্টিন মেরিনার (Martin Mariner) নামক একটি বিমান এই পাঁচটি প্লেন তালাশের জন্য বের হয়। এটি ছিল হারিয়ে যাওয়া প্লেন তালাশের স্পেশাল বিমান। পানিতে অবতরনের সুবিধাও তাতে বিদ্যমান ছিল। কোন প্লেন যদি সমুদ্রে পড়ে যায়, তা উদ্ধারের জন্য এই বিমান ব্যবহৃত হত। মার্টিন মেরিনার ওই স্থানে গিয়ে এয়ারপোর্টের সাথে যোগাযোগ করল। কিছুক্ষন পর এরও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অন্যকে তালাশ করতে গিয়ে নিজেই গায়েব। এরও কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তৎক্ষনাৎ ওই ছয় প্লেন খোজার জন্য মার্কিন আকাশপথ ও সমুদ্রপথ টিম কোষ্টগার্ড সাথে নিয়ে ওই এলাকার আকাশ ও সমুদ্র পথে বহু খোজাখোজি করল; কিন্তু কোন লাভ হয়নি। মধ্যরাতে এয়ারপোর্ট অফিসে এক অস্পষ্ট বার্তা পৌছে : FT";;;;;;;;FT" বার্তা প্রেরণকারীর ভাষা অন্যরকম লাগছিল। এই বার্তা এয়ারপোর্ট অফিসে কর্মরত সকল কর্মীকে আরো পেরেশান করে দিল; কারণ এই কোড শুধুমাত্র ফ্লাইট-১৯ এর কর্মীরাই ব্যবহার করে থাকে। তার মানে তখন পর্যন্ত ওই পাইলটদের কেউ না কেউ জীবিত ছিল। কিন্তু কোথায় ?? মধ্যরাতে এই বার্তা পাওয়ার পূর্বেও তো ওই এলাকায় তাদের অনেক খোজাখোজি করা হয়েছিল। তাহলে এই বার্তা কোন জায়গা থেকে প্রেরণ করা হয়েছে ?? তাহলে কি বারমুডার পানির গভীরে তাদের গুম করা হয়েছে ?? অতপর কোষ্টগার্ডের লোকেরা সারারাত তাদের তালাশে নিয়োজিত থাকে। পরদিন সকালে তিনশত প্লেন, হাজার হাজার স্পীডবুট এবং বেশকিছু সাবমেরিনসহ ওই এলাকায় নিয়োজিত ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পর্যন্ত এদের উদ্ধারের জন্য বের হয়। কিন্তু এতটুকু পর্যন্ত বের করতে সক্ষম হয়নি যে, ওরা কিরূপ দুর্ঘটনার সম্মুখিন হয়েছে বা তারা কোথায় চলে গেছে !!

এ ধরনের দুর্ঘটনা দ্বিতীয়বার যাতে আর না ঘটে, সে জন্য গবেষকদের দিয়ে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু এ কমিটি তদন্ত তো দূরের কথা; স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা বা এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য পর্যন্ত করতে সক্ষম হয়নি। তবে কমিটি প্রধানের পক্ষ থেকে এ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে যে, "ওই প্লেনগুলি যাত্রী পাইলট ও কর্মচারীদের নিয়ে কোথাও যেন গুম হয়েছে, মনে হচ্ছে বাতাসের সাথে উড়ে তারা অন্য জগতে পাড়ি জমিয়েছে।"

এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়- যদি কোন দুর্ঘটনারই সম্মুখিন হয়ে থাকে, তবে তো তাদের প্রত্যেকের কাছেই "লাইফজ্যাকেট" বা প্যারাসুট ছিল। এর দ্বারা ভূমিতে জরুরী অবতরণ করতে পারত। তাহলে এতটুকু সুযোগও কি তাদের মেলেনি ??

দ্বিতীয় কথা- প্লেনগুলি সন্ধার সময় গায়েব হয়েছে। তৎক্ষনাৎ বহু খোজাখোজি এবং তালাশের পরও

তাদের কোন বাতাস পাওয়া যায়নি। তাহলে মধ্যরাতে যে বার্তা প্রেরণ করা হল; যোগাযোগ কোন জায়গা থেকে করা হল ??!!

Doomed ... Torpedo bomber #28, the lead plane of Flight 19. The men shown are not those who vanished in December 1945 / File

দুর্ঘটনার সময় নিকটবর্তী স্থান হতে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনাও কোন রহস্যময় বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করে : যেমন- তালাশে নিয়োজিত জাহাজের কর্মীরা এই কথাটি নোট করেছে যে, একস্থানে সমুদ্রের উপরিভাগে পানির কিছু অংশ বিশেষ (কোন আকৃতির) পর্যায়ের, অতপর তা সাদা রঙ্গে পরিবর্তন হয়ে গেল। স্মরণ রাখা দরকার- এরকম বিশেষ আকৃতির ফ্লাইং সোসার্স (প্লেটের মত ফ্লাইং করে এমন বস্তু) বারমুডার পানিতে প্রায়ই প্রবেশ করতে দেখা গেছে।

DC-3 একটি যাত্রীবাহী বিমান ছিল। যারমধ্যে ত্রিশজন পুরুষ সপরিবারে আরোহন করেছিল। তারা সবাই ছুটি কাটিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। বিমানটি "পোরটোরিকো" থেকে ফ্লোরিডার উদ্দেশ্যে ফ্লাই করল। ফ্লোরিডা এয়ারপোর্টের কাছে এসে লেনের প্রস্তুতি নিতে নিতে গায়েব হয়ে যায়। পাইলট এয়ারপোর্ট অফিসে লেনের অনুমতিও চেয়েছিল, তাকে অনুমতি দেয়াও হয়েছিল। কিন্তু এ প্লেন অজানা কোন স্থানে লেন করে ফেলে। পরে এদেরও কোন খবর পাওয়া যায়নি। বারমুডার ব্যাপারে গবেষণাকারী কতিপয় লোকদের বক্তব্য হচ্ছে- ঐ এলাকায় গায়েব হওয়া সকল মানুষই জীবিত রয়েছে। কিন্তু অন্য কোন জায়গায়। বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের পানির অভ্যন্তরে অজানা ঐ "গোপন শক্তি" তাদের অন্য কোথাও নিয়ে গেছে। কোন অজানা স্থানে...।"

এ সকল দুর্ঘটনার বিবরণ পড়ার পর আপনিও অনুধাবন করতে পারবেন যে, প্লেনগুলিতে কোন যান্ত্রিক গোলযোগ ছিলনা; বরং (গুম হওয়ার সময়) তাদের উপর এক ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাও আবার খুব দ্রুত গতিতে। অতপর কোনকিছু বুঝে উঠার আগেই তাদের গায়েব করে দেয়া হয়েছে। চিরদিনের জন্য।

কিন্তু কোথায় ?? এ প্রশ্ন সারাবিশ্বের সকল মানুষের জন্য খুবি গুরুত্বপূর্ণ।

বারমুডার আকাশে গুম হওয়া প্রসিদ্ধ কয়েকটি প্লেন

(১) ১৯৪৫ সালের ৫ ডিসেম্বর মার্কিন পাঁচটি জঙ্গি বিমান গায়েব হয়। অতপর এর তালাশ করতে যেয়ে পূনরায় আরেকটি প্লেন গায়েব হয়।

(২) ১৯৪৭ সালের ৩ জুলাই আমেরিকার আকাশপথ গবেষণাকারী C54 বারমুডার আকাশে স্থায়ীভাবে গুম হয়।

(৩) ১৯৪৮ সালের ২৯ জানুয়ারী চার ইঞ্জিনবাহী "ষ্টারটাইগার" নামক প্লেন ৩১ জন আরোহী সহ

গায়েব হয়। আজ পর্যন্ত কোন হদিস মেলেনি।

(৪) ১৯৪৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর DC3 নামক প্লেন ২৭ জন যাত্রীসহ বারমুডায় গায়েব হল ??!! নাকি পানির নিচে গুম করা হল ?! কোন পাত্তা নেই।

(৫) ১৯৫৯ সালের ১৭ জানুয়ারী "ষ্টার এরিল" নামক প্লেন বারমুডার শিকারে পরিণত হয়।

(৬) ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে "গ্লোবমাষ্টার" নামক মার্কিন বিমান আরোহীদের নিয়ে ওই এলাকা দিয়ে অতিক্রম করে। পরে আর গন্তেব্যে ফিরে আসেনি।

(৭) ১৯৫২ সালের ২ ফেব্রুয়ারী "ইয়োর্কট্রান্সপোর্ট" নামক ব্রিটিশ বিমান গায়েব হয়।

(৮) ১৯৫৪ সালের ৩০ অক্টোবর মার্কিন সামুদ্রিক বিমান চিরদিনের মত লাপাত্তা।

(৯) ১৯৫৬ সালের ৫ এপ্রিল মার্কিন মালবাহী প্লেন ষ্টাফসহ গায়েব।

(১০) ১৯৬২ সালের ৮ আগষ্ট মার্কিন আকাশপথ পর্যবেক্ষনকারী K.B নামক বিমান গায়েব।

(১১) ১৯৬৩ সালের ২৮ আগষ্ট মার্কিন আকাশপথের C.B.5 নামক দুটি প্লেন গায়েব হয়।

(১২) ১৯৬৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর C132 নামক প্লেন গায়েব।

(১৩) ১৯৬৫ সালের ৫ জুন C119 নামক প্লেন দশ যাত্রীসহ গায়েব।

(১৪) ১৯৬৭ সালের ১১ জানুয়ারী YC122 নামক প্লেন ১৪ জন আরোহী নিয়ে গায়েব।

(১৫) ১৯৪৭ সালের ১৭ জানুয়ারী মার্কিন জঙ্গি বিমান গুম।

এগুলো হচ্ছে বারমুডার আকাশে প্রসিদ্ধ সব বিমান গায়েব হওয়ার ঘটনা। এছাড়াও আরো অনেক ঘটনা রয়েছে যেগুলো কালের বিবর্তনে রূপকথার কাহিনীতে রূপান্তিরত হয়েছে।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং শয়তানী সমুদ্রের মধ্যে সম্পর্ক

এতদুভয়ের মাঝে সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। গবেষকদের দাবী- গায়েবকৃত প্লেন এবং জাহাজ এক ট্রাইএঙ্গেল থেকে অন্য ট্রাইএঙ্গেলের দিকে যেতে দেখা গেছে এমন বহু প্রমাণ বিদ্যামন। উভয় ট্রাইএঙ্গেলই একই আয়তন এবং এরিয়া নিয়ে গঠিত। যে রকম ঘটনা বারমুডার পানি এবং আকাশে ঘটতে দেখা গেছে, একই প্রকৃতির ঘটনা শয়তানী সমুদ্রেও (ফ্লাইং সোসার্সের আসা-যাওয়া, উপরে রাউন্ড দেয়া এবং পানির ভিতরে প্রবেশ করা আবার পানি থেকে উপরে উঠে আসার মত আশ্চর্য বিষয়) বহুবার সংগঠিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানেও যাত্রীবিহীন বহু জাহাজ দ্রুতগতিতে ভ্রমণ করতে দেখা যায়। বারমুডার মত এখানকার পানিতেও গরম ও শক্তিশালী ঢেওয়ের সৃষ্টি হয়। যার ফলে এতে বিশাল পর্যায়ের আকর্ষণশক্তির উদ্রেক হয়।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং কতিপয় মন্তব্য...

বারমুডায় গায়েব হওয়া সামুদ্রিক জাহাজ, নৌযান এবং বিমানসমূহের সম্পর্ক অধিকাংশই আমেরিকা এবং ব্রিটেনের সাথে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়- এ দু'দেশের সরকার কোন সময় না বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে নিয়েছে, আর না ঐ এলাকার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে জাহাজ বা প্লেনগুলির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। বরং এ ব্যাপারে যতগুলি গবেষণা টিম গঠন করা হয়েছে একটিরও রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়- পৃথিবীর কোন সরকারেরই এরকম কোন পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা নেই। একারণেই বহু সরকারী গবেষক প্রকাশ্যে জনসমক্ষে অস্বীকার করে বসে যে, এরকম কোন দুর্ঘটনা ঘটার মত এলাকার অস্তিত্ব বর্তমান পৃথিবীতে নেই।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে দুর্ঘটনার কারণ বিবরণে বহু কিছু লেখা হয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিজ্ঞানী, দক্ষ ভুমিবিশেষজ্ঞ (Geologists), প্রকৃতিবিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাতারবিশেষজ্ঞ এবং বুদ্ধিজীবি এমনকি ইহুদী-খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় প্রবক্তারাও পর্যন্ত এ ব্যাপারে তাদের মন্তব্যের বিবরণ দিয়েছে। প্রত্যেকের মন্তব্যেই নিজস্ব ধর্মকর্মের (Point of view)ছাপ স্পষ্ট প্রিরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে আমরা প্রসিদ্ধ কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করে তা নিয়ে আলোচনা করব।

যে সকল শক্তি বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল থেকে লোকদের মনযোগ সরাতে চায়, তাদের পক্ষ থেকে বলা হয় : "প্লেন এবং জাহাজকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সময়ে সময়ে বহু ঘটনাই ঘটে আসছে। সুতরাং বারমুডার ওখানেও যদি এরূপ কোন ঘটনা ঘটে থাকে, তবে আশ্চর্য হওয়ার কোন কিছু নেই।" এরকমই একটি মন্তব্য (The Bermuda Triangle Mystery Solved)নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (লেখক-লেরি কোশে) উল্লেখ করা হয়েছে :-

The accidents were not strange but only hyped up by the media and irrational sensationalist.

অর্থাৎ বারমুডায় সংগঠিত দুর্ঘটনাগুলি এত আশ্চর্য ও বিরলপ্রকৃতির ছিলনা; বরং মিডিয়া ও অযৌক্তিক কিছু তথ্যের ভিত্তিতে এটাকে বড় করা হয়েছে।

উল্লেখিত মন্তব্য ছাড়াও যে সকল গবেষক বারমুডার বাস্তবতা মেনে নিয়ে বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, তা নিম্নরূপ:-

(১) প্রাচীন যুগপ্রিয় খৃষ্টানদের ধারনা- বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল হচ্ছে জাহান্নামের দরজা।

(২) কিছু ব্যক্তি এ কথা বলে বারমুডার গুরুত্ব হ্রাস করার চেষ্টা করে যে, ওখানকার পানির গভীরতা খুব বেশি। সুতরাং জাহাজ বা প্লেন গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনা কোন আশ্চর্যের বিষয় না।

(৩) একদলের মন্তব্য- বারমুডার পানির অভ্যন্তরে শক্ত তুফান ও প্রবল পানি সঞ্চালনের সৃষ্টি হয়। ফলে তা জাহাজ ও প্লেনকে অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়।

(৪) বারমুডার পানিতে জলকম্পন সৃষ্টি হয়, ফলে দ্রুতগতিতে অনেক দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয়।

(৫) কতিপয় গবেষকদের মন্তব্য- ওখানে (Electric Magnetic Waves) বৈদ্যুতিক শক তৈরী হয়, যার ক্ষমতা আমাদের ব্যবহৃত বিদ্যুত থেকে হাজার গুন বেশি। অসম্ভব ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের গতি জাহাজকে তার নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেয়, আর উড়ন্ত প্লেনকে পানির নিচে টেনে নিয়ে যায়। একারণেই কম্পাস (দিক নির্ধারণকারী প্রযুক্তি) ওই স্থানে অকেজু হয়ে যায়। একটি হচ্ছে- বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে শয়তানী সমুদ্র।

কম্পাস অকেজু হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে- ওই দুই এলাকা ছাড়া দুনিয়ার কোথাও কোম্পাস ব্যবহার করেন, তার সুঁই উত্তর দিকে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা উত্তর দিকে নয়; বরং মেগনেটিক উত্তর দিকে হয়। কেননা ওই দুই এলাকায় কম্পাসের সুঁই উত্তর দিকে হয়। যারফলে ওখানে দিক নির্ধারণ কঠিন হয়ে পড়ে। এটিই মার্কিন সমুদ্রিক গবেষণা টিমের মন্তব্য:

The US Navy proposed the possibility of electromagnetic and atmospheric disturbances.

(৬) অধিকাংশ সাইন্সবীদদের মতে- এটি একটি সম্পূর্ণ সাইন্সি বিষয় :-

Most scientist attribute the disapparances to tricky ocean currents, hostile weather and human or technical error. In the area, compasses point to the

geographical North Pole rather then the magnetic north, which somthing makes navigation difficult causing accidents.

অর্থাৎ- অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা গুম হওয়ার ঘটনাগুলিকে উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গ, অনুপযোগী ঋতু এবং টেকনিক্যাল ত্রুটি মনে করে। বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের এরিয়ায় ভৌগোলিক অবস্থানে কম্পাস উত্তর দিকে হয়। মেগনেটিক উত্তর দিকে নয়। যদ্দরুন ওখানে দিক নির্ধারণ সমস্যা হয়ে পড়ে এবং দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাড়ায়।

(৭) এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী (Ed snedeker)এড স্লেডেকারের মন্তব্য :-

The atmosphere above the triangle is filld with invisible tunnels, which suck in the aircraft, ships and people.

"ট্রাইএঙ্গেলের উপরের আকাশে অদৃশ্য বহু শক্তিশালী বিষয় রয়েছে; যা প্লেন এবং জাহাজকে যাত্রীসহ পানির অতল গহবরে নিয়ে ছাড়ে।"

(৮) বারমুডার ব্যাপারে গবেষণাকারীদের অন্যতম চার্লস ব্রিটলজের ধারণা- ওখানকার পানির অভ্যন্তরে মেগনেটিক ভোরটেক্স বিদ্যমান। তাই শিকারকে টেনে ভেতরে নিয়ে যায়।

(৯) আরেক মতামত- বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ভেতরে ফ্লাইং সোসার্স আসা-যাওয়া করতে দেখা গেছে। ফ্লাইং সোসার্কে আরোহনকারী গোপন শক্তিরই ঠিকানা ওই এলাকা; যারা নিজেদের বিশেষ টার্গেট বাস্তবায়নকল্পে শক্তিশালী জাহাজ, প্লেন ও বিশেষ মানুষদের গুম করে থাকে।

(১০) আমেরিকার কিছু লোক এটাকে আত্মিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করে।

(১১) বাস্তব কথা যে, ওখানকার পানির গভিরে ছোট ছোট গর্ত দেখা গেছে।

(১২) এই এলাকাতেই প্রাচীন সভ্যতার সমাধি হয়; যা সংস্কৃতির উন্নত শিখড়ে পৌছেছিল এবং পানিতে সৃষ্ট প্রবল ঘুর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে এগুলো ধ্বংস হয়েছিল।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের বাস্তবতার ব্যাপারে উল্লিখিত মন্তব্যসমূহ ছাড়াও আরো অনেক মন্তব্য পাওয়া যায়। যেমন- "মেথিন গেস" থিউরি নামে একটি মন্তব্য প্রসিদ্ধ; যা ডক্টর বেন ক্লিনাল উল্লেখ করেছেন:-

Dr. Ben Clennel of Leeds University popularized the theory that methane locked below the sea sediments reduces the density of water making ships sink. He also claimed thet the highly combustible gas could also ignite aircraft engines, bellowing them up.

"লেডিস ইউনিভার্সিটির ডক্টর বেন ক্লিনাল মতামত প্রকাশ করেছেন যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ভেতরে সমুদ্রে নিচের "মেথিন গেস" রয়েছে; যা সমুদ্রের গভীরে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এগুলি সমুদ্রের গভীর থেকে বড় বড় মনিমুক্তার আকৃতিতে পানির উপরিভাগে চলে আসে। আর এ মনিমুক্তাগুলি স্পর্শ বা কোন আওয়াজের মাধ্যমে ফেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে তার গেস বের হয়ে পড়ে। ফলে ওখানকার পানির ঘনত্ব কমে যায়। যদ্দরুন জাহাজ-বুট ইত্যাদি ডুবে যায়।" তিনি আরো বলেন- "যেহেতু গেসগুলি অত্যাধিক দ্রুতগতির জ্বালানী শক্তিসম্পন্ন, তাই যদি তা আকাশে ছড়িয়ে পড়ে, তবে আকাশে উড়ন্ত প্লেনকেও মুহূর্তের মধ্যে এক ধামাকায় উড়িয়ে দিতে পারে।

(১৩) মিসরের প্রখ্যাত মুসলিম গবেষক মুহাম্মদ ঈসা দাউদের মতে- শয়তানী সমুদ্র আর বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল হচ্ছে "কানা দাজ্জালের" মালিকানা। সে ওখানে যথারীতি ট্রাইএঙ্গেলের আকৃতিতে স্বীয় আস্তানা নির্মাণ করেছে।

সামঞ্জস্য বিধান...

যারা মন্তব্য করে- বারমুডার ট্রাইএঙ্গেল কোন অসাধারণ বিষয় নয়। এ কথার পরিস্কার উদ্দেশ্য হচ্ছে- তারা জনসাধারনের মনযোগকে এথেকে সরাতে চায়। প্রথম মন্তব্য (বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল) জাহান্নামের দরজা। এক্ষেত্রে কোন ব্যাখ্যার দরকার নেই। দ্বিতীয় মন্তব্যটি এজন্য গ্রহণ করা যায়না যে, সমুদ্রের নিচে পানি যতই গভীরে থাকুক; এ অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে যেখানে মাছের পেটের মধ্যে পর্যন্ত ছোট ছোট ক্যামেরা ফিট করে সমুদ্রের গভীর এবং তলদেশের সকল যাবতীয় বিষয় নিয়ে গবেষণা চলছে, আর এত বড় বড় জাহাজ, সাবমেরিন আর বিমানগুলো অদৃশ্য হয়ে গেলো। কোন একটিও আজ পর্যন্ত কারো চোখে পড়লনা ???!!! বা তার কোন হদিস আজ পর্যন্ত জানা সম্ভব হলনা ???!!!

তৃতীয় মন্তব্য (ওখানকার পানিতে প্রবল ঝড় তৈরী হওয়া)-ও যুক্তিসঙ্গত মনে হয়না। কারণ, যতগুলো ঘটনা ঘটেছে, সবগুলি ঘটনার সময় ওখানকার আকাশ ও পানির অবস্থা স্বাভাবিক, স্বচ্ছ ও পরিস্কার ছিল। কোন ঝড়-তুফানের কথা তো আজ পর্যন্ত কেউ রেকর্ড করেনি। দ্বিতীয়ত- এটা আবার কেমন ঝড়-তুফান, যে কখনো শুধু জাহাজকে ডুবিয়ে দেয় আর যাত্রীদেরকে তীরে এনে ছেড়ে দেয় অথবা যাত্রীদের গায়েব করে জাহাজকে তীরে রেখে যায় ???!!!

চতুর্থ নাম্বার মন্তব্যে বলা হয়েছে যে, ওখানে মারাত্মক পানিকম্পন সৃষ্টির ফলে এ ধরনের দ্রুত জাহাজডুবির ঘটনা ঘটে থাকে। ঠিক আছে মেনে নেয়া যাক! কিন্তু উড়ন্ত প্লেনের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন ? পানিকম্পন সৃষ্টি হল পানির ভিতরে আর তিন হাজার-চারহাজার মিটার উপরে উড়ন্ত প্লেনও গায়েব করে দিল ??!! এটা আবার কেমন ধরনের কম্পন; যা সুদক্ষ ভূমিবিশেষজ্ঞরাও পর্যন্ত কোনসময় রেকর্ড করেনি এবং অত্যাধুনিক যন্ত্রেও এর কোন সংকেত পাওয়া যায়নি।

পঞ্চম মন্তব্যটি আপনি মনযোগ সহকারে পড়ুন। এব্যাপারে আমরা সামনে আলোচনা করব। কেননা এটাই ওই মন্তব্য যা বারমুডার পানিতে লুকায়িত "গোপন শক্তি" ইবলিস-দাজ্জালের বৈজ্ঞানিক উন্নতি বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে।

ষষ্ঠ নাম্বার মন্তব্যের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ গবেষক গিয়ান কাউসার (১৯৭০ সাল থেকে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের উপর গবেষণাকারী) বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যাখ্যান করে লিখেন :-

The rationalistic attempt to deny the mystery or fit it into existing scientific framework fails. The magnetic compass variation explanation is false because the Organic line (the area of difference in calculation) moves with the rotation of the earth and is not always inside the triangle to cause accidents. The methane gas theory also false. Since the Triangle area does not have vast gas reserves.

"বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের রহস্যের বেড়াজাল অত্যাধিক ঘন হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার অথবা এর অস্তিত্ব সাইন্সি অধ্যায়ে রাখার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রতিফলিত হয়েছে। মেগনেটিক কম্পাসের পার্থক্য সৃষ্টির ব্যাখ্যাটিও সঠিক নয়; কেননা কম্পাস উঠা-নামা বা কমবেশি হওয়া পৃথিবীর ঘূর্ণায়নের সাথে নড়াচড়া করে। আর এ পার্থক্যটা সর্বদায় ট্রাইএঙ্গেলের ভেতরেই হয়না; যদ্দরুন দুর্ঘটনার সূত্রপাত হয়। মেথন গেসের যে থিউরি বলা হয়েছে তাও ভিত্তিহীন। কেননা ট্রাইএঙ্গেলের ভেতরে গেসের কোন ভান্ডার বা খনি নেই।

গিয়ান কাউসার পরে বলেন :-

Despite science's efforts to create a Theory of Everything, earth still holds secrets that we can't fathom.

অনুবাদ- সাইন্টিফিক দৃষ্টিকোন থেকে "থিউরি অফ এভরিথিং" (এমন একটি মতবাদ, যা সৃষ্টির সকল

শক্তির ব্যাখ্যা খুজে বের করে)'র আবিস্কারের পরেও এখনও ভূমির নিচে এমন বহুসংখ্যক রহস্যময় বিষয় রয়েছে; যার এরিয়া পর্যন্ত আমরা পৌছতে পারবনা।

সপ্তম মন্তব্যে কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দরকার নেই। বরং ঐসকল বিজ্ঞানীদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা পরে করা যাবে। আট ও নয় নং মন্তব্যদুটি চিন্তা-গবেষণার দিকে আহবান করে; সামনে বর্ণনা করা হবে ইনশাল্লাহ...।

একাদশ নং মন্তব্যে এ কথা বলা হয়েছে যে, ওখানকার পানিতে ছোট ছোট অনেক গর্তের মত কিছু বিষয় লক্ষ করা গেছে। কিন্তু ঐ গর্তগুলোর কোন সাদৃশ্য বা আকার-আকৃতির ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি; নাকি তা বলার অনুমতি নেই ??!! আবার গর্তগুলো এমনিতেই বনে গেছে ??!! না কোন সুসংগঠিত শক্তি এগুলো বানিয়েছে। বরং এতটুকু অবশ্যই ঘটেছে, যে কোন ব্যক্তি এই গর্তগুলোর ব্যাপারে জানার চেষ্টা করেছে বা কিছু জেনে ফেলেছে, তাকে পানির অভ্যন্তরেই খতম করে দেয়া হয়েছে।

দ্বাদশ নং মন্তব্যের সম্পর্ক পুরাতন দৈত্য-দানবিক ইতিহাসের সাথে। মুসলিম গবেষক মুহাম্মদ ঈসা দাউদ মিসরীর মন্তব্য সম্পর্কে যতদূর জানা যায়- উনি দাজ্জালের ব্যাপারে সুগভীর গবেষণা করে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে বহু গ্রন্থ উম্মতে মুসলিমাকে উপহার দিয়েছেন। লেখকের কাছে ওই কিতাবগুলো বিদ্যমান ছিল; কিন্তু বর্তমানে হাতে নেই। থাকলে বহু তথ্য পাঠকদের সামনে পেশ করতে পারতাম।

যে সকল স্থানসমূহের সাথে দাজ্জাল বা ইহুদী গোপন সংগঠন "ফ্রেমেসন" এর সম্পৃক্ততার সংবাদ পেয়েছেন, ওই স্থানসমূহে মুহাম্মদ ঈসা দাউদ নিজে গিয়ে গবেষণা করেছেন। যেমন- মিসর, ফিলিস্তীন, আমেরিকা ও বারমুডা ইত্যাদি। বিশেষত ফিলিস্তীন ও মিসর থেকে কিছু পুরাতন পুস্তকও তিনি হাতে পেয়েছেন। ওখানকার বয়স্ক লোকদের থেকেও উনি এমন বহু তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন যার বর্ণনা আরবদের মধ্যে সীনা-বসীনা চলে আসছে। উনার মতামতের ব্যাপারেও আমরা সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখিত সকল মতামত ও তার ব্যাখ্যা জানার পর আমরা এ কথা বলতে পারি যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে গবেষণাকারীদের মধ্যে যারা ওই এলাকাকে ভয়ানক স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাদের দলীলগুলোই বেশি ভারী মনে হয়।

আরো একজন গবেষক "পি পর বাথ" তার রচনা (Bermuda Triangle: Energy Filed or Time Warp)-এ অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও গবেষণার পর লিখেন- "পরস্পরবিরোধী সব ব্যাখ্যা বিশ্লেষন সত্ত্বেও একটি আশংকাজনক বিষয় হচ্ছে যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ভেতরে আশ্চর্যজনক কিন্তু অসম্ভব শক্তিশালী পর্যায়ের কিছু ব্যাপারের অস্তিত্বের কথা কতিপয় বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেছেন। তবে এটা কারো জানা নেই যে, কেন এবং কিভাবে ওই এলাকা অসম্ভব শক্তিশালী ব্যাপারসমূহের কেন্দ্র হয়েছে !

জ্বী হ্যাঁ....! বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের রহস্যময় পানিতে এক শক্তিশালী "গোপন শক্তি"র অস্তিত্বের ব্যাপারে অধিকাংশ গবেষকই একমত। কিন্তু ওই রহস্যময় "গোপন শক্তি" কি ??!! কে এটাকে কন্ট্রোল করছে ??!!

কিছু গবেষকের ধারণা- ওখানে প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক জ্যোতি তৈরি হয়; যা আমাদের নিত্যব্যবহৃত বিদ্যুতের তুলনায় প্রায় এক হাজার গুণ বেশি শক্তিসম্পন্ন। ফলে তার পানিতে চলতি জাহাজ বা তার আকাশে উড়ন্ত প্লেনকে টেনে পানির ভেতরে নিয়ে যায়। ইংরেজীতে এটাকে "ইলেক্ট্রো মেগনেটিভ ওয়াভস" (Electromagnetic Waves) বলা হয়। এই থিউরি সর্বপ্রথম জেমস ক্লার্ক ১৮৭৩ সালে পৃথিবীবাসীর সামনে তুলে ধরেছিলেন।

আপনি অতি সহজেই আন্দাজ করতে সক্ষম হবেন যে, আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত বিদ্যুৎ এত

ক্ষমতাসম্পন্ন; যে, এর মাধ্যমে বড় বড় মেশিন চালানো হয় এবং বিশাল বিশাল প্লেনকে উড়িয়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়। আবার এই পৃথিবীরই কোন একস্থানে এমন বিদ্যুতের অস্তিত্ব রয়েছে যা এর থেকে লাখো গুণ বেশি শক্তিসম্পন্ন। যাকে আমাদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও আজপর্যন্ত ব্যবহারের অধীনে আনতে ব্যর্থ রয়েছে। কেননা বারমুডায় বিদ্যমান "গোপন শক্তি" এই শক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির; যা আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা খুব ভাল করেই জানে।

প্রসিদ্ধ জিয়োফিযিক্স বিজ্ঞানী "জন কেরষ্টোই" বলেন- "ওখানকার (বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের) ভেতরে এবং উপরে এক বিশেষ শক্তির অস্তিত্ব রয়েছে। ওই বিশেষ শক্তি আমাদের পরিচিত শক্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির।"

জন কেরষ্টোই এখানে আরো দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন- "যদি কোন বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার ভিত্তিতে ওই বিশেষ শক্তি ব্যবহারে সফল হয়ে যায়, তাহলে ওই শক্তির দ্বারা চালিত বস্তুসমূহ বর্তমানচালিত বস্তুগুলো থেকে লাখোগুণ বেশি দ্রুত ও শক্তিসম্পন্ন হয়ে যাবে। একশ বৎসরের কাজ কয়েক দিনে সম্পন্ন করে দেবে।" একটু চিন্তা করেন- যদি ওই বিশেষ শক্তির মাধ্যমে কোন প্লেনকে উড়ানো হয়ে, তবে তার গতি কত দ্রুত হতে পারে!! কয়েক মিনিটে সারা পৃথিবী ভ্রমণ; এমন মনে হবে যে, তার জন্য পৃথিবীটাকে এমন মুচড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেমন কোন কাগজ মুচড়িয়ে হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলা হয়। এমন এক বিশেষ আরোহনের বস্তু; যা দেখতে দেখতে আপনার চোখ থেকে গায়েব হয়ে যায়- আকাশের মধ্যে বিচরণ করবে, সমুদ্রের নিচে আস্তানা গেড়ে নিবে, যাকে ইচ্ছা দূর থেকে টেনে কাছে নিয়ে আসবে, বিদ্যুৎচালিত সকল বস্তু অকেজো করে দেবে। এমনকি এ অসম্ভব শক্তির মাধ্যমে ভূমি নড়াচড়ার মত বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে এবং একদিনকে প্রলম্বিত করে এক বৎসরের সমান করে দেয়া হবে।

সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে- পানির নিচেও কি এমন বৈজ্ঞানিক বিদ্যমান রয়েছে যারা ইতিমধ্যেই এই শক্তি অর্জন করে ফেলেছে ??!!!

আধুনিক প্রযুক্তি এবং "গোপন শক্তি"......

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে লুকায়িত যে গোপন শক্তির কথা "জন কেরষ্টোই" উল্লেখ করেছেন- তা প্রায় সকল গবেষক ও বৈজ্ঞানিক মেনে নিয়েছেন। সুতরাং আমরাও যদি মেনে নেই যে, হ্যাঁ... ঐ এলাকায় আসলেই এমন বিশেষ গোপন শক্তি বিদ্যমান; যা বিশালাকারের জাহাজগুলিকে ডুবিয়ে দেয় এবং আকাশের উড়ন্ত প্লেনগুলিকে টেনে পানির ভেতরে নিয়ে যায় ! তারপরেও একটি প্রশ্ন বাকী থেকে যায়- ঐ "গোপন শক্তি" কি সুসংগঠিত ??!! নাকি না ??!! অর্থাৎ কেউ কি এটাকে কন্ট্রোল করছে ??!! নাকি কন্ট্রোলের বাইরে ??!! যদি সুসংগঠিত না হয়, তবে তো ঐ এলাকার উপর স্যাটেলাইট জ্যাম (অকেজো) হয়ে যাওয়ার কথা। কেননা এতবড় ম্যাগনেটিক ময়দানের উপর স্যাটেলাইট কাজ না করাই উচিত। অথচ এমনটি নয়। ঐ এলাকার উপর সহস্র স্যাটেলাইট কাজ করছে। কখনো কোনরূপ সমস্যার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। তবে কোন কোন সময় এমন হয়েছে যে, স্যাটেলাইট কিছু কিছু ঘটনার ভিডিও ধারণ করে ফেলেছে। কিন্তু পর্দায় ছবি পরিস্কার (সাদা) ছিল (ভিডিও উঠেনি)।

এখানে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার ভাইদের উদ্দেশ্যে আমার আবেদন :- বন্ধুগণ! আপনি আপনার কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের উপর অতিরিক্ত ভরসা করবেন না। যাতে এমনটি না হয় যে, আপনি সকল ডাটা (তথ্য) হার্ডডিস্কে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছেন। অতপর কোনদিন দরকারি কোন বিষয় জানার জন্য আপনার কম্পিউটার অন করে দেখেন- Windows এর পরিবর্তে স্ক্রীনে শুধু আকাশের তারকা ঝলঝল করছে। তাই সাথীগণ ! নিজের সকল ডাটা কালির কলমে লিখে বা প্রিন্ট করে নিজের হেফাজতে রাখবেন। তাহলে আগামীকাল আর পস্তানো লাগবেনা।

এরই ভিত্তিতে ল্যাঙ্গেভেট কলেজের সুদক্ষ প্রকৃতিবিজ্ঞানী "প্রফেসর ওয়াইন মিথ জিন" বলেন :- "যদি এ ধরনের ম্যাগনেটিক পাওয়ার আটশত কি: মি: উপর পর্যন্ত ভিডিওকে সাদা বানিয়ে ফেলে। তাহলে অবশ্যই ওই এরিয়ায় চলিত সকল বিমানের চলাচলে বাধা আসার কথা। কেননা এ ধরনের ম্যাগনেটিক শক্তি তার এরিয়ায় বিমানকে উল্টিয়ে তছনছ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।" কিন্তু এমনটি হচ্ছেনা। আর এটাই ওখানে কোন অজানা রহস্যময় কোন "গোপন শক্তি"র অস্তিত্বের দিকে ইঙ্গিত করে; যা থেকে আমরা স্বভাবতই সম্পূর্ণ বেখবর ও উদাসীন রয়েছি। দ্বিতীয় কথা- যদি ম্যাগনেটিক শক্তির ফলে এ ধরনের (জাহাজডুবি-বিমান গায়েব) ঘটনা ঘটত, তবে ওই এলাকা দিয়ে অতিক্রমকারী সকল বস্তুই দুর্ঘটনার স্বীকার হত। কিন্তু এমনটি হয়নি। বরং দুর্ঘটনা বিশেষ সময় বা বিশেষ বাহন বা বিশেষ ব্যক্তিত্বকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে। যদি আপনি এ কথা মেনে নিতে কুন্ঠাবোধ করেন, তাহলে নিম্নোক্ত ঘটনাটির আপনি কি ব্যাখ্যা দেবেন ??!! :-

"আমার 'সেলষ্ট' নামক জাহাজটি ১৯৭২ সালের শুরুর দিকে কোনরূপ যান্ত্রিক দুর্ঘটনা ছাড়াই হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়। গায়েব হওয়ার স্থানে চিরুনী অভিযান চালিয়েও জাহাজের কোন হদিস খুজে পাইনি। এর কয়েক মাস পর জাহাজটি সমুদ্রপৃষ্ঠে ভাসমান দেখা যায়। অনুরূপ ঘটনা "লাদাহামা" নামক জাহাজের সাথেও হয়েছে।"

দ্বিতীয়বার আবার আপনি এই মন্তব্যটি পড়েন এবং চিন্তা করেন- কোন মতামত কি এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারে ??!! জাহাজটি যদি প্রচন্ড তুফান বা ম্যাগনেটিক শক্তির কবলে পড়ত, তাহলে তো পরবর্তীতে তার কোন অস্তিত্বই না থাকার কথা। বিপরীতে জাহাজটি সম্পূর্ণ সঠিক অবস্থায় ছিল, ভেতরের সকল মেশিনও ষ্টার্ট অবস্থায় ছিল, ইঞ্জিনও ফিট ছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণ পেট্রোলও তাতে মজুদ ছিল। আপনি বলেন পারেন- হতে পারে কোন জলদস্যু তা গুম করেছিল। তাই যদি হয়, তবে ক্যাপ্টেনের কামরায় আলমারীতে রাখা মূল্যবাণ হীরা-জওহর আর দামী দামী জিনিসপত্র সাথে নিয়ে গেলনা কেন ??!! তবে জাহাজের সকল যাত্রী গায়েব ছিল। এটা আবার কেমন ডাকাত- যাত্রীদেরকে সাথে নিয়ে যায়, বিনিময়ে কারো কাছে ফোনে কোন টাকা-পয়সাও চায়না। এথেকেও আশ্চর্য বিষয়- কয়েক মাস পানির নিচে ডুবে থাকার পরও জাহাজটি কি করে সঠিক অবস্থায় সমুদ্রপৃষ্ঠে এসে গেল ??!!

যদি এই "গোপন শক্তি" সুসংগঠিত না-ই হয়ে থাকে, তাহলে দুর্ঘটনার কবলে পড়া প্লেনগুলিকে কখনো কেউ সমুদ্রে পতিত হতে দেখলনা কেন ??!! পাইলট এয়ারপোর্ট অফিসে কোন জরুরী বার্তা প্রেরণ করতে পারলনা কেন ??!! বিমানের কোন হদিস পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আরো আশ্চর্য- কখনো যাত্রী গায়েব, জাহাজ তীরে দন্ডায়মান। আর কখনো জাহাজ গুম, যাত্রীগণ বিনাজাহাজে তীরে উপস্থিত (বলতে পারেনা তারা কিভাবে তীরে পৌছেছে)।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ভাল করে স্মরণ রাখা দরকার যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং শয়তানী সমুদ্রে গায়েব হওয়া মালবাহী জাহাজগুলির মধ্যে অধিকাংশই সেনাবাহিনীদের ব্যবহৃত আসবাব ও রসদে ভরপুর ছিল। তাছাড়া যে সকল মানুষকে গুম করা হয়েছে তারাও যুগের সুদক্ষ ও পারদর্শী লোক ছিল। সুতরাং এ কথা মানা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই যে, ওই এলাকায় অবশ্যই কোন "গোপন শক্তি" বিদ্যমান; যারা এই ম্যাগনেটিক পাওয়ারকে তাদের প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার করছে এবং এ বিষয়ে পুরোপুরি কন্ট্রোলিং ক্ষমতা অর্জন করেছে।

কে সেই ব্যক্তি ??

এই অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিকে সুসংগঠিত করে ব্যবহার করছে কে ?? কোন সে শক্তি- যারা একে এতই আয়ত্বাধীন করেছে যে, আকাশে উড়ন্ত বিমানকে পর্যন্ত মুহুর্তের মধ্যে গায়েব করে ফেলে ?? অথবা আধুনিক বিমানগুলির ভেতরের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন মেশিনগুলো জ্যাম করে দেয় ?? ওই এলাকার উপরে থাকা স্যাটেলাইট ক্যামেরা বা গবেষণার কাজে নিয়োজিত প্লেন থেকে যদি কোন ফটো বা

ভিডিও ধারণ করা হয়, তাহলে ছবির ফিল্ম সাদা থাকে কেন ?? অর্থাৎ বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ভেতরে বিদ্যমান "গোপন শক্তি" এতই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মালিক হয়ে গেছে যে, দুনিয়ার সবচে অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট ক্যামেরাকে তারা হাজার কি: মি: দূর থেকে অকেজো (সাদা) করে দিতে সক্ষম।

এমনই একটি প্রশ্নমূলক রচনা তৈরী করেছেন বারমুডার উপর গবেষণাকারী "প্রফেসর হের ভেল্ডাইল ডিউস"। যার শিরোনাম লিখেছেন- "দ্রুত শক্তিসম্পন্ন এ বিষয়গুলো সত্য ও বাস্তব, কিন্তু এগুলো আসে কোত্থেকে ??" Gravity Pulses Confirmed, But Where do they come from ?? তাহলে কি আমাদের পরিচিত বিশ্ব এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিকগণ ব্যতিত বিশ্বেরই কোন এক "গোপন শক্তি" সাইন্স ও টেকনোলজীতে বহু উন্নতির শিখড়ে পৌছে গেছে ??!! দুই তিন শত বৎসর পূর্বে থেকে কি এই শক্তি বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ?? এই অসম্ভব ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু থেকেই কি দ্রুতগতির (ফ্লাইং সোসার্স) বাহনগুলো তৈরী করা হয়েছে ??!!

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল... অজানা এক গোপন আস্তানা...

ফ্লাইং সোসার্স বেশির ভাগ সময়ই ট্রাইএঙ্গেলের এলাকায় ঘুরাঘুরি করতে দেখা গেছে। পাশাপাশি আগুনের বড় বড় গোলা, সাদা আলোকোজ্জ্বল মেঘ এবং ফ্লাইং অবজেক্টগুলিকে ট্রাইএঙ্গেলের সমুদ্রে প্রবেশ হতে দেখা গেছে। এছাড়াও অজানা অপরিচিত প্লেন আকাশ থেকে ওখানকার সমুদ্রে এমনভাবে প্রবেশ করতে দেখা গেছে; যেমন সমুদ্রে নয় বরং রানওয়েতে লেন করছে।

যদি আপনি মেঘগুলো দেখেন- তার এক অংশ আকাশের বহু উচুয় আর অন্য অংশ বারমুডার পানিতে প্রবেশ করছে। অথবা আগুনের বড় বড় গোলা আকাশে উড়ছে বা কারো পিছু পিছু তাড়া করছে। এই দৃশ্য দেখে আপনি এর কি ব্যাখ্যা দেবেন! এভাবেই বড় বড় প্লেন হাজারো লোকের চোখের সামনে দিয়ে সমুদ্রের ভেতরে প্রবেশ করছে; অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়- ওখানে গমনের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য সমুদ্রে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে।

কুইন এলিজাবেথ প্রথম" নামক জাহাজে উপস্থিত 'জন সিন্ডরে"র বর্ণনা :-

"আমি 'কুইন এলিজাবেথ প্রথম' জাহাজে করে নাসা থেকে নিউয়োর্কের উদ্দেশ্যে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম। আকাশ সম্পূর্ণ পরিস্কার এবং নিরব ছিল। ভোরবেলা ছাদে দাড়িয়ে একবন্ধুকে নিয়ে আমি কফি পান করছিলাম। হঠাৎ ছোট্র একটি প্লেন আমার দৃষ্টিগোচর হল। প্লেনটি দুইশ

গজ দূরে দুইশ ফিট উপর থেকে অবতরণের উদ্দেশ্যে সোজা আমাদের দিকে আসছিল। আমার বন্ধু সিডনীকে আমি এদিকে মনোনিবেশ করালাম। অতপর প্লেনটি আমাদের থেকে পচাত্তর গজ দূরে জাহাজের অতি নিকটেই চুপিসারে সমুদ্রের ভেতরে প্রবেশ করে গেল। প্লেন পতিত হওয়ারও কোন শব্দ শোনা যায়নি এবং পানিরও কোন আওয়াজ বা নড়াচড়া পরিলক্ষিত হয়নি। মনে হচ্ছিল যে, ওই প্লেনটির জন্য সমুদ্রের মুখ খোলা ছিল। আমি সিডনীকে ওখানে রেখে সোজা তদন্ত অফিসারকে এর সংবাদ দেওয়ার জন্য উনার কাছে চলে গেলাম। উনি জাহাজের মোড় ঘুরিয়ে ওই স্থানে আসলেন এবং তদন্তের একটি ছোট নৌকা-ও পানিতে নামালেন। কিন্তু ওখানে কোনই চিহ্ন বা তেলের নিদর্শন ছিলনা। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, প্লেনটি কোন দুর্ঘটনার শিকার হয়নি। অন্যথায় প্লেনের ভেতরে বিদ্যমান তেল পানির উপরিভাগে অবশ্যই পরিলক্ষিত হওয়ার কথা ছিল। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার- পতিত হওয়ার সময় পানিতে কোন শব্দ হলনা কেন! বা পানি উতলিয়ে উঠলনা কেন!!

পানির ভেতরে প্লেন প্রবেশ করার আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ফ্লোরিডার উপকূলেও ঘটেছে; যা ১৯৫৩ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারী সকালবেলায় উপকূলে উপস্থিত সব জনসাধারণই নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছে। প্লেনটি তীরের একশ গজ দূরে ছিল। তৎক্ষনাৎ কোষ্ট গার্ড এবং ওখানে নিয়োজিত নিরাপত্তাবাহিনী দুর্ঘটনার স্থানে বহু খোজাখোজির পরও কোন সুরাহা বের করতে সক্ষম হয়নি। তেলেরও কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। আরো চিন্তার বিষয় যে, আশপাশের এয়ারপোর্টগুলিতে তখনই যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু কোথাও কোন প্লেন গুম হওয়ার খবর জানা যায়নি। তাহলে প্লেনটি কার ছিল ?! কোত্থেকে এসেছিল এবং এত নিরবে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের সমুদ্রে সে কার কাছে চলে গেল ??!!

আগুনের গোলা এবং ট্রাইএঙ্গেল ...
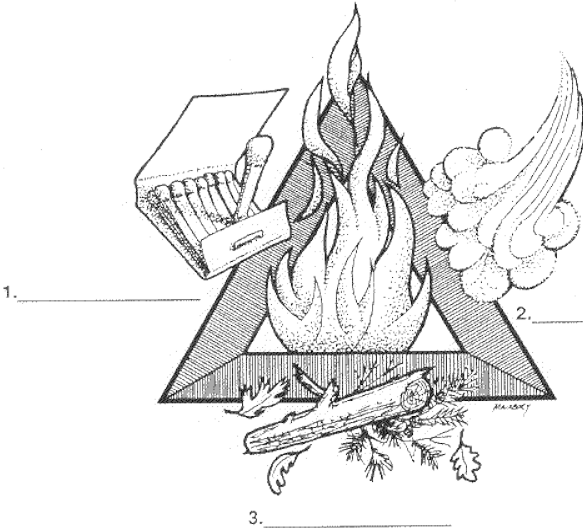
আগুনের গোলা, সাদা উজ্জল মেঘ এবং ফ্লাইং সোসার্স। এগুলোতে যদি গভীর ভাবে লক্ষ করা হয়- তবে সবগুলোকে একই পর্যায়ের বিষয় মনে হয়। এমন মনে হয় যে, ফ্লাইং সোসার্সগুলিকে লোকানের জন্য এধরনের সাদা উজ্জল মেঘ এবং জ্যোতি আণবিক শক্তির মাধ্যমে অভিনব পদ্ধতিতে তৈরী করা হয়। বারমুডার পানিতে আগুনের বিশাল বিশাল গোলা প্রবেশ করাও প্রসিদ্ধ একটি ব্যাপার। ডব্লু জি মরসে" এমনই এক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন। উনার বর্ণনামতে ১৯৫৫ সালের কোন একদিন "আটলান্টিক সিটি" নামক জাহাজে কাজ করছিলেন। সময়টা ছিল সকালবেলা। ওয়াচ অফিসার আমার কাছে এসে দাড়ালেন। কিছুক্ষন পর হঠাৎ উনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন। তখন জাহাজটি উন্মাদের মত এক গোল চত্বরে বলের মত ঘুরছিল। আমি দেখলাম- আগুনের একটি বিরাট গোলা দ্রুতগতিতে আমাদের জাহাজের দিকে আসছিল। আমি ভয়ে ছাদে শুয়ে পড়লাম। এক সাথী আমাকে দেখে তার কাছে টেনে শুইয়ে দিল। ওই আগুনের গোলাটি আমাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করে গেল। এরপর আমরা দেখি যে, সমুদ্রে ভয়ানক অবস্থায় ঢেও উতলিয়ে উঠছিল। আমরা দ্রুত দৌড়ে ক্যাপ্টেনের কক্ষে গিয়ে দেখি- কম্পাস (দিক নির্ধারণকারী মেশিন) অকেজো হয়ে গেছে। সারাটা পথেই কম্পাস অকেজো অবস্থায় ছিল।

বিজলী এবং রহস্যময় মেঘ...

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের আকাশে অত্যন্ত উজ্জল সাদা মেঘ এবং রহস্যময় বিজলীর মত বিষয় প্রত্যক্ষ করা গেছে। "কলাম্বিস" আমেরিকা ভ্রমণকালে এমনই কিছু উজ্জল মেঘ এবং রহস্যময় বিজলীর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। তার লাগেজ ব্যাগ (ডায়েরী) যা তার নিজের জাহাজ থেকে উদ্ধার হয়েছিল; তাতে লেখা ছিল : "আগুনের এক ভয়ানক গোলা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠে সাদা আলোকোজ্জ্বল কিছু দৃশ্য"।

গবেষকদের দাবী- এটি প্রাকৃতিক কোন মেঘ নয়। কেননা এ মেঘগুলি সম্পূর্ণ পরিস্কার আবহাওয়ায় স্বচ্ছ আকাশে প্রতক্ষ করা গেছে; যেখানে সাধারণ মেঘের কোন নিদর্শন পর্যন্ত ছিলনা। হঠাৎ চোখের সামনে চলে আসে। বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের পানিতে এগুলো উঠা-নামা করতে দেখা গেছে। এই ভয়ানক মেঘের ভেতরে যদি কোন প্লেন ঢুকে পড়ে, তবে একেও অস্বাভাবিক ও ভয়ানক সব পরিস্থিরি সম্মুখীন হতে হয়। বরং প্লেন এবং জাহাজ এগুলির ভেতরে গায়েব হওয়ার রেকর্ডও পর্যন্ত আছে। আপনি ফ্লাইট-১৯ এর গায়েব হওয়া পাঁচটি প্লেনের একজন পাইলটের সর্বশেষ বার্তাও পড়ে এসেছেন; যেখানে সে বলছিল "আমরা সাদা পানির ভেতরে প্রবেশ করতে চলেছি।"

এই সাদা পানি আসলে উজ্জল মেঘ। এতে প্রবেশ করার পর পাইলটের চোখে আকাশ-যমিন-পানি সবকিছুই গড়বড় হয়ে যায়। ফলে সে দিক নির্ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। জাহাজ ও প্লেনের সকল যান্ত্রিক মেশিন অকেজো হয়ে যায়। পাইলট ও ক্যাপ্টেনের উপর এক অজানা ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়।

১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে "চেক ভেকলে" নামক এক পাইলট "এন্ড্রোস থেকে "মিয়ামি" ট্রেনিংসফরে বিমানের বামদিকে হঠাৎ একপ্রকার বিজলী প্রকাশ হতে দেখে। প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই বিমানের সকল যান্ত্রিক মেশিন অকেজো হয়ে যায়। এই ঘটনার পর পাইলট নিজেও এক উজ্জল ঘটনা হয়ে রয়ে যায়।

বহু জাহাজ ও সামুদ্রিক যান এ ধরনের সাদা মেঘের খপ্পরে পড়ে চিরদিনের জন্য গায়েব হয়েছে। "ক্যাপ্টেন ডন হেনরি" পর্যন্ত একবার এমন এক রহস্যময় মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছিলেন। ওই সময় সে তার টাগ (জাহাজকে টেনে নেয়ার জন্য ব্যবহৃত শক্তিশালী ষ্টীম বুট) দ্বারা একটি জাহাজ টেনে আনছিলেন। ডন হেনরি সাহস হারালেন না। অজানা শক্তির সাথে অনেক টানাটানি করার পর অবশেষে জাহাজটিকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছিলেন। তার বর্ণনামতে- টাগের সার্বিক বিদ্যুৎ-পাওয়ার কোন অজানা ও রহস্যময় শক্তি যেন চুসে ফেলেছিল।

তদ্রুপ এমনই একটি মেঘ "সিসনা-৭২" নামক প্লেনেরও পিছু নিয়েছিল। চিন্তা করেন- কোন মেঘ কি কোন সময় প্লেনের পিছু নেয় ??!! অতপর ঐ প্লেনটির মেশিনগুলো সাময়ীকভাবে অকেজো হয়ে যায় এবং সঠিক রাস্তা থেকে সরে যায়। হঠাৎ পাইলটের মৃত্যু ঘটে। এই ঘটনা স্বয়ং ওই বিমানে উপস্থিত যাত্রীই বর্ণনা করেছেন।

"বুনানযা" নামক প্লেন এন্ডরোসের সীমানা পার হতেই রুইয়ের মত ঘূর্ণায়মান রহস্যময় মেঘের ভেতরে ঢুকে যায় এবং তার সাথে রেডিও যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এর চার মিনিট পরেই তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। কিন্তু পাইলট তখন নিজেকে ফ্লোরিডায় আবিস্কার করে। গ্যাসের সুই পেট্রোলের পরিমাণ পূর্বের পরিমাণ থেকে পচিশ গেলন বেশি দেখাচ্ছিল; যতটুকু ঐ সময় প্লেনে মজুদ থাকার কথা ছিল। এটা ঐ পরিমাণেই ছিল; যতটুকু এন্ডরোস পর্যন্ত ভ্রমণ করতে দরকার ছিল। তার মানে হচ্ছে- বিমানটি ফ্লোরিডা পর্যন্ত যান্ত্রিক শক্তিতে নয়; বরং রহস্যময় মেঘের শক্তিতে পৌছেছিল।

ব্রিটিশ রেজিমেন্ট... মেঘ কোথায় নিয়ে চলল !!

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় "গিলিপোলি"র গুরুত্ব কয়েকটি কারণে খুবই প্রসিদ্ধ হয়েছিল। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী এবং তুর্কী সেনাবাহিনী পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানে ছিল। ঘুমছান যুদ্ধের প্রস্তুতি। কারণ, "গিলিপোলি"তে তুরস্ক সৈনিকদের পরাজয় মানেই সারা তুরস্কে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশদের দখল প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশ সৈনিকেরা বিজয় করতে করতে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। পূর্ণ বিজয়ের খুব কাছাকাছি পর্যায়ে ছিল। তাছাড়া ঐদিন (১৯১৫ এর ২৮ আগষ্ট) আকাশও সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পরিস্কার ছিল। হঠাৎ এলাকার উপর কিছু মেঘের খন্ড প্রকাশিত হল। ঐ খন্ডগুলোর নিচে আরো একটি বিরাটাকারের মেঘখন্ড ভেসে উঠল; যা ভূমি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। মেঘের ঐ খন্ডটি আটশত ফিট লম্বা এবং দুইশত ফিট প্রশস্ত ছিল। বাতাস থাকা সত্ত্বেও মেঘ স্বস্থানে স্থিতিশীল ছিল। ঐ সড়কের আগে একটি পাহাড়ী "হিল সিক্সটি" এলাকা ছিল। যেখান থেকে ব্রিটিশ বাহিনী তুর্কী বাহিনীর উপর আক্রমন করছিল। অতপর একটি ব্রিটিশ রেজিমেন্ট (দি ফোর্স্ট ফোর্থ নারফোক) পাহাড়ে বিদ্যমান রসদপত্র উঠানোর জন্য ঐ সড়ক দিয়ে আসছিল। কিছুক্ষন পর তারা সেই মেঘে ঢুকে পড়ল। যেহেতু মেঘের আকৃতি অন্ধকার প্রকৃতির ছিল, তাই পেছনের সেনারা বুঝতে পারছিলনা যে, সম্মুখবাহিনী মেঘের ভেতরে প্রবেশ করছে। সুতরাং সবাই ধীরে ঐ মেঘের ভেতরে ঢুকতে লাগল। পরবর্তীতে তাদের কেউই আর "হিল সিক্সটি" পৌছেনি। একঘন্টা পর যখন সর্বশেষ সেনা মেঘে ঢুকে পড়ল, তখন রহস্যময় মেঘ নিরবে তাদের উপরে উঠিয়ে নিল। উপরে যেয়ে মেঘের খন্ডটি অন্যান্য মেঘখন্ডের সাথে মিশে গেল। অতপর সকল মেঘ এদের নিয়ে দ্রুত বুলগেরিয়ার দিকে চলতে লাগল এবং দেখতে দেখতে সবকিছু চোখের আড়ালে চলে গেল।

ঐ রেজিমেন্টের ব্যাপারে ধরে নেয়া হয় যে, তারা নিহত হয়ে গেছে বা সকলেই তুর্কীদের হাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে তুরস্ক বলেছে যে, এমন কোন রেজিমেন্টের কথা তারা জানেও না। এই রেজিমেন্টে আটশ থেকে চারহাজার সেনাজোয়ান বিদ্যমান ছিল। এত বিশাল পরিমাণ সৈন্যবাহিনী কোন নাম-নিশানা ছাড়াই গায়েব হয়ে গেল এবং কোন হদিস পর্যন্ত পাওয়া গেলনা যে, তারা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ঘটনাটি যদিও বারমুডার বাইরের ঘটনা; কিন্তু তা রহস্যময় মেঘের সাথে সম্পৃক্ত।

ঘড়ির টাইম থমকে যাওয়া...(Time Warp)

এ ধরনের রহস্যময় মেঘ ও বিজলী অনেক সময় ঘড়ির টাইমকে গড়বড় করে দেয়। কখনো ফার্স্ট পাওয়া গেছে আর কখনো স্লো। যেমন- ন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের একটি বিমান দশ মিনিটের জন্য রাডার থেকে গায়েব ছিল। পাইলট বলেছে যে, সে তখন রহস্যময় বিজলীর ভেতরে আটকে গিয়েছিল। রানওয়েতে লেন করার পর খবর হয় যে, সকল যাত্রীদের ঘড়ি এবং স্বয়ং বিমানের ক্রোনোমিটার ঠিক দশ মিনিট স্লো হয়ে গেছে। অথচ রানওয়েতে অবতরণের আধা ঘন্টা আগেও তারা ঘড়ি চেক করেছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ইষ্টার্ন এয়ারলাইন্সের একটি বিমানের। উড়ন্ত অবস্থায় হঠাৎ বিমানে একটি ঝটকা লাগে। ফলে সে তার রাস্তা ভুলে যায়। তারপরও বিনাক্ষয়ক্ষতিতে রানওয়েতে সফলভাবেই লেন করে। বিমানের কর্মচারী এবং যাত্রীগণ দেখে যে, তাদের সবার হাতের ঘড়ির কাটাগুলো বন্ধ। আর এটা ঐ সময় থেকে শুরু হয়েছিল- যখন বিমানটি ঝটকার সম্মুখীন হয়েছিল।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের উপর সাদা উজ্জল মেঘের ভেতর যে সকল প্লেন বা জাহাজ ঢুকে পড়েছিল, এদের কেউ সময় থমকে যাওয়ার মত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কখনো দশ মিনিট গায়েব, কখনো আধা ঘন্টা পর্যন্ত কোন হদিস পাওয়া যায়নি।

ঘড়ির টাইম অন্য কোন দিকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে সর্বপ্রথম মন্তব্য পেশ করেছিল "আলবার্ট আইনষ্টাইন"। কিন্তু আমাদের নবীজী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বহুকাল পূর্বেই এর প্রতি ইঙ্গিত করে গেছেন। দাজ্জাল সম্পর্কে হযরত নাওয়াছ বিন ছামআন রা. বর্ণিত হাদিসে দাজ্জালের পৃথিবীতে অবস্থানের কাল বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলে কারীম সা. বলেছিলেন যে, সে (দাজ্জাল) দুনিয়াতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। এর প্রথম দিন হবে এক বৎসরের সমান। দ্বিতীয় দিন একমাসের সমান। তৃতীয় দিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর অবশিষ্ট দিনগুলি সাধারণ দিনের মতই হবে। (মুসলিম শরিফ)

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে এরকম রহস্যপূর্ণ ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা তাহলে কিভাবে দেয়া হবে ??!! এই উজ্জল মেঘই বা কি ! যার ভেতরে প্লেন, জাহাজ এমনকি মানুষ পর্যন্ত গায়েব হয়ে যায়। এর অভ্যন্তরে প্রবেশকারীদের জন্য টাইম থমকে যায় বা অন্য কোন দিকে সরে যায়। এধরনের মেঘ বরাবরই বারমুডার পানিতে প্রবেশ করতে দেখা গেছে।

অনেক প্রত্যক্ষদর্শী এবং অনানুষঙ্গিক গবেষকদের দাবী- রহস্যের মায়াজালে বেষ্টিত এ ঘটনাগুলো ফ্লাইং সোসার্সের সাথে সম্পৃক্ত। ফ্লাইং সোসার্স প্রকাশের সময়ই এধরনের ঘটনা সংঘটিত হয় এবং এসব মেঘ, বিজলী, গোলাকৃতির উজ্জ্বল জ্যোতি এবং বড় বড় আগুনের গোলা প্রকৃতপক্ষে ফ্লাইং সোসার্সেরই একটি রূপ।

তা না হলে (Flying saucer)ফ্লাইং সোসার্সই বা কি ??!! তাহলে ঐ "গোপন শক্তি" ম্যাগনেটিক পাওয়ারের উপর গবেষণা করে ফ্লাইং সোসারও তৈরী করে ফেলেছে ??!! ফ্লাইং সোসার কি তাহলে মিথ্যা-বানোয়াট কল্পকাহিনী নয় ??!! ঐ ফ্লাইং সোকারে করে ভ্রমণকারীরা (যাদেরকে মহাকাশপ্রাণী বলা হয়) তারা মহাকাশপ্রাণী নয়; বরং আমাদের মতই মানুষ ???!!

ফ্লাইং সোসার্স
(Flying Saucers)

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের প্রকৃত হাক্বীকত জানতে হলে অবশ্যই ফ্লাইং সোসার সম্পর্কে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। এই ফ্লাইং সোসার কি ?! আর বারমুডা ট্রাইএঙ্গেরের সাথেই বা এর কি সম্পর্ক ??!!

ফ্লাইং সোসার সম্পর্কে ছোটকাল থেকেই তো আপনারা বহু কিছু পড়ে আসছেন। কিন্তু এখনও এ বিষয়গুলো ছেলেখেলা বা তোষামোদের জন্যই পড়া হয়।

ফ্লাইং সোসারকে সংক্ষেপে (U. F. O)অর্থাৎ Unidentified Flying Objects (অশনাক্ত উড়ন্ত বস্তু) বলা হয়। এগুলো কোন অত্যাধুনিক বস্তু বা প্লাষ্টিক কোন বিষয় দ্বারা তৈরী। দূর থেকে এগুলো অত্যাধিক সাদা উজ্জ্বল আলো বা জ্যোতির মত দেখা যায়। একই ফ্লাইং সোসার মুহুর্তের মধ্যে তার আকার অধিক ছোটও করতে পারে এবং এমন অনেক বিশাল আকৃতিও ধারণ করতে পারে- যা দেখে দর্শক সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়। ফলে কখনো কখনো অনেকে তা দেখে অচেতনও হয়ে পড়ে। সাধারণত এর ভেতর থেকে কমলা, নীল ও লাল রঙ্গের আলো ফুটতে থাকে। এর গতি এতই দ্রুত যে, দেখতে দেখতেই চোখের আড়াল হয়ে যায়। সর্বশেষ রেকর্ডকৃত তার গতি হচ্ছে- প্রতি সেকেন্ডে সাতশত (৭০০) কিলোমিটার। তাহলে প্রতি ঘন্টায় তার গতি দাড়াবে- পচিশ লক্ষ বিশ হাজার (২৫২০০০০) কিলোমিটার। এটা হচ্ছে রেকর্ডকৃত গতির পরিমাণ। আর প্রকৃত গতি সম্পর্কে কারো জানা নেই।

আকাশের একই স্থানে দাড়িয়ে (থেমে) থাকতে পারে। বিভিন্ন বস্তুকে দূর থেকে টেনে নিতে পারে। যদি কেহ (কোনকিছু) কাছে যায়, তাহলে তার দেহে এক প্রকার কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়; চোখে জ্বালাতন সৃষ্টি হয় এবং শরীরে কারেন্টের শকের মত ঝটকা অনুভূত হয়। দুনিয়ার সকল যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক এবং যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত সকল মেশিনকে জ্যাম করতে সক্ষম (আমেরিকায় এমনটি হয়েছিল- ২০০৭ এর ৯ জুন পূর্বউপসাগরীয় এলাকা আটলান্টা এবং জর্জিয়ায়। আকাশপথে চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যারফলে হাজারো বিমানের চলাচল থেমে গিয়েছিল। তার কারণ ছিল- বহির্বিশ্বের যাবতীয় বিমানের আকাশপথ কন্ট্রোলিং ক্ষমতা হঠাৎ ফেল হয়ে যাওয়া)। এই ফ্লাইং সোসার লেজার বীমের সাহায্যে দুনিয়ার অত্যাধুনিক

সব শক্তিশালী প্লেনসমূহকে অতি সহজেই ধ্বংস করে দিতে পারে। পাশাপাশি সাগরের উপরে এবং নীচে সমানভাবে চলতে সক্ষম।

ফ্লাইং সোসার নিয়ে নির্ভীক গবেষক ডক্টর হাইছোব বলেন- এগুলো অপরিচিত কিছু বস্তু। মনে হয়- তারা (ফ্লাইং সোসার অধিকারীরা) শক্তিশালী ম্যাগনেটিক স্থান তৈরী করতে সক্ষম। যারফলে তারা জাহাজ এবং বিমানকে দূর থেকে টেনে কোন অজানা স্থানে নিয়ে যায়। নিচে

ফ্লাইং সোসারের কিছু নমুনা নিচে দেয়া হল, (যেগুলো ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রকাশ হতে দেখা গেছে)

ফ্লাইং সোসার... চোখের ধাঁধাঁ নাকি বাস্তব!!

ফ্লাইং সোসার এযাবৎ পৃথিবীর বহু এলাকায় প্রত্যক্ষ করা গেছে। কিন্তু বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ন্যায় এর বাস্তবতাকেও গড়মড় করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ কেউ তো এর অস্তিত্বেরই অস্বীকার করে বসেছে। এ

ব্যাপারে একটি মন্তব্য ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, তারা হচ্ছে মহাকাশপ্রাণী। এরা ফ্লাইং সোসার্সে করে আমাদের পৃথিবীতে ঘুরাঘুরি করতে আসে।" এ মন্তব্যটি আসলে বাস্তবতার উপর পর্দা ঢালার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বৈ কিছু নয়। ফ্লাইং সোসার্সের অস্তিত্বের অস্বীকার এ কারণে সম্ভব নয়; কারণ, তাদের প্রত্যক্ষদর্শীদের সংখ্যা অনেক। একসাথে একসময়ে হাজারো দর্শকের উপর মিথ্যার অপবাদ দেয়া যায়না। বিগত কয়েক বৎসরে ফ্লাইং সোসার্স দৃশ্যায়নের ভিডিও-ও কিছু মানুষ ধারণ করেছে।

ফ্লাইং সোসার্স যখন বেশি পরিমাণে দেখা যেতে শুরু করে, তখন কিছু রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে এবিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ১৯৭৬ সাল থেকে জাতিসংঘ এব্যাপারে নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা শুরু করে। ফ্লাইং সোসার চিহ্নিতকারী আধুনিক ক্যামেরা জাগায় জাগায় ফিট করার জন্য সকল দেশের উচ্চপদস্থ লোকদের প্রতি আদেশ জারী করে। যাতে এদের মতিগতি যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করা যায়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে একটি সংবাদ প্রচার করা হয়, যারপ্রেক্ষিতে একতৃতীয়াংশ মার্কিন জনগণ মনে করতে থাকে যে, ফ্লাইং সোসার্স আরোহীরা আমাদের দেশে এসে পৌছেছে।

সুতরাং যখন ফ্লাইং সোসার্স এত বেশি পরিমাণে প্রকাশ হতে শুরু করে যে, এদেরকে চোখের ধাঁধাঁ বলে আর ধোকা দেয়া সম্ভব না, তখন বিশ্ব ইহুদী ফেতনাবাজরা এটাকেও বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের মত বানোয়াট কল্পকাহিনীর অংশ বানানোর চেষ্টা করে।

অধম লেখকও আকাশে এধরনের জ্যোতি দুইবার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সহ প্রত্যক্ষ করেছে। "আমি একবার কিছূ সাথীদের সাথে একটি উচু স্থানে দাড়ানো ছিলাম। ধীরে ধীরে অন্ধকার বাড়তেছিল। অদূরে সামনের দিকে একটি কমলা রঙ্গের জ্যোতি দেখা গেল এবং আস্তে আস্তে তা সোজা উপরের দিকে উঠে সামনের দিকে চলে গেল। প্রথমে তো মনে হল- হেলিকপ্টার। কিন্তু যেভাবে এই জ্যোতি উপরের দিকে উঠেছে, তাতো হেলিকপ্টারের হয়না। পাশাপাশি এলাকাটি ছিল এমন, যেখানে হেলিকপ্টারের কোন স্থান ছিলনা। না কোন মিসাইল ছিল! না এমন বস্তু; যাকে অন্য কোন নাম দেয়া যায়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ভোরে ছেহরীর সময়। একটি প্রবল সাদা জ্যোতি আমাদের উপর দিয়ে অতিক্রম করল; যা জমিনের খুবি কাছাকাছি ছিল। জ্যোতি এত প্রবল ছিল যে, তার আকারও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল; ক্যাপসুলের ন্যায়। না কোন বিমান ছিল, না কোন হেলিকপ্টার। কারণ, যদি হেলিকপ্টার হত তাহলে এত কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা এর আওয়াজ শুনতে পেতাম। কিন্তু এ জ্যোতির কোন আওয়াজ ছিলনা। এটাকে চোখের ধাঁধাঁ বলেও উড়িয়ে দেয়া যায়না, কারণ, লেখক ছাড়া আরো দু'জন সাথীও তা প্রত্যক্ষ করেছিল।

ফ্লাইং সোসার দেখা যাওয়ার ঘটনা আজকালের ঘটনা নয়; বরং পৃথিবীতে যখন থেকেই শয়তানী শাসন আমেরিকার নেতৃত্ব শুরু হয়েছে তখন থেকেই এর ইতিহাস শুরু হয়েছে। অর্থাৎ পনের শতাব্দি থেকে এর উত্থান, যেখানে ১৪০০ সালের জুনেও ফ্লাইং সোসার্স দেখার ঘটনা রেকর্ডে বিদ্যমান। আপনি যদি ইতিহাস অধ্যয়ন করেন- দেখবেন, এ পনের শতাব্দিকেই বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শতাব্দি মনে করা হয়। তখন থেকেই ফ্লাইং সোসার্স পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যেতে শুরু করে। এখানে আমরা সংক্ষিপ্তরূপে শুধুমাত্র ২০০৮ সালে মাসভিত্তিক ফ্লাইং সোসার প্রত্যক্ষ করার ঘটনাগুলো পেশ করছি (যা বিভিন্ন দেশের রেকর্ড থেকে সংগৃহীত) :-

জানুয়ারী-	৪৪৩ বার।	ফেব্রুয়ারী-	৩৫২ বার।
মার্চ-	৩১২ বার।	এপ্রিল-	৪২০ বার।
মে-	৩১৭ বার।	জুন-	৪১৯ বার।
জুলাই-	৪৯৫ বার।	আগষ্ট-	৪৪৮ বার।
সেপ্টেম্বর-	৩৫২ বার।	নভেম্বর-	৩৯৩ বার।

মার্কিন সমুদ্র বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা "ডন ক্যাম্পবেল" ১৯৫২ সালের এপ্রিলে আকাশভ্রমণ করছিলেন। উনি দেখলেন- দু'টি ফ্লাইং সোসার দ্রুতগতিতে তার প্লেনের দিকে আসছে। কাছে এসে ফ্লাইং সোসার দুটি প্লেনের দুইদিকে চক্কর দিচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল- তারা প্লেন তল্লাশি করছে। এরপর ক্যাম্পবেল ওয়াশিংটন ফিরে এসে মার্কিন আকাশপথ তদন্ত কমিটিকে বিষয়টি অবগত করলে কমিটি এবং সিআইএর কর্মকর্তারা তাকে বলে দেয় যে, "যদি চাকরি বাচাতে চান তাহলে যা দেখেছেন সব ভুলে যান।"

মার্কিন এয়ারফোর্স ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত ফ্লাইং সোসার্স নিয়ে তদন্ত ও গবেষণা করে। তখন ফ্লাইং সোসার্স দেখা যাওয়ার যে ঘটনাগুলো রিপোর্ট করা হয়েছিল তার সংখ্যা হচ্ছে ১২৬১৮টি।

ফ্লাইং সোসার্স অধিকারীরা এই প্রচেষ্টা করেছিল যে, পৃথিবীবাসী যাতে তাদেরকে আকাশপ্রাণী বা অন্য গ্রহের প্রাণী মনে করে। এজন্য তারা স্বীয় আকৃতিকে ভিন্ন অদ্ভূত আকৃতি বানিয়ে মানুষের চোখে প্রকাশিত হয়েছে। তাই তাদের নাম দেয়া হয় (Aliens)অর্থাৎ পরদেশী বা বিদেশি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে- তারা পরদেশী নয়; বরং তারা এ পৃথিবীতেই জন্ম নেয়া আমাদের মত কতিপয় মানুষ, যারা বিশ্বকুফরী শক্তির গডফাদারদের থেকে সহযোগীতা পেয়ে থাকে। বর্তমানে হলিউডে এলিয়েন নিয়ে ফিল্ম নির্মাণ করে মানুষদের অন্তরে তাদের মহাকাশপ্রাণী হওয়ার বিষয়টি বসিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। নিচে হলিউডের তৈরী করা এদের কিছু ছবি লক্ষ করুন...

মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে ফ্লাইং সোসার্স অধিকারীদের সাক্ষাত...

১৯৫১ সালে একবার একটি ফ্লাইং সোসার মার্কিন কোন এক সেনাবিমানঘাটিতে অবতরণ করে। অবতরণের পর ফ্লাইং সোসার থেকে তিনজন মানুষ বের হয় যারা ইংরেজীতে কথা বলছিল। তারা "আইজন হাওয়ার" (যে পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট হয়েছিল) এর সাথে আলাপ করার জন্য বলল। তখন ওখানে উপস্থিত সেনা অফিসারগণ মার্কিন প্রেসেডিন্ট আইজন হাওয়ারের (১৯৫৩-১৯৬১) সাথে যোগাযোগ করলে চারঘন্টা পর আইজন হাওয়ার নিজে সেখানে উপস্থিত হয়ে ফ্লাইং সোসার অধিকারীদের সাথে আলোচনায় বসল। আলাপকালে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাথে আরো তিনজন নিরাপত্তারক্ষী ছিল। সবচে' আশ্চর্যের ব্যাপার- ওই

সময় এয়ারপোর্টের সকল কার্যক্রম কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ ছিল। তাই কোন সেনা অফিসার কোথাও নড়াচড়া বা যাওয়া আসা করতে পারেনি। কোন কাজও হয়নি এবং কোন প্লেনও আকাশে উঠেনি। সম্পূর্ণ এমারজেন্সি অবস্থা জারী করা হয়েছিল। কিছুক্ষণ পর ফ্লাইং সোসার্স ওখান থেকে গায়েব হয়ে যায়। সংবাদটি ১৯৫৬ সালে প্রসিদ্ধ মার্কিন প্রফেসর "লীন" মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে প্রচার করেন। কিন্তু মিটিংয়ে কি আলাপ-আলোচনা হয়েছিল, এ ব্যাপারে কোন কিছু জানা সম্ভব হয়নি।

১৯৭৬ সালে পোর্টোরিকো (বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের সীমান্তে অবস্থিত এলাকা)য় ফ্লাইং সোসার্স এত প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়েছিল যে, এগুলো দেখার জন্য মহাসড়কে পর্যন্ত ট্রাফিক জ্যাম লেগে গিয়েছিল। গাড়ীর ইঞ্জিনগুলো হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। টিভি, রেডিও এবং প্রেসের সকল সংবাদকর্মী ফ্লাইং সোসার্সের তান্ডব দেখার জন্য একত্র হয়েছিল। প্রায় তিন মাস পর্যন্ত ফ্লাইং সোসার্স ওখানে সময়ে সময়ে এমনভাবে প্রকাশ হতে থাকে যে, মনে হয় এটি সাধারণ কোন ব্যাপার। কারো কিছু যায় আসেনা।

হোয়াইট হাউসে ফ্লাইং সোসার্স...

১৯৫২ সালের ১৩ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত ওয়াশিংটন ডিসির আকাশে প্রচুর পরিমাণে ফ্লাইং সোসার্স পরিলক্ষিত হয়। এমনকি এক রাতে প্রায় বিশটি ফ্লাইং সোসার্স পর্যন্ত দেখা যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। এ বিশটি ফ্লাইং সোসার্স হোয়াইট হাউসের উপর ঘুরতে থাকে। সেসময় মার্কিন জনমনে একপ্রকার আতংক বিরাজ করছিল। প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য জেড বিমান আকাশে উঠে। কিন্তু ফ্লাইং সোসার্স অধিকারীগণ তাদের সাথে ইদুঁর-বিড়ালের খেলা খেলতে থাকে। যখনই বিমান তাদের কাছে পৌঁছে, সাথেসাথে চোখের পলকেই ফ্লাইং সোসার্স বিদ্যুৎগতিতে তাদের থেকে বহুদূর চলে যায়। তারপর বিষয়টি মার্কিন জনসাধারণ ও প্রেসের সংবাদে চলে আসলে প্রেসিডেন্ট "ট্রোমিন" নিজে ফ্লাইং সোসার্স নিয়ে গবেষণাকারী প্রযুক্তি "প্রজেক্ট ব্লিউব্যাক" এর সাহায্যে ক্যাপ্টেন "এ্যাডওয়ার্ড জে"র পাইলটের সাথে আলাপ করে তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু তার উত্তর শুনে আপনি অবাক হবেন- একজন ক্যাপ্টেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের সামনে ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে দাবী করে, পরিস্কার অস্বীকার করে বসে এবং বিবৃতি দেয় যে, রাডারে যা কিছু পরিলক্ষিত হয়েছে এর সবই প্রাকৃতিক বিষয় ছিল।" কিন্তু এ মিথ্যা বিবৃতির পেছনে ক্যাপ্টেন শুধু একা ছিলনা; বরং এর সমর্থনে তার সাথে একটি সুসংগঠিত দলও ছিল- যারা কামনা করত যে, প্রকৃত অবস্থা কেউ না জানুক।

ফ্লাইং সোসার্স হোয়াইট হাইসের উপর চক্কর লাগানোর সময় স্বয়ং ক্যাপ্টেন "রেপিল্ট" ওয়াশিংটন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার অবগতি হয় তাদের টিভি সংবাদের মাধ্যমে। তখন তিনি নিজে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করার আবেদন করলে পেন্টাগন কর্তৃপক্ষ তাকে সরকারী গাড়ী ব্যবহারের অনুমতিটুকুও দিতে রাজী হয়নি। তাকে বলা হয়- আপনি যদি পরিস্থিতি তদন্ত করতে চান, তাহলে নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে ট্যাক্সি ভাড়া করে যান (আমেরিকায় বিদ্যমান উচ্চপদস্থ লোকেরা এটাই চায় যে, বারমুডা এবং ফ্লাইং সোসার্সের ব্যাপারে কখনো কোন তদন্ত বা গবেষণা না করা হোক)। আশা না হারিয়ে উনি সোজা "উহাইয়ো"এ অবস্থিত ঐ প্রজেক্টের হেডকোয়ার্টারে পৌছে রাডার স্পেশালিষ্টদের কাছে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারাও জবাব দিয়ে দেয়- "অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক গোলযোগের দরুন রাডারে কোন কোন সময় এমন অজানা আকৃতি প্রকাশ হয়ে থাকে"।

১৯৫২ সালের ২৯ জুলাই এ বিষয়ে আমেরিকার এয়ারফোর্সে জেনারেল "এন, ই, স্যানফোর্ড" পেন্টাগনে উপস্থিত বহু সংখ্যক সাংবাদিকদের সামনে একটি প্রেস কনফারেন্স করেন। সাংবাদিকগণ তাকে এ বিষয়ে খুব ধারালো এবং জটিল-কঠিন প্রশ্ন করা শুরু করলে জেনারেলও তাদেরকে "ক্যাপ্টেন জেমসে"র

বিবৃতি শুনিয়ে দেয়। কিন্তু সাংবাদিকগণ তার জবাবে সন্তুষ্ট হয়নি। স্বয়ং ক্যাপ্টেন রেপিল্টও তার জবাবে সন্তুষ্ট ছিলেন না। কারণ, ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টে (যেখানে রাডারে ফ্লাইং সোসার্স প্রকাশিত হয়েছিল) যখন রাডারকর্মীদের সাথে আলাপ করছিলেন, তখনও কোন জেনারেল এন, ই, স্যানফোর্ডের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিলেননা।

পাবলিক ও সাংবাদকর্মীদের মাঝে যখন এ বিষয়ে শুরগোল ও মাতামাতি শুরু হয়, তখন ১৯৫২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র সাইন্সি বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে এক মেমোরিন্ডম জারী করা হয় যে, যেখানে ফ্লাইং সোসার্স নিয়ে গবেষণা করাকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সাব্যস্ত করে দেয়া হয়। একটু চিন্তা করেন- ফ্লাইং সোকার্সে কি এমন রহস্য লুকায়িত; যাকে মার্কিন প্রশাসন পর্যন্ত গোপন রাখতে চায় এবং এ নিয়ে তদন্ত ও গবেষণা করাকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করা হয়।

ফ্লাইং সোসার্স পাকিস্তানে...

২০০০ সালের ২৯ আগষ্ট রবিবার "ডেরা গাজী খান" এলাকায় ফ্লাইং সোসার্স দেখা যায়। দুই সপ্তাহ পর এই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ এলাকায় ফ্লাইং সোসার্স পূণরায় দেখা যায়। দৈনিক ডন" এর দেয়া সংবাদ মতে এই ফ্লাইং সোসার্স পশ্চিম দিক থেকে এসে "ফোর্ট মেনরো" এবং "রাখীগঞ্জ"এর উপর দিয়ে উড়ে Baghalchor এবং Roughin এর মাঝামাঝি মাটিতে অবতরণ করে। বর্ডার মিলিটারীর লোকেরা স্থানীয় লোকদের বরাত দিয়ে বলে যে, ফ্লাইং সোসার্স সোজা মাটিতে অবতরণ করে। ইসলামাবাদের প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ প্রচার করে যে, এটা কোন মিযাইল পরীক্ষা ছিল। একই বৎসরের ১৫ আগষ্ট "রাজনপুর" এয়ারবিসের কাছাকাছি আরো একটি ফ্লাইং সোসার দেখা যায়। একই তারিখে বেলুচিস্তানেও এ ধরনের ছয়টি জ্যোতি লক্ষ করা গেছে বলে স্থানীয় সংবাদকর্মীরা জানায়।

অটকঃ নির্ভরযোগ্য একজন ব্যক্তি লেখকের কাছে বর্ণনা করেছে যে, ১৯৯৫-৯৬ সালের কোন এক সন্ধায় স্থানীয় এলাকা "অটকে" সে নিজ বাড়ীতে অবস্থান করছিল। হঠাৎ তার উপর দিয়ে ত্রিভোজের আকৃতিতে অত্যন্ত নীচ দিয়ে একটি কি যেন অতিক্রম করে গেল। তদন্তের জন্য তার পেছনে পেছনে এয়ারবিসের একটি বিমান উড়ে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর তা ফিরে চলে আসে। তখন সে মনে করল যে, মনে হয় এটা আরো মানুষ দেখেছে এবং সংবাদেও এ নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে। কিন্তু এমনটি হয়নি। (এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে যেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ঠোট জ্বলে যায়, সেখানে তো সাধারণ এক পাকিস্তানী বহু দূরের কথা)

লাহোরঃ ২০০৮ সালের ৮ অক্টোবর সন্ধা ৮-০৫ মিনিটে লাহোরে "আমান করীম সাহেব" আটটি ফ্লাইং সোসার্স প্রত্যক্ষ করার দাবী করেছেন। তার বর্ণনামতে- এগুলো V এর আকৃতিতে পূর্ব দিকে যাচ্ছিল।

রাওয়ালপিন্ডিঃ ১৯৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে রাওয়ালপিন্ডির "আসিফ ইকবাল সাহেব"এর বর্ণনা মতে- উনি এবং উনার এক বন্ধু ফজরের নামাযের কিছু পূর্বে ঘরের ছাদে দাড়ানো ছিলেন। এমন সময় আকাশে এমন কিছু জ্যোতি লক্ষ করলেন যেগুলির রং বারবার পরিবর্তিত হচ্ছিল। তার দাবী- এগুলো ফ্লাইং সোসার্স ছিল। কেননা এই কালারগুলি অন্য কোন বস্তুর হতে পারেনা। আসিফ ইকবাল সাহেব হচ্ছেন রাওয়ালপিন্ডির মাইক্রোটেক ইনষ্টিটিউট অব ইনফরমেশান টেকনোলোজী (প্রাইভেট) এর নেটওয়ার্ক এডমিনিষ্ট্রেটর।

ফ্লাইং সোসার্স ইন্ডিয়ায়...

২০০৮ সালের ২৩ জানুয়ারী ইন্ডিয়ায় পাঁচটি ফ্লাইং সোসার্স একসাথে দেখা যায়। এগুলি কয়েক মিনিট পর্যন্ত জমিনের খুব কাছাকাছি থেকে ঘুরাফেরা করছিল। স্থানীয় লোকেরা মোবাইলের মাধ্যমে এর

ভিডিও-ও ধারণ করে।

একই বৎসরের ২৮ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ভারতের মুম্বাই শহরের "গেটওয়ে ইন্ডিয়া" নামক সমুদ্রতীরে পর্যটকদের ভীড় ছিল। অনেক মানুষ মুভি-ভিডিও এবং মোবাইল ভিডিও এর মাধ্যমে সমুদ্রের দৃশ্য ভিডিও করছিল। বিকালবেলা দিনের আলো চারিদিক ছড়ানো ছিল। হঠাৎ উপকূলের খুব কাছে অত্যন্ত নিকটে একটি বিরাটাকারের ফ্লাইং সোসার দৃশ্যমান হয়। তৎক্ষনাৎ মুভিমেকারগণ ওদিকে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ভিডিও করা শুরু করে। চার সেকেন্ড পর্যন্ত এ দৃশ্য ফিল্মে দৃশ্যমান ছিল। এরপরই দেখতে দেখতেই তা গায়েব হয়ে যায়। ফ্লাইং সোসারটি বড় আকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল; যা ভিডিওতে সম্পূর্ণ স্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

"জিমি কার্টার"ও ফ্লাইং সোসার্স দেখেছেন...

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট "জিমি কার্টার" (শাসনকাল ১৯৭৭-১৯৮১) একমাত্র মার্কিন প্রেসিডেন্ট যিনি নিজে ফ্লাইং সোসার দেখার দাবী করেছিলেন। জিমি কার্টারের বক্তব্য-

I don't laugh any more at people when they say they have seen UFOs because I have seen one myself (An Interview to ABC news)

"আমি ঐসকল লোকদের উপর কখনই হাসি-ঠাট্টা করিনা- যারা ফ্লাইং সোসার্স স্বচক্ষে দেখার দাবী করে। কেননা আমি নিজেও একটি ফ্লাইং সোসার্স স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি। (এবিসি নিউজে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে তিনি একথা বলেন)

জিমি কার্টারের বর্ণনায়- তিনি যখন ১৯৬৯ সালে জর্জিয়ার লাইন্স ক্লাবের একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। উনার সাথে পরিবার-পরিজনও সেখানে ফ্লাইং সোসার্স প্রত্যক্ষ করেছিল। তখন তিনি ওয়াদা করেছিলেন যে, জর্জিয়া থেকে ফেরার পর আমেরিকায় ফ্লাইং সোসার্সের উপর গবেষণা ও তদন্ত করার জন্য বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞদের একটি টীম গঠন করবেন।

কিন্তু জিমি কার্টার আমেরিকার প্রেসিডেন্টে হওয়ার পরও স্বীয় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সক্ষম হননি। কেন ??!! তাহলে কি আমেরিকাতেই অন্য কোন শক্তি বিদ্যমান; যারা মার্কিন প্রশাসন অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ??!! তাহলে কি ফ্লাইং সোসার্স অধিপতির সামনে মার্কিন প্রেসিডেন্টও ব্যর্থ ??!! তাহলে কি "গোপন শক্তি" জিমি কার্টারকে এই হুমকি দিয়েছে যে, যদি জানের মায়া থাকে, তাহলে ফ্লাইং সোসার্স ভুলে যাও ??!!

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে অস্বাভাবিক সব দুর্ঘটনা একের পর এক ঘটেই চলেছে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় রেকর্ডকৃত তথ্য প্রচারের উপর শক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কেউ এগুলো প্রচার করতে পারবেনা, বিতরণও করতে পারবেনা। ঐ রিপোর্টগুলোর মধ্যে- ফ্লাইং সোসার্স আকাশে দেখা যাওয়া, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের পানিতে এগুলো প্রবেশ করা এবং বারমুডার পানির হাজার ফুট নিচে এগুলো দৃশ্যমান হওয়া ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

ঐ রিপোর্টকেও শক্তভাবে দমন করা হয়েছে যেখানে বর্ণিত ছিল যে, ১৯৬৩ সালে পোর্টোরিকোর পূর্বসমুদ্র উপকূলে মার্কিন সামুদ্রিক গবেষণা কমিটি ভ্রমণের সময় ফ্লাইং সোসার্স প্রত্যক্ষ করেছিল; যার গতি ছিল দুইশ নাট। এটি সমুদ্রের গভীরে সাতাইশ হাজার ফুট নিচে দিয়ে চলছিল।

ফ্লাইং সোসার্স প্রত্যক্ষকারীদের কাছে তৎক্ষনাৎ কালো কাপড় পরিহিত কিছু লোক এসে যায়। যারা দর্শককে ঘটনা বর্ণনা না করার জন্য সতর্ক করে দেয়।

যেমনটি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ন্যায় ফ্লাইং সোসার্সের বাস্তবতাও গোপন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

এমনকি উড়ন্ত প্লেনও ফ্লাইং সোসার্সের পেটে...

মার্কিন আকাশপথ গবেষণার এয়ারবিসের এক রাডারে একবার একটি ফ্লাইং সোসার্স প্রকাশ হয়। তৎক্ষনাৎ মার্কিন বোমারো জেট বিমান F-86 তার পিছু নেয়। বিমানটি ফ্লাইং সোসার্সের তালাশে আকাশে অনেকক্ষন ঘুরাঘুরি করে। হঠাৎ রাডারস্ক্রীনে বসা মার্কিন কর্মী দেখে যে, ফ্লাইং সোসার্সটি সোজা বিমানের দিকে আসছে। সাথে সাথে সে পাইলটকে সতর্ক করার জন্য বার্তা প্রেরণ করে। মুহুর্তের মধ্যেই এমন মন হল যে, ফ্লাইং সোসার্সের সাথে বিমানটির সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু পরে রাডারে শুধু ফ্লাইং সোসার্সই দেখা যায়। বিমানের কোন দৃশ্য দেখা যায়না। অতপর রাডারে বসা কর্মীগণ ফ্লাইং সোসার্সের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে মুহুর্তের মধ্যেই ফ্লাইং সোসার্স গায়েব হয়ে যায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, ফ্লাইং সোসার্স বিমানটিকে গলদগরণ করে ফেলেছে। অতপর মার্কিন সেনাবিমান এবং আকাশপথ তদন্তকারী বিমান আকাশে বহু খোজাখোজি করার পরও অত্যাধুনিক টেকনোলজী এর কোন হদিস খুজে বের করতে সক্ষম হয়নি। এমনকি কোন দুর্ঘটনার নিদর্শনও তাদের হস্তগত হয়নি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে মার্কিন সেনা ট্রান্সপোর্ট বিমানের সাথে। যার ভেতর ২৬ জন সেনাও বিদ্যমান ছিল। প্রথমটির মত এর মধ্যেও ফ্লাইং সোসার্স রাডারে দেখা গিয়েছিল। রাডারে বসা মার্কিন কর্মীর কাছে এমন অনুভুত হল- যেমন হঠাৎ একটি বল এসে রাডারের সামনে পতিত হয়েছে। আসলে এটি বল ছিলনা; ছিল ফ্লাইং সোসার- যা হঠাৎ তার সামনে প্রকাশ হয়েছিল। অতপর তা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মার্কিন সেনাট্রান্সপোর্ট বিমানের দিকে আসছিল। রাডারে বসা কর্মী পাইলটকে সতর্ক করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে সুযোগ আর মেলেনি এবং দেখতে দেখতে ফ্লাইং সোসার বিমানের সাথে এরকমভাবে মিশে গেল, যেমন- দুই শরীর একসাথে মিশে যায়। মনে হচ্ছিল- ফ্লাইং সোসার বিমানটিকে ২৬ জন সেনাসহ একেবারে গিলে ফেলেছে। এরপর ফ্লাইং সোসারের গতি আরো দ্বীগুণ বেড়ে যায় এবং মুহুর্তের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যায়। তৎক্ষনাৎ মার্কিন আকাশপথ গবেষণাকারী একটি টিম আকাশ এবং সমুদ্রে বহু খোজাখোজি করে। কিন্তু ফলাফল যথারীতি শূন্য।

ফ্লাইং সোসার্সের পিছু গমন... ভয়াবহ পরিণাম

"ক্যাপ্টেন থমাস মেন্টেল" একটি বড় আকারের ফ্লাইং সোসারের পিছু গমন করতে গিয়ে জানের মায়া হারিয়েছেন। ১৯৪৮ সালের ৭ জানুয়ারী ক্যাপ্টেন মেন্টেল P-51 তে করে যাত্রা শুরু করে। যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল বড় একটি ফ্লাইং সোসারের পরিচয় সত্যায়ন করা। ফ্লাইং সোসারটি দিনের বেলায় খোলা আকাশের একটি স্থানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ফ্লাইং সোসারের পিছু গমনের সময়ই ক্যাপ্টেন মেন্টেলের মৃত্যু সংঘটিত হয় এবং বিমানটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে আকাশের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। বিমানটির যে টুকরাগুলো যমিন থেকে পরে উদ্ধার করা হয়, তা দেখে মনে হয় যে, বিমানটির উপর মারাত্মক ধরনের শক্তিশালী গুলি নিক্ষেপ করা হয়েছে। তৎক্ষনাৎ এয়ারবিসের পক্ষ থেকে দুর্ঘটনার যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়, তাতে বলা হয় যে, ক্যাপ্টেন মেন্টেল Venus এর পিছু গমন করেছিল।

চিন্তা করেন- কখনো এ ধরণের উপগ্রহের কি কেউ পিছু গমন করে ??!! কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে যে, মার্কিন প্রশাসন বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ন্যায় ফ্লাইং সোসার্স নিয়ে সংঘটিত দুর্ঘটনাগুলির উপরও পর্দা ঢালতে চায় এবং তারা সর্বদায় সর্বসাধারণের মনযোগকে এথেকে সরানোর কাজে ব্যস্ত।

ফ্লাইং সোসার্সের মাধ্যমে মানুষ অচেতন...

ফ্লাইং সোসার্সের মাধ্যমে মানুষদেরকে অচেতন করার ঘটনাও নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সময়ে সময়ে বর্ণিত হয়ে আসছে। তন্মধ্যে-

১৯৬০ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার এয়ারবিস থেকে একবার একটি F-101 বিমান ট্রেনিংয়ের জন্য আকাশে উড়ে। এয়ারফোর্সের একজন প্রসিদ্ধ মেজর বিমানটি উড়াচ্ছিল। মিশন শেষে রাডারে দেখা যাচ্ছিল যে, বিমানটি ফিরে আসছে। হঠাৎ বিমানটির সম্মুখভাগ বিরাট একটি ফ্লাইং সোসার্সের মাধ্যমে ঢেকে গেল। মনে হচ্ছিল- বিমানটিকে ফ্লাইং সোসার্স নামিয়ে ফেলেছে। এরপর রাডারস্ক্রীনে আরকিছুই দৃশ্যমান হয়নি। খোজাখোজি চলছিল- পরদিন সকালে পূণরায় বিমানটি আকাশে ভেসে উঠল; যাকে ঐ মেজরই উড়াচ্ছিল। পরে সে বলেছে যে, বিমানসহ তাকে ফ্লাইং সোকার্সে নামানো হয়েছিল। নামানোর পর মানুষের মত দেখতে কিছু প্রাণী তাকে ইন্টারভিউ নিয়েছিল। তার বর্ণনামতে- তাকে এবং তার বিমানকে দশ ঘন্টা আটক রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বিমানটি এয়ারবিসে অবতরণের পর দেখা যায়- তাতে বিশ মিনিট চলার মত পেট্রোল মজুদ ছিল। আর যখন তা প্রথমবার আকশে উড়ানো হয়েছিল, তখনও তাতে বিশ মিনিটের পেট্রোল মজুদ ছিল। তার মানে- এই দশ ঘন্টার মধ্যে তার কোন পেট্রোল খরচ হয়নি। মেজরকে পরে এক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া হয়। পরে আর তার পরিণতির কথা জানা যায়নি। পাশাপাশি ঘটনার সমস্ত সাক্ষীদেরকে শক্তভাবে বলে দেয়া হয়- যদি এব্যাপারে কেউ মুখ খুলে, তবে মোটা অংকের জরিমানা বা জেলের সাজা হতে পারে।

আরেকটি ঘটনা ঘটেছে মার্কিন নাগরিক বির্নী হিল এবং তার স্ত্রী বেটি হিলের সাথে। স্বামী-স্ত্রী দুজন নিউহ্যাম্পশায়ারের এলাকা পোর্টসমাউথে নিজেদের গাড়ীতে করে ভ্রমণ করছিল। বির্নী হিলের দৃষ্টিতে আকাশে কি যেন ভেসে উঠল। দূর্বীন দিয়ে যখন স্পষ্টভাবে আকাশে সবকিছু দেখতে পাচ্ছিল, তখন তার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল "অবিশ্বাস্য সত্য! অবিশ্বাস্য সত্য!"। দেখতে দেখতে ফ্লাইং সোসার তাদের গাড়ীর উপরে এসে পড়ে। তারা পলায়ন করতে চাইলে রেডিওর আওয়াজের মত "সীটি"জাতীয় একটি আওয়াজ তারা শুনতে পায়। শুনার সাথে সাথেই তারা দুজন অচেতন হয়ে পড়ে। ১৯৬১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ঘটনাটি ঘটে। দু'ঘন্টা পর্যন্ত অচেতন রেখে তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল।

১৯৭৫ সালে মার্কিন শাসিত এরিযোনা এলাকার স্নোফেল্ক এর কাছাকাছি একটি স্থানে অফিসার ওয়ালটন তার পাঁচজন সাথীদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। সকলেই তাদের গাড়ীর উপর একটি জ্যোতি ঘুরাঘুরি করতে দেখে। ওয়ালটন গাড়ী থামিয়ে ওই জ্যোতির দিকে দৌড় দিলে সাথে সাথে তার উপর আগুনের একটি গোলা পতিত হয়। ফলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সাথীরা তার দিকে দৌড়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। সাথীদের বিশ্বাস হচ্ছিলনা- আসমান তাকে গিলে ফেলেছে! নাকি যমিন তাকে খেয়ে ফেলেছে। এর পাঁচদিন পর ওয়ালটন নিকটবর্তী একটি স্থানে তাকে পাওয়া যায়। তার বর্ণনামতে- সে ওই পাঁচদিন ফ্লাইং সোসার্সে ওদের সাথে জীবনযাপন করেছে।

১৯৭৬ সালে মার্কিন শাসিত "মিন" এর জঙ্গল "এলাগাশ"এ আর্টের চার শিক্ষার্থী ভ্রমণে এসেছিল। তাদের কি জানা ছিল যে, এরকম স্থানে তারা ভ্রমণ করতে যাচ্ছে, যার ব্যাপারে শুধু কল্পকাহিনীই শুনা যায়। জঙ্গলে ফ্লাইং সোসার অবতরণ করে তাদের অচেতন করে নিয়ে যায়। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর তাদের ছেড়ে দেয়। ঘটনাটি "এলাগাশ দুর্ঘটনা" বলে প্রসিদ্ধ হয়। রহস্যময় ব্যাপার হচ্ছে- ঘটনার পর ওই চার শিক্ষার্থীর একজন "জ্যাক" ম্যাথমেটিক্সে দক্ষতা অর্জন করে ফেলে। অথচ ঘটনার পূর্বে সে বিষয়টি নিয়ে আগ্রহী ছিলনা। আর্টেও সে ভাল ফলাফল প্রকাশ করে। সে তার পায়ে কি যেন একটি চিহ্ন আবিস্কার করে। চেকআপ করার পর কোন ডাক্তারই বলতে পারেনা যে, এটি কিসের চিহ্ন বা কোত্থেকে এটা হয়েছে। এমনকি লিবার্টি রিপোর্টেও এর সুনির্দিষ্ট কোন কারণ পাওয়া যায়নি।

১৯৮৯ সালে নিউয়োর্কের ব্যস্ত এলাকা "হটন" এর একটি এ্যাপার্টমেন্টের বার নং তালায় "লিন্ডা" নামক একজন মহিলা স্বামীর সাথে শয়নে ছিল। লিন্ডাকে ফ্লাইং সোসার অধিকারীরা অচেতন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ছেড়ে দেয়। ঘটনার পর মার্কিন সিআইডি সংস্থার পক্ষ থেকে তার উপর নজর রাখার জন্য দু'জন গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাদের চোখের সামনেই (১৯৮৯ এর ৩০ নভেম্বর) ভোর তিনটায় নিউয়োর্কের মত রাত জাগানীয়া নগরীর মধ্যএলাকা "মিন হটনে" পূণরায় ফ্লাইং সোসার প্রদর্শিত হয়ে লিন্ডার

এ্যাপার্টমেন্টের উপর ঘুরাঘুরি করতে থাকে। ঘটনাটি কাছাকাছি অবস্থিত দূতাবাসের একজন কর্মকর্তাও (গাড়ীতে করে কোন এক মিটিং থেকে ফেরার সময়) প্রত্যক্ষ করেছিল। পিছু চলতে থাকা তদন্তকারীদের গাড়ীগুলো যখন ব্রুকলিন ব্রীজের উপর পৌছে, তখন সবার গাড়ীর ইঞ্জিনগুলো অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়।

ফ্লাইং সোসার্সের কিছু প্রসিদ্ধ ঘটনা...

১৯৪৭ সালের ২ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় রোজভেল নিউমেক্সিকোয় ফ্লাইং সোসার্স দুর্ঘটনার শিকার হয়। রোজভেলের আর্মি এয়ারবিস ফ্লাইং সোসারগুলিকে কৌশলে আয়ত্বে নিয়ে নেয়। এতে আটজন (Aliens)অপরিচিত লোক নিহত হয়েছিল এবং দুজন জীবিত ছিল। (ষ্টেনটিন ফ্রাইডমেনের গ্রন্থ Crash at Corona থেকে সংগৃহীত)

ঘটনার পর ফ্লাইং সোসার্স অধিকারীদের সাথে মার্কিন প্রশাসন একটি গোপন এলাকায় (যাকে এরিয়া-৫১ বলা হয়) গোপন আলাপ-আলোচনা করে। রোজভেল্ট দৈনিক সংবাদ' ঘটনাটি ১৯৪৭ এর ৮জুলাই পত্রিকার প্রথম পাতায় রেড কালারে প্রচার করে- RAAF Captures Flying Saucer On Ranch in Roswell Region

যথারীতি এটা প্রেস রিলিজ ছিল; যা মার্কিন এয়ারফোর্সের কর্নেল উইলিয়াম ব্লিন চার্ড এর আদেশে মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা- কয়েক ঘন্টা পরেই উইলিয়াম ব্লিন চার্ড নিজে প্রেস রিলিজ উড্ড করে পরদিন এই সংবাদ প্রচার করে যে, এগুলো ফ্লাইং সোসার্স ছিলনা; বরং প্রাকৃতিক ধুলাবালি ছিল। একজন মার্কিন কর্নেলের কথা চিন্তা করুন- এতটুকুও চিনতে সক্ষম হয়নি যে, এগুলো প্রাকৃতিক ধুলাবালি নাকি ফ্লাইং সোসার্স!!

রাইটারদের বাধ্য করা হয়েছে এমন সংবাদ প্রচার করতে। না করলে মৃত্যুর হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। কিন্তু "মেক ব্রিজিল" (যিনি দুর্ঘটনায় আক্রান্ত ফ্লাইং সোসারকে সর্বপ্রথম দেখেছিলেন) ৯ জুলাই সাক্ষাতকারে স্পষ্ট বলেছিলেন- যে, প্রাকৃতিক ধুলাবালি উনি খুব ভাল করেই চেনেন, সেটা প্রাকৃতিক ধুলাবালি ছিলনা; বরং ফ্লাইং সোসার ছিল। সাক্ষাতকারের পরপরই তাকে কয়েকদিনের জন্য গায়েব করে দেয়া হয়। পরে ফিরে এসে কখনো তিনি আর এব্যাপারে মুখ খোলতে রাজী হননি।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং ফ্লাইং সোসার্সের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ গবেষক চার্লস ব্রিটলায ১৯৮০ সালে Roswell Incident নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থে নব্বই জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর বরাত দিয়ে তিনি বলেন- আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ফ্লাইং সোসার বহু দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মাটিতে পতিত হয়েছে।

ফ্লাইং সোসার্স... আসে কোত্থেকে ??!!

প্রথমেই বলা হয়েছে যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের পানিতে বিভিন্ন কালারের জ্যোতি, আগুনের গোলা, চমকদার মেঘ এবং ফ্লাইং সোসার্স প্রবেশ করতে এবং এথেকে বের হতে দেখা গেছে। এ বিষয়ের দিকে ডক্টর মাইকেল প্রেসেঞ্জারের গবেষণাময় রচনা যথেষ্ট ইঙ্গিত বহন করে, কেননা উনি ওই এলাকায় বহু সময় অতিবাহিত করেছেন এবং ওখানকার পানিতে বহুবার ডুবুরির দায়িত্ব পালন করেছেন।

"আমার কাছে সংবাদ পৌছেছে যে, AUTEC গবেষণা সংস্থার এলাকায় কতিপয় ফ্লাইং

সোসার্স দেখা গেছে। এটি হচ্ছে বাহামাছ দ্বীপপুঞ্জে মার্কিন সমুদ্র গবেষণাকেন্দ্র। যেখানে অনেক রিসার্চ স্কলারদের দাবী- অটকই হচ্ছে সমুদ্রের ভেতরের এরিয়া-৫১। এটি হচ্ছে একমাত্র এলাকা যা মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে ফ্লাইং সোসার্সের ব্যাপারে গবেষণার জন্য ধার্যকৃত সামুদ্রিক কেন্দ্র। যেখানে সময়ে সময়ে ফ্লাইং সোসার্সও আসা-যাওয়া করে।

একজন ঐতিহাসিক গবেষক হিসেবে আমি ওখানকার সমুদ্রের গভীরে যাওয়ার জন্য ফায়সালা করে ফেললাম। এলাকাটি এন্ড্রোসে ফ্লোরিডার পশ্চিম পাম উপকূল থেকে ১৭৭ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত। এটি একটি প্রশস্ত এলাকা; যা গোপন বিষয়াবলীর জন্য ব্যবহৃত হয়। ওখানকার পানির নিচে ছোট ছোট নীল গর্ত লক্ষ করা গেছে।

বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারলাম যে, এন্ড্রোস-২০ এর সিকিউরিটি খুবই গোপনীয়তার সাথে নির্ধারণ করা হয়। এন্ড্রোসের পানিতে আশ্চর্য ও রহস্যময় আকৃতির জাহাজ আসা-যাওয়া করতে দেখা গেছে; যেগুলো ফ্লাইং সোসার্স থেকেও অত্যাধুনিক বাহন বলে মনে হয়। নতুন এই বাহনটি অবিশ্বাস্য গতিতে চলাচল করে থাকে। এর মোড় ঘুরানো এতই দ্রুত যে, মানুষের চোখে তা ধাধার মত মনে হয়।

একজন বিশিষ্ট বণিক আমার কাছে স্বচক্ষে দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। একবার তিনি একটি জাহাজ নিয়ে এন্ড্রোসের উপকূল এলাকাতে সাময়ীক ভ্রমণোদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন। আবহাওয়া সম্পূর্ণ পরিস্কার ছিল। দুই মাইল দূরে একটি বড় আকৃতি দৃশ্যমান হল। প্রথমে মন হল যে, বিশালাকৃতির মাছ হবে। জাহাজকে তিনি আরও কাছে নিয়ে গেলেন। এটি অত্যন্ত জ্যোতিময় ও উজ্জল অত্যাধুনিক বাহন ছিল; যা মানুষের হাতেই তৈরীকৃত মনে হচ্ছিল। হঠাৎ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তা সমুদ্রের ঢেওয়ের সাথে পানির নিচে গায়েব হয়ে যায়।

আমাকে একটি চক্রান্তের ব্যাপারেও সংবাদ দেয়া হয়েছে; যা সমুদ্রের গভীরের এরিয়া-৫১ এলাকার

সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৯৮ সালের নভেম্বরে ফ্লোরিডায় অবস্থিত মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা "নাসা"র হেডকোয়ার্টারে আমি একটি ইন্টারভিউ নিলাম। সে আমার কাছে বর্ণনা করল যে, একজন সম্মানিত ও সুপ্রসিদ্ধ ব্রিটিশ ডুবুরী "রব পালমার" যিনি বাহামায় অবস্থিত "Blue Holes"এর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে কয়েক বৎসর যাবত ডাইরেক্টরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বলেন- "ব্লু হোল্স" আসলে সমুদ্রের তলদেশে কিছু ছোট ছোট গর্ত। উনার ধারণা- এগুলি ফ্লাইং সোসার্স বের হওয়ার স্থান হতে পারে। ওই এলাকা এবং এরিয়া-৫১ এর ব্যাপারে উনার গবেষণা সফলতার সাথেই আগে বাড়ছিল। কিন্তু ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে ইসরাইলের লোহিত সাগরের তলদেশে গবেষণাকালে চিরদিনের মত হারিয়ে যান। "নাসা"য় কর্মরত আমার এক বন্ধু আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, অধিকাংশ গবেষকের দাবী- রব পালমারকে অটেক গবেষণা সংস্থার পর্যবেক্ষকগণ হত্যা করেছে। কেননা, ওই গোপন রহস্য সম্পর্কে উনি বহুদূর পর্যন্ত জেনে গিয়েছিলেন। (বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল ষ্ট্রাগেট" ডক্টর মাইকেল প্রেসেঞ্জার)

ফ্লাইং সোসার্স সমুদ্রে...

দিনটি ছিল ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিন। আমরা গুয়ান্তানামো (কিউবা) থেকে একটি জরুরী কাজ শেষে ফিরছিলাম। এসময় আমাদের জাহাজটি কিউবার উত্তরপ্রান্ত দিয়ে যাচ্ছিল। অধিকাংশ ক্যাপ্টেন জাহাজের পজিশন সম্পর্কে অবগত থাকেননা, কিন্তু জাহাজটি যেহেতু সঠিক পথে ছিল, তাই জাহাজটি কোথা দিয়ে যাচ্ছে সেসম্পর্কে আমি ভালভাবে অবগত ছিলাম। আমরা ট্রাইএঙ্গেলের এরিয়ায় ছিলাম। রাত তখন ১১.৪৫। আমি ভেতরে ছিলাম। কেবিন্ট ইনফরমেশান সেন্টার থেকে ৩০ গজ দূরে জাহাজের বিশাল খুটির দুই দিকে দু'জন রক্ষী পাহারা দিচ্ছিল। প্রথমবার আমি অনুভব করি, কোন একজন চিৎকার দিয়ে বলছিল যে, "জাহাজের ডানদিকের পাহারারক্ষী কি যেন প্রত্যক্ষ করে অচেতন হয়ে পড়েছে"। অপরজন চিৎকার দিয়ে বলছিল- "রাডারে কি যেন ভাসছে"। বাহিরে কোন রহস্যময় বস্তু ভেবে তা দেখার জন্য আমরা বের হয়ে আসলাম। দেখতে চাদেঁর মত চমকদার গোলাকৃতির ছিল। কিন্তু তার বিশালত্ব চন্দ্রের থেকেও হাজারগুণ বেশি মনে হচ্ছিল। লাগছিল- সূর্য উদয় হচ্ছে। জ্যোতি এর ভেতরেই বিদ্যমান ছিল (অর্থাৎ জ্যোতি বাহিরের দিকে ছিলনা; বরং ভেতরেই ঝলঝল করছিল)। আস্তে আস্তে তা প্রসস্ত হচ্ছিল।

চার্লস ব্রিটলায : বস্তুটি তোমাদের কতটুকু দূরে ছিল ?

রবার্ট পি রিলে : দশ-পনের মাইল উপরে আকাশের দিকে উঠছিল। প্রায় পনের মিনিট পর্যন্ত এর আকৃতি প্রসস্ত হচ্ছিল।

চার্লস ব্রিটলায : এ দৃশ্য কতজন প্রত্যক্ষ করেছে ? কেউ কি তা ক্যামেরাবন্দি করতে পেরেছে ?

রবার্ট পি রিলে : সত্তর-একশ জন লোক এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছে। অধিকাংশই তখন স্বীয় অনুভূতি শক্তিটুকু হারিয়ে ফেলেছিল। সবাই এত শংকিত ছিল যে, ফটো তোলার কল্পণাও কারো মনে আসেনি।

চার্লস ব্রিটলায : আসল চন্দ্র কোথায় ছিল ?

রবার্ট পি রিলে: তা আকাশেই ছিল। আসমান সম্পূর্ণ পরিস্কার ছিল। আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছি, তা কখনোই চন্দ্র ছিলনা।

চার্লস ব্রিটলায : তোমাদের ধারাণানুযায়ী কেউ কি ওই ঘটনার রিপোর্ট করেছিল ?

রবার্ট পি রিলে : অবশ্যই ঘটনাটিকে লগ ব্যাগে (জাহাজে বিদ্যমান সংরক্ষণ ডায়েরী) রিপোর্ট করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা যখন নারফোর্ক পৌছি। তখন কয়েকজন অফিসার ছাদে এসে লগ ব্যাগ নিজেদের সাথে করে নিয়েগিয়েছিলেন। পরে যে লগ ব্যাগ আমাদের হাতে পৌছে, তাতে শুধু পথ পরিবর্তনের উল্লেখ ছিল। আর কিছুই ছিলনা।

চার্লস ব্রিটলায : এ সম্পর্কে আরো কিছু কি বলা হয়েছে ?

রবার্ট পি রিলে : হ্যাঁ...। পরদিন আমরা যখন নারফোর্ক পৌছি। প্রত্যেকের কাছে ঘটনাটি আলোচ্যের বিষয় ছিল। আমরা পরস্পরে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ক্যাপ্টেন আমাদেরকে একস্থানে একত্রিত করে সবাইকে বলে দেয় যে, উক্ত ঘটনা সম্পর্কে কেউ যেন আর মুখ না খুলে।

ঘটনাটি "লাইড গাইডেড মিযাইল ডাষ্ট্রায়ার" নামক জাহাজের রাডার অপারেশনাল ইন্টেলিজেন্সের দায়িত্বে নিয়োজিত "রবার্ট পি রিলে' থেকে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের উপর সুগভীর গবেষক চার্লস ব্রিটলায তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "The Bermuda Triangle"এ উল্লেখ করেছেন।

১৯৭৩ সালের ১০ অক্টোবর ইউ,এস কোষ্টগার্ড ডক্টর যখন কিউবার গুয়ান্তানামোর দিকে ভ্রমণ করছিলেন, তখন জাহাজের ছাদে প্রহরায় থাকা রক্ষী স্পষ্টভাবে পাঁচটি ফ্লাইং সোসার্স V এর আকৃতিতে জাহাজের সীমানা ও তার এরিয়ায় ঘুরাঘুরি করতে দেখে। এদের গতি অত্যাধিক দ্রুত পর্যায়ের ছিল। কখনো জাহাজের খুব কাছাকাছি কখনো জাহাজের খুব দূরে আসা-যাওয়ার সময় এদের রঙ লাল ও কমলায় পরিবর্তিত হচ্ছিল।

১৯৬৩ সালের ১১ এপ্রিল বোয়িং-৭০৭ এর পাইলট এবং ইঞ্জিনিয়ার "সান জো আন" থেকে নিউয়োর্কের দিকে ভ্রমণ করার সময় দেখতে পায় যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের এলাকায় গেন্দাফুলের আকৃতিতে পানির এক অংশ পাহাড়ের মত উপরের দিকে উঠছে।

অপর এক গবেষক "বিলি বোথ" স্বীয় রচনা "UFO in the Bermuda Triangle"এ লিখেন-

মার্কিন রণতরী "ইউ,এস জন এফ কেনেডি"তে কর্মরত একজন আমাকে বর্ণনা করেছে- ১৯৭১ সালে মার্কিন রণতরী ইউ,এস,জন,এফ.কেনেডি"তে করে নারফোর্ক-ভারজিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করছিল। জাহাজের বিদ্যুৎ যোগাযোগ কেন্দ্রে সে কাজ করছিল। যোগাযোগকক্ষে কর্মরত সকলেই কাউকে চিৎকার দিতে শুনল- "জাহাজের উপর কি যেন ঝুকে পড়ছে"। কিছুক্ষণ পর আরেকটি চিৎকারের আওয়াজ ভেসে এল-"দুনিয়ার ধ্বংস খুবই নিকটবর্তী"..."দুনিয়ার ধ্বংস খুবই নিকটবর্তী"...। একথা শুনে আমাদের কক্ষ থেকে ছয়জন উপরে দৌড়ে গিয়ে যে দৃশ্য দেখে, তাতে সবাই হতবাক। বিশাল আকৃতির একটি কড়া তাদের উপর ঘুরাঘুরি করছিল। এটি ফ্লাইং সোসার ছিল। এর ভেতর থেকে কোন আওয়াজ বেরুচ্ছিলনা। ভেতরে

জ্যোতি ঝলঝল করছিল; যা হলুদ থেকে কমলা রঙের দিকে পরিবর্তিত হচ্ছিল। দৃশ্যটি প্রায় বিশ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এসময় জাহাজের কম্পাস, রাডার এবং অন্যান্য সকল যন্ত্র অকেজো অবস্থায় ছিল। জাহাজে বিদ্যামন আকাশ পর্যবেক্ষণ বিমান F-4 দ্রুত ষ্টার্ট করতে চাইলে তাও ষ্টার্ট হচ্ছিলনা।

কয়েকদিন পর জাহাজ যখন নারফোর্কের নিকটবর্তী পৌছে, তখন এক ক্যাপ্টেন এসে সকলকে সতর্ক করে যায় যে, "যা কিছু পরিলক্ষিত হয়েছে; তা যেন জাহাজের ভেতরই সীমাবদ্ধ থাকে"।

ফ্লোরিডার সুপ্রসিদ্ধ একজন ক্যাপ্টেন "ডন ডিলমোয়িনকো" দুইবার এর সম্মুখীন হয়েছেন। তার বর্ণনামতে- ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে উনি সমুদ্রে ভ্রমণ করছিলেন। জাহাজের অদূরে সাবমেরিনের আকৃতিতে কি যেন একটি বস্তু জাহাজের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছিল। কিছু সন্নিকটে আসার পর বুঝতে পারলাম- এটি সাবমেরিন নয়। কালার ছিল সুরমা। ১৫০-২০০ ফিটের মত লম্বা ছিল। ঠিক জাহাজের দিকে আসছিল। মনে হচ্ছিল- অচিরেই জাহাজের সাথে সংঘর্ষ হবে। আমি মটার বন্ধ করে প্রভুর কাছে দোয়া চাইতে লাগলাম। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম- সাবমেরিন সদৃশ বস্তুটি আমার জাহাজের নিচে দিয়ে ডুব মেরে নীলা পানির গভীরে চলে যায়।

বারমুডার পানিতে ডুবুরীদের সকলেই অসংখ্যবার সাদা রহস্যময় বিভিন্ন বাহন প্রত্যক্ষ করেছেন; যেগুলো অত্যন্ত গ্রুতগতিতে ভ্রমণ করতে সক্ষম। তাদের ধারনা- এগুলিই সেই ফ্লাইং সোসার্স; যা বারমুডার পানিতে বারবার প্রবেশ এবং বের হতে দেখা যায়।

ফ্লাইং সোসার্স... কোথায় সেই স্বাধীন সাংবাদিকতা ??!!

মার্কিন বোধগোলামীতে ডুবে থাকা লোকেরা ওখানকার মানব স্বাধীনতা ও স্বাধীন সাংবাদিকতার বহুল প্রশংসা করে ক্ষান্ত হয়না। এটা শুধুই পাক্ষিকতা; অন্যথায় আমেরিকায় শুধু ঐ সকল বিষয় নিয়ে স্বাধীনতা দেয়া হয়, যেগুলোতে তাদের গোপন শক্তির উপর কোনরূপ আঘাত না পড়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যে সকল বিষয় তারা গোপন রাখতে চায়, সেগুলো নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত তারা চুপ থাকতে বাধ্য করে।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং ফ্লাইং সোসার্স বিষয়ে এযাবৎ অজস্র তদন্ত টীম গঠন করা হয়েছে, তদন্তও হয়েছে; কিন্তু রিপোর্টগুলিকে জনসম্মুখে প্রকাশ করতে দেয়া হয়নি। সকল রিপোর্ট ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে। যদি কেউ তাদের কথা না মেনে তদন্ত জারী রাখার চেষ্টা করেছে, তাদেরকে চিরদীনের মত জানের মায়া ত্যাগ করতে হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্লাইং সোসার্সের বাস্তবতা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে গোপন শক্তির পক্ষ থেকে প্রোপাগান্ডা জারী করা হত যে- ফ্লাইং সোসার্স হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীদের দৃষ্টিভ্রম (Fantasy Prone)কিছু বিষয়। এরপর যখন হোয়াইট হাউসের উপর একাধিকবার ফ্লাইং সোসার্স দৃষ্টিগোচর হয়, তখন আরেক প্রোপাগান্ডা চালু করা হয়। লোকদেরকে বলা হয় যে, এগুলো ভিন্ন গ্রহের ভিন্ন প্রাণী। যারা পিকনিক করতে করতে কখনো কখনো আমাদের পৃথিবীতে এসে পড়ে।

এখন চিন্তার বিষয়- এগুলো যদি বাস্তবেই ভিন্ন গ্রহের প্রাণী হয়ে থাকে, তবে এদের নিয়ে গবেষণা ও তদন্তকারীদেরকে মৃত্যুর কোলে কেন শুইয়ে দেয়া হল ??!! এরই প্রেক্ষিতে কতিপয় পাক্ষিক গবেষকদের দাবী- নিশ্চয় এখানে এমন কিছু বিষয় বিদ্যমান; যাকে আমেরিকার "গোপন বামশক্তি" পৃথিবীবাসীদের থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়।

এরই কারণে- ডক্টর জাইছোব" যিনি ফ্লাইং সোসার্স এবং বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের বাস্তবতার ব্যাপারে বহুদূর পর্যন্ত সফলতা অর্জন করে ফেলেছিলেন; রহস্যময়ভাবে তাকে হত্যা করে দেয়া হয়েছে। ডক্টর জাইছোব তার মতামতের ব্যাপারে ডক্টর ভেলেন্টাইনের সাথে মতবিনিময় করার জন্য যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যেই তাকে মৃত্যুর দোয়ারে পৌছে দেয়া হয়েছে। তার গাড়ীর এক্সহাষ্ট থেকে এক ধরনের ফিউয চালু করে তাকে

গাড়ীর ভেতরে নেয়া হয়। যারফলে গাড়ীর ভেতর "কারবন মনোঅক্সাইড গেসে ভরপুর হয়ে যায়। ডক্টর ভেলেন্টাইনের বর্ণনামতে- যখন পুলিশ ডক্টর জাইছোবের গাড়ীর কাছে পৌছে, তখন পর্যন্ত উনি জীবিত ছিলেন (তার মানে- ডক্টরকে মরতে বাধ্য করা হয়েছে)। তার মতামত অনেক এডভান্সড্ ছিল পাশাপাশি অনেক লোক তখন বিদ্যমান ছিল; উনার মতামত মানুষের সামনে প্রকাশ করা যাদের পছন্দ ছিলনা।

উনার মৃত্যুর পর উনার গবেষণার ধারাবাহিকতাকে প্রসিদ্ধ গবেষক জেমস এ মেকডোনাল্ড আগে বাড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ এর ১৩ জুন মাথায় গুলি করে তাকেও হত্যা করে ফেলা হয়। পরে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়- ডক্টর আত্মহত্যা করেছেন।

একই অপরাধে বৈজ্ঞানিক ও গবেষক "রব পালমার"কেও লোহিত সাগরে জীবন্ত ডুবিয়ে হত্যা করা হয়েছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও এব্যাপারে কোন তদন্ত করাতে সক্ষম হননি। ব্রিটিশ ও মার্কিন বহু প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পূর্বইশতেহারে বহুবার ওয়াদা করেছে যে, জয়ী হলে এ সংক্রান্ত যাবতীয় রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করবে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ব্যারাক ওবামা-ও ইশতেহারে এবিষয়ে ওয়াদাকারীদের একজন।

চিন্তার বিষয়- এ ফ্লাইং সোসার্স যদি মহাকাশপ্রাণীদের বাহনই হয়ে থাকে, তবে এ ব্যাপারে যাবতীয় রিপোর্ট প্রকাশ করতে মার্কিন ও ব্রিটিশ প্রেসিডেন্টদের কোন জিনিষ বাধা দিচ্ছে এবং তদন্তকারীদেরকেই বা কেন হত্যা করে ফেলা হয়েছে ??!!

ফ্লাইং সোসার্সে ভ্রমণকারীরা আমাদের মতই সাধারণ মানুষ...!

যে সকল গবেষণাকারীগণ নির্ভয়ে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল ও ফ্লাইং সোসার্স নিয়ে গবেষণা করেছেন, তারা সফলতার সাথে একটি ফলাফলে ঠিকই পৌছেছেন যে, ফ্লাইং সোসার্সে করে ভ্রমণকারীরা মহাকাশপ্রাণী নয়; বরং তারা আমাদের এ পৃথিবীরই কিছু মানুষ। অবশ্য তারা নিজেদের আকৃতি, পোশাক এবং ভাবভঙ্গি পরিবর্তন করে এ কথা বুঝানোর চেষ্টা করে যে, তারা মানুষ নয়; মহাকাশপ্রাণী। তাদের শরীর আমাদের শরীরে মত। নাক, কান, মুখ, চোখ, হাত-পা এবং সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সাধারণ মানুষের ন্যায়। এ ব্যাপারে বহু প্রমাণাদী বিদ্যমান। বিস্তারিত বর্ণনায় না গিয়ে শুধু এতটুকু বুঝে রাখাই যথেষ্ট যে, ফ্লাইং সোসার্সের মাধ্যমে যে সকল লোকদেরকে গায়েব করা হয়েছে, তাদের বর্ণনানুযায়ী গায়েবকারীরাও আমাদের মত সাধারণ মানুষ। তবে তারা সকল ভাষায় কথা বলতে সক্ষম।

প্রসিদ্ধ গবেষক আলবার্ট আইনষ্টাইন পর্যন্ত একই মতামত পেশ করেছেন। هفت روزه الاسبوع العربي।১৯৭৯ সালের ২৯ জানুয়ারীর সংখ্যায় লিখেছেন- "আলবার্ট আইনষ্টাইনও কোনপ্রকার সন্দেহ ছাড়া বলেছেন যে, ফ্লাইং সোসার্স বাস্তব। পাশাপাশি এগুলি যাদের কন্ট্রোলে চলমান, তারাও সাধারণ মানুষ।" (বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল, লেখক-রাজপুত ইকবাল আহমদ)

তাছাড়া যেসকল ফ্লাইং সোসার্স ধ্বংসাবস্থায় উদ্ধার হয়েছে, সেগুলোর ভেতরের লাশগুলো মানুষের ছিল। যদি তারা মানুষই হয়ে থাকে, তাহলে তাদের সরদার বা গডফাদার কে ?? আর এত অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন বাহন নিয়ে জনশূন্য গোপন আস্তানায় বসে সে কার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ??!! মার্কিন প্রেসডিন্টে আইজন হাওয়ার কি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছে ??!! মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাদের নিয়ে তৈরী করা রিপোর্টগুলো কেন জনসম্মুখে প্রকাশ করছেনা ??!!

এ সকল ব্যাপার থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এদের বাস্তবতার ব্যাপারে ইহুদী সংগঠনসমূহের কাছে খুব ভালই জ্ঞান থাকার কথা; যে ইহুদী শক্তি ব্রিটিশ-আমেরিকাসহ সারা বিশ্বের সকল শক্তিকে শাসন করছে। কেননা, ফ্লাইং সোসার্স অধিকারীরা (যেই হোক) ইহুদীদের থেকেও বেশি শক্তিধর।

কে সেই জন ??!! যে নাকি আমাদের পরিচিত বিশ্বের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থেকেও আরো কয়েকশত

বছর এগিয়ে রয়েছে!! মহাকাশ বিষয়, সামুদ্রিক বিষয় এবং জলেস্থলের সর্বত্রে যদি তারা এত অত্যাধুনিক হতে পারে, তাহলে তাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত বিষয়গুলি আরো কত প্রযুক্তি আর আধুনিকতাসম্পন্ন হতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আসুন... তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ব্যাপারে কিছুটা আন্দাজ করা যাক।

উপরোল্লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে যদি ভেবে দেখা যায়, তাহলে বারমুডা অধীকারীদের কাছে এগুলো ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে তারা যে প্রযুক্তির ব্যবহার করছে, তা কতটুকু অত্যাধুনিক আর শক্তিশালী হতে পারে!! যেমন :-

(১) মেডিকেলের বিষয়ে। যেমনটি পূর্বেই গায়েবকৃত ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, ফ্লাইং সোসার্স অধিকারীদের সাথে সাক্ষাতের পর তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। "ফাদার ফ্রেক্সিডো"র বর্ণনামতে- সার্বক্ষনিক ব্যাধি ও জন্মরোগীদের পূর্ণ সুস্থ্য হয়ে উঠা। সুতরাং আন্দাজ করা যায় যে, তারা সর্বাঙ্গীন ও জন্মরোগের সফল চিকিৎসা করতে সক্ষম; যা দেখে দুর্বল ঈমানদারগণ হয়ত একে খোদা মনে করে বসবে।

(২) প্রাণীরোগ বিষয়। বর্তমানে এমন সব "টীকা" বাজারে বিদ্যমান। যা লাগানোর পর গরু-গাভী-মহিষ কয়েকগুণ বেশি দুধ দিতে শুরু করে। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে বারমুডা অধিকারীদের এব্যাপারে উন্নতির আন্দাজ করা যায়। পাশাপাশি এটাও বলা যায় যে, তারা গরু-গাভীর দুধ বাড়ানোর পাশাপাশি স্তনের দুধ মুহুর্তের মধ্যে শুকিয়ে ফেলার শক্তিও অর্জন করে ফেলেছে। অবশ্য লেজার বীমের সাহায্যেও কাজটি খুব সহজেই করা যায়। আবার ক্লোনিংয়ের সাহায্যে মৃত জানোয়ারকেও জীবিত করে দেখাতে পারে।

(৩) ক্ষেত-ক্ষামার। লেজার বীমের ব্যাপারে আপনি মনে হয় অবগত আছেন। বর্তমান প্রযুক্তিতে এটাকে সর্বাধুনিক অস্ত্র মনে করা হচ্ছে। লেজার বীম ব্যবহারে যদি কেউ ক্ষমতাবান হয়ে পড়ে, তাহলে সে এমনসব কাজ বাস্তবায়নে সক্ষম হয়ে উঠবে, যা দেখে সরলমনা মানুষ একে মু'জেযা মনে করে এর উপর ঈমান নিয়ে আসবে। লেজার বীমের সাহায্যে বড় বড় ক্ষেত-ক্ষামারকে মুহুর্তের মধ্যেই বীরান বানানো সম্ভব। আবার বীরান যমীনকে মুহুর্তের মধ্যেই সবুজ-শ্যামল ফসলে ভরা ক্ষেতে রূপান্তরিত করে দেখানোও সম্ভব।

বিষয়টি বুঝার জন্য একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক :-

টিভি আর কম্পিউটারের স্ক্রীনে আপনি যা কিছু দেখেন, এগুলো শুধুমাত্র কিছু আলো; যা বিভিন্ন প্রকার প্রাণী এবং প্রাণহীন দৃশ্যের আকৃতিতে স্ক্রীনে আপনার চোখে ভাসতে থাকে। দৃশ্যগুলি দেখার জন্য বর্তমানে ছোট-বড় স্ক্রীনের দরকার হয়। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এগুলো দেখার জন্য আর স্ক্রীনের দরকার হবেনা। লেজার বীমের সাহায্যে যে কোন স্থানে মারলেই সবকিছু দেখা সম্ভব হবে। এমনকি শুন্যেও(আকাশের দিকে)। অর্থাৎ আপনি দেখবেন যে, বাজারে কোম্পানীর ভিডিও এডসমূহ দৃশ্যায়িত হচ্ছে, কিন্তু কোন সাইনবোর্ড ছাড়াই। ইশতেহারের জন্য আর সাইনবোর্ডের দরকার হবেনা; বরং যে দৃশ্য আপনি স্ক্রীনে দেখেন, ঠিক সেই দৃশ্যই আপনি লেজার বীমের সাহায্যে অতিসহজে শূন্যে দেখতে পাবেন। টিভি-কম্পিউটারের স্ক্রীনে যা কিছু দেখা সম্ভব, লেজার বীমের সাহায্যেও তা শূন্যে দেখা সম্ভব। সুতরাং কোন বীরান ভূমিতে লেজার বীমের আলো নিক্ষেপ করে যদি তা সবুজ-শ্যামল ফসলে ভরা উর্বর জমি হিসেবে দেখাতে চায়, তাও দেখাতে পারে। পাশাপাশি এ জাতীয় আলো নিক্ষেপ করে বিশাল বিশাল অট্রালিকাকে গায়েব করে দেয়া, জলে-স্থলে কম্পন সৃষ্টি করা এবং মানুষ দু'টুকরা করে জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেখানো সম্ভব। অর্থাৎ কিছু বিষয়ে বাস্তব ধ্বংস আর বেশিরভাগ বিষয়ে নজরবন্দির কাজ লেজার বীমের সাহায্যে করা যেতে পারে।

বর্তমানে আমেরিকার হাতে লেজার গাইডেড মিযাইল এবং প্লেন-মিযাইল বিধ্বংসী লেজার বীম বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তা প্রাথমিক পর্যায়ে। তাহলে আপনার ব্রেইন একথা অতি সহজেই মেনে নেবে যে,

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল অধিকারীরা ইতিমধ্যেই লেজার বীমের উপর পরিপূর্ণ কন্ট্রোল অর্জন করে ফেলেছে।

(৪) যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফ্লাইং সোসার্সের ব্যাপারে একটু আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, তা প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়ার সর্বাধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা দপ করে দাড়িয়ে যায়। হাজারো কিলোমিটার দূর থেকে স্যাটেলাইট ক্যামেরা সাদা করার যোগ্যতাও তার মাঝে বিদ্যমান। চিন্তা করেন- এব্যাপারে তারা কতটুকু অগ্রগতি অর্জন করেছে। তাহলে কি পৃথিবীর সকল ইমেইল, ফোন-কল আর এসএমএস কি সর্বপ্রথম তাদের কাছে পৌছে ??!!

ইন্টারনেট সিষ্টেমের ব্যাপারে প্রোগ্রামারদের কাছে একটি কথা প্রসিদ্ধ যে, ইন্টারনেটের সকল সিষ্টেম পেন্টাগন থেকে কন্ট্রোল হয়। এর মেইন সারভার "Main Server"হচ্ছে পেন্টাগন। মনে হয়- এমনটি নয়। বরং বারমুডা অধীকারীদের প্রযুক্তির ব্যাপারে জানার পর একথা স্পষ্টতই বলা যায় যে, এ সকল সিষ্টেম তাদের সামনে এমন; যেমননাকি কম্পিউটারের স্ক্রীন আপনার সামনে। কেননা, আমাদের সকল সিষ্টেমেই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে চলছে। আর স্যাটেলাইটের ব্যাপারে আপনি আগেই জেনেছেন যে, কিভাবে তারা বারমুডার ভেতরে বসে বসে স্যাটেলাইটের ডাটাসমূহকে কন্ট্রোলে নিয়ে ফেলে।

যে কোন কম্পিউটার ইন্টারনেটের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সাথে সাথে তাদের দৃষ্টিসীমা থেকে কি বাঁচতে পারে ??!! অনলাইন ব্যংকিং, টিকেটিং, শপিং এবং জাগায় জাগায় স্থাপিত সিকিউরিটি ক্যামেরার যাবতীয় তথ্যাদি কি তাহলে বারমুডার পানির নিচের উইন্ডোগুলোতে চলে যায় ?? আর আপনি যে Windows আপনার কম্পিউটারে ব্যবহার করছেন, কখনো কি ভেবেছেন- এগুলো কার জানালা(Windows)জানালাগুলি কি আপনার জন্য তৈরীকৃত ? নাকি বারমুডার অধিকারীদের জন্য; যারা সমস্ত পৃথিবীর সামনে হুমকি হিসেবে অবস্থান করছে।

ইদানিং বাজারে এমন কিছু ল্যাপটপ এসেছে, যেগুলি সবসময় ইন্টারনেটের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। আপনি তাতে যতই ডাটা সংরক্ষণ করতে চান, রাখতে পারবেন। লাখো গিগা বা কোটি গিগা। কোন হার্ড ডিস্কই নেই। বরং এতে আপনি যে সকল ডাটা সেভ করছেন, সবগুলোই মেইন সারভাবে গিয়ে জমা হচ্ছে। যখনই আপনি চান- আপনার সেভকৃত ডাটা স্ক্রীনে দেখতে পারবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত মেইন সারভারের অধীকারীগণ চায়।

চিন্তা করেন- এটা কি উন্নতি না অবনতি ?!! এগুলো ভরসা রাখার মত বিষয় ? নাকি হঠাৎ করে সবকিছু গায়েব করে দেয়ার মত বিষয়।

কিন্তু কে সে ??!!

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ব্যাপারে এখন একটি প্রশ্নই বাকী থাকে যে, তাহলে তারা কারা ?? এবং এত অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন শক্তি তারা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তৈরী করেছে ?? আর তাদের উদ্দেশ্যই বা কি ???!!!

একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের একথা ভুলে গেলে চলবেনা যে, পৃথিবীর শুরুলগ্ন থেকেই সত্য-মিথ্যার লড়াই চলে আসছে এবং বর্তমান সময়েও হক্ব ও বাতিলের মধ্যকার যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছে। সুতরাং আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে অবস্থিত "গোপন শক্তি" নিশ্চয় বাতিলের সাথে সম্পৃক্ত। পাশাপাশি এব্যাপারেও কোন সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, এ সকল প্রস্তুতি পৃথিবীর বুক থেকে হক্বের নিশানা মুছে দিয়ে বাতিলের স্বর্গরাজ্য কায়েমের দিবাস্বপ্ন বাস্তবায়ন, সত্যকে মিটিয়ে মিথ্যার জয়জয়কার প্রতিষ্ঠা এবং মুহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত তাওহীদ (এক আল্লাহ তা'লায় বিশ্বাস) থেকে ইবলীস লালিত "কানা দাজ্জালের" খোদায়ীর সামনে দুনিয়াবাসীর মাথা নত করানোর জন্যই গৃহীত হচ্ছে। যে ধরনের ঘটনা বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল ও ফ্লাইং

সোসার্সের ব্যাপারে ঘটে আসছে, মুহাম্মাদে আরাবী সা. থেকে বর্ণিত হাদিসের আলোকে যদি এগুলো বিশ্লেষণ করা হয়, তবে একজন মুসলমান হিসেবে তার চিন্তা তৎক্ষনাৎ ঐ মহান ফেতনার দিকে যাওয়া উচিৎ; যা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক ভয়ানক ফেতনা হিসেবে প্রকাশ হবে। যে ফেতনার ব্যাপারে যুগে যুগে প্রত্যেক নবী-রাসূল স্বীয় উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন এবং আমাদের মহানবী মুহাম্মাদে আরাবী সা.-ও উম্মতকে বারবার এথেকে সতর্ক করে গেছেন।

এটা হচ্ছে দাজ্জালের ফেতনা। যা স্মরণ করে সাহাবায়ে কেরাম রা. পর্যন্ত কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। স্বয়ং নবীজী সা. পর্যন্ত এ মহা-ফেতনা সম্পর্কে এত শংকিত থাকতেন-যে, মদীনা মুনাওয়ারায় একবার একটি ছেলের (ইবনে সাইয়াদ) সন্ধান পাওয়া যায়; যার মধ্যে দাজ্জালের নিদর্শনসমূহ বিদ্যমান ছিল। খবর পেয়ে রাসূল সা. স্বয়ং তদন্তের জন্য তার বাড়ী পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং চুপিসারে তার মতিগতি লক্ষ রেখে তার ব্যাপারে তদন্ত করতেন।

আজ উম্মতের কি হল-যে, মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর কথাসমূহ সত্য বলে বিশ্বাসকারীগণও আজ সর্বপ্রকার আশংকামুক্ত হয়ে পিঠ দেখিয়ে বসে রয়েছে। হওয়া তো দরকার ছিল এমন-যে, ফ্লাইং সোসার্স আর বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ঘটনাসমূহ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে এগুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, একদিকে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘনিয়ে এসেছে; অপরদিকে উলামায়ে কেরামও মিম্বর ও মেহরাবে দাজ্জালের ফেতনা ও তার ভয়াবহতার বর্ণনাও ছেড়ে দিয়েছে।

যেমনিভাবে ইবনে সাইয়াদের ব্যাপারে নবী করীম সা. এর কার্যক্রম ছিল যে, কিছু নিদর্শন তার মধ্যে বিদ্যমান থাকায় উনি নিজে তার ব্যাপারে তদন্ত করতেন। সুতরাং বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল আর ফ্লাইং সোসার্সের ব্যাপারে আমাদেরও একই পন্থা অবলম্বন করা চাই। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা চাই যে, মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর যবানে মুবারাক থেকে যে সকল নিদর্শন দাজ্জালের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে; বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল ও ফ্লাইং সোসার্সের মধ্যে এসকল নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছেনা তো ???!!!

ফ্লাইং সোসার্স কি "কানা দাজ্জালে"র মালিকানায় ??!!

বর্তমান বিশ্বে চলতি হক্ব-বাতিলের এই যুদ্ধে মুসলমানদের একথাটি ভাল করেই চিন্তা করতে হবে যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের অভ্যন্তরে বিদ্যমান অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন শক্তি কোন শক্তি ?? সারাবিশ্বে চলিত কুফর ও ইসলামের সর্বশেষ এ মরণযুদ্ধে সে কাকে সাপোর্ট করছে ??!!

স্পেনের বিশ্লেষণকমিটি ফ্লাইং সোসার্সকে শয়তানের রূপ বলে থাকে। একজন রোমান কেথোলিক পাদ্রী "ফাদার ফ্রেক্সিডো (যাকে ফ্লাইং সোসার্সের ব্যাপারে সনদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়) বলেন- "এ সবকিছুই হচ্ছে শয়তানী কারুকার্য। চার্চ এবং আমাদের পূর্ববর্তী পন্ডিতগণ যাকে শয়তান বলত, তাকেই আজ ফ্লাইং সোসার্সের প্রাণী বলা হয়। প্রত্যক্ষকারীগণ ফ্লাইং সোসার্স ঘুরাঘুরির সময় সেলফারের গন্ধ পেয়ে থাকে। এটা হচ্ছে সেই গন্ধক পাথরের গন্ধ, যা শয়তানের দিকে নিক্ষেপ করা হয়।"

ফাদার ফ্রেক্সিডো থেকে আরো কিছু মতামত পাওয়া যায়। যেমন- যখনই ক্যারিবিয়ান সমুদ্রে ফ্লাইং সোসার্স প্রকাশ হয়, স্থানীয় এলাকাসমূহে তখন অলৌকিক সব ঘটনা ঘটতে থাকে। যথা- গিরজার মূর্তিগুলো কাঁদতে শুরু করে অথবা এদের মুখ থেকে রক্ত বের হতে শুরু করে, ফটোসমূহ উজ্জল হয়ে যায়, চার্চ টাওয়ার থেকে আলোর বিকিরণ ঘটে, ব্যক্তিগতভাবে সর্বাঙ্গীন রোগীর আরোগ্য লাভ ইত্যাদি..।

ফ্লাইং সোসার্স প্রকাশের সময় সর্বব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির পূর্ণ সুস্থ্যতা লাভের ঘটনা বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ, যারা ফ্লাইং সোসার্স অধিকারীদের সাথে সশরীরে সাক্ষাত করেছে, তাদের মধ্যে আশ্চর্য ধরনের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে।

ফাদার ফ্রেক্সিডোর মতামতের প্রমাণে ঐ সকল শিক্ষার্থীদের গায়েব করাকে তুলে ধরা যায়; যাদেরকে

এলাগাশের জঙ্গল থেকে গুম করা হয়েছিল। তাদের একজনের ব্রেইনে আশ্চর্য ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়(পরবর্তীতে মেথমেটিক্সে সে সুদক্ষ হয়ে উঠে)।

আমেরিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা (বিশেষতঃ বড় বড় ইহুদী ব্যংকার এবং পেন্টাগনে অবস্থিত ইহুদী জেনারেলগণ) বারমুডার আভ্যন্তরীণ রহস্য ভাল করেই জানে। তাদের সাথে ওখান থেকে নিয়মিত যোগাযোগও হয়। এমনটিই মনে করে ফ্লাইট-১৯ (যাতে পাঁচটি বিমান একসাথে গায়েব হয়েছিল)-এ কর্মরত ক্যাপ্টেন পাওয়ারসের স্ত্রী জন পাওয়ারস। তার মন্তব্য- "নিশ্চয় ক্যাপ্টেনগণ বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ভেতরের কোন গোপন, ভয়ানক ও রহস্যময় বস্তু প্রত্যক্ষ করে ফেলেছিল; যা তাদের বিমানগুলিকে অকেজো করে দিয়েছিল। এমন কোন বস্তু; যা ল্যাফেটনেন্ট টেলরকে এতটাই শংকিত করে তুলেছিল যে, সে কাউকে তার পিছু না নেয়ার জন্য এবং স্বীয় প্রাণকে শংকায় না ফেলার জন্য নিষেধ করে দিয়েছিল। অবশ্যই তা এমন কোন বস্তু; যাকে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মার্কিন সামুদ্রিক টীম জনসাধারণ থেকে গোপন রাখতে চায়।"

"আমি খুব ভাল করেই জানি- গায়েব হওয়া সকল মানুষেরা কোথায় গেছে। কেননা তাদের সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হয়। শুধু তাই নয়; বরং ঐ সকল গায়েব হওয়ার ঘটনাগুলোও আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি, বরং গায়েব হওয়া কিছু ব্যক্তিদের সাথে আমি কথাও বলেছি। যদিও এখন তাদের ফিরে আসা এবং জনসম্মুখে তাদের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। তারা এ পৃথিবীরই কোন এক স্থানে বিদ্যমান। আমি ১৯৪৫ সালে গায়েব হওয়া একটি প্লেনের পাইলটের সাথে আলাপ করেছি। গায়েব হওয়ার পর থেকে তার সম্পর্কে কারো কিছু জানা নেই। গায়েব হওয়ার সময় তার বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। আর আমি তার সাথে সাক্ষাত করেছি ১৯৬৯ সালে। সে তখন জীবিত ছিল। কিন্তু কোথায়??!! এ পৃথিবীরই কোন এক জায়াগায়!!"

উপরোক্ত দাবীই পেশ করেছেন এড স্নেডেকার (Ed snedeker)নামক এক বৈজ্ঞানিক। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়-যে, এড স্নেডেকারের দাবী কি ভীত্তিহীন ? নাকি ব্যাপারটি এমন যে, কিছু বিশেষ ব্যক্তিদের এ কথা জানা আছে যে, বারমুডার পানির গভীরে গুম হওয়া মানুষেরা কোথায় অবস্থান করছে ??!! তাহলে কি তারা বারমুডার পানির গভীরে বিদ্যমান "গোপন শক্তি" সম্পর্কেও অবগত ??!!

মুহাম্মদ ঈসা দাউদ মিসরী হচ্ছেন একজন মুসলিম গবেষক। ফ্লাইং সোসার্স ও বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের উপর উনার গবেষণা খুবই গভীরের। তার মতে- ফ্লাইং সোসার্স দাজ্জালের মালিকানায় এবং তারই আবিস্কৃত বিষয়। পাশাপাশি বারমুডার পানিতে ইবলিসের সাহায্যে সে ত্রিভোজের আকৃতিতে স্বীয় দূর্গ স্থাপন করেছে (বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ভেতরে বিভিন্ন প্রকারের অট্রালিকা অনেক ডুবুরীগণই প্রত্যক্ষ করেছেন)। যেখানে বসে বসে সে তার মুরীদদেরকে নিয়মিত হেদায়েত দিয়ে যাচ্ছে এবং আবির্ভাবের প্রতিশ্রুত মুহুর্তের প্রহর গুনছে। তার সকল মিশনে সে শয়তানের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ সহযোগীতা পেয়ে থাকে; যা বর্তমান সারাবিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং গণতান্ত্রিক ময়দানে দৃশ্যমান। কোন দেশে কারা সরকার গঠন করবে, কোন দেশে কতটুকু পরিমাণ অর্থনৈতিক সাহায্য পদান করা হবে, কোন কোন অঞ্চলে সেনাক্যাম্প স্থাপন করা লাগবে এবং কোন কোন রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন অঞ্চলে বহমান নদীগুলো বিশেষতঃ মুসলিম বিশ্বের সাগর-নদীগুলো শুকানোর জন্য কোথায় কোথায় বাঁধ স্থাপন করা লাগবে, বিশ্বাসীদেরকে ক্ষমতার মসনদে বসানো এবং ঐ সকল জাতিকে এখন থেকেই সরিয়ে দেয়া যারা পরবর্তীতে দাজ্জালের বিরুদ্ধে কাতারবন্দী করতে পারে।

যতদূর পর্যন্ত জানা যায়- বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল ইবলিসের মারকায; এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দাজ্জাল যে ওখানেই বিদ্যমান, এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, নবী করীম সা. তো দাজ্জালের অবস্থান মাশরিক তথা আরবের পূর্বদিকে নির্ধারণ করেছেন আর বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল তো আরবের পশ্চিমে ??!! এর প্রতিউত্তরে মুসলিম গবেষক মুহাম্মদ ঈসা দাউদ মিসরী বলেন- রাসূলে কারীম সা. দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর দাজ্জাল পূর্বের ন্যায় বাধা অবস্থায় ছিলনা; যেমনটি তামীমে দারী রা. দাজ্জালকে একটি দ্বীপে বাধা অবস্থায় দেখেছিলেন। বরং নবীজী সা. এর ইন্তেকালের পর সে জিঞ্জির থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এখন সে তার আবির্ভাবের অনুমতির অপেক্ষা করছে। সুতরাং পরিপূর্ণ আযাদী তার ঐ সময় মিলবে, যখন সে পৃথিবীবাসীর সামনে প্রকাশ হয়ে নিজের খোদায়ী ঘোষনা করবে।

এটাও হতে পারে যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে ইবলিসের রাজত্ব আর জাপানের শয়তানী সমুদ্রে বা ইরানের আসফাহানে দাজ্জালের রাজত্ব "। উভয় জায়গার পারস্পরিক যোগাযোগও হয় এবং দুনো স্থান হতেই ইসলামের বিরুদ্ধে বরং সম্পূর্ণ মানবতার বিরুদ্ধে সার্বিক ষড়যন্ত্র জারী হয়। উল্লেখ্য যে, জাপানের শয়তানী সমুদ্র আরবের পূর্বে অবস্থিত।

দাজ্জাল কি জিঞ্জির থেকে মুক্ত হয়েছে ??

দাজ্জাল প্রকাশ হওয়া পর্যন্তই জিঞ্জিরে বাধা অবস্থায় থাকা সম্পর্কে কোন হাদীস পাওয়া পায়না। বরং সহীহ হাদিসে একথা স্পষ্টতই বলা আছে যে, দাজ্জাল তার খোদায়ী দাবীর পূর্বে জিঞ্জিরে বাধা অবস্থায় থাকবেনা বরং সে মুক্ত এবং তৎপর থাকবে (উল্লেখ্য যে, দাজ্জাল প্রকাশের মানে হচ্ছে- তার খোদায়ী দাবীর ঘোষনা প্রদান, বিস্তারিত সামনে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ্)। পাশাপাশি তার কাছে শক্তিও থাকবে। মিডিয়ার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বকে এক কর্মপরায়ণ, জনদরদী এবং মহান পথপ্রদর্শক হিসেবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হবে। সহীহ হাদিসে এ কথা স্পষ্টতই বলা আছে যে, "প্রথমে সে নিজেকে নবী বলে দাবী করবে"। নবুওয়তের দাবী ঐ ব্যক্তিই করতে পারে, যার কিছু অনুসারী বিদ্যমান থাকে এবং সে মুক্ত-স্বাধীন হয়। জনমানবহীন কোন অজানা দ্বীপে শিকল দ্বারা বাধা ব্যক্তি কার সামনে নবী দাবী করবে বা তার অনুসরণকারীই বা কে হবে ??!!

ইমাহ হাকিম রহ. মুস্তাদরাক-এ দাজ্জালের ব্যাপারে এক লম্বা হাদিস বর্ণনা করেছেন, যার কিছু অংশ এরূপ-

إنه يخرج المؤمنين من خُلّة بين العراق والشام ، فعاث يمينا وعاث شمالا. يـا عبـاد الله ! فـاثبتوا. فإنه يبدأ فيقول : أنا نبي ، ولا نبيّ بعدي ، ثم يثني حتى يقول : أنا ربكم ، ولن ترَوا ربكم حتى تموتوا... هذا حديث صحيح بشرط مسلم ، ولم يخرجاه بهذه السياقة. وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم (مستدرك حاكم مع تعليقات الذهبي 8620)

অনুবাদ- নিশ্চয় সে (দাজ্জাল) শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী এক রাস্তা থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। অতপর সে তার ডানে-বামে অনেক বেশি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। (রাসূলে কারীম সা. বলেন-) হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা অটল থেকো! কারণ, প্রথমে সে বলবে যে, আমি নবী। (রাসূলে কারীম সা. বলেন-) অথচ আমার পরে আর কোন নবী আসবেনা। এরপর সে নিজেকে আরো অনেক কিছু দাবী করবে। শেষপর্যন্ত বলবে যে, আমিই তোমাদের খোদা। রাসূলে কারীম সা. বলেন-) অথচ মৃত্যুর পূর্বে কখনোই তোমরা তোমাদের প্রভূকে দেখতে পারবেনা। (হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ.এর শর্তমতে সহীহ)

হাফেয যাহাবী রহ.ও হাদিসটিকে ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্তের স্তরের হাদিস বলেছেন।

উপরোক্ত হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সে খোদায়ী দাবীর পূর্বে মুক্ত ও স্বাধীন হবে। তাছাড়া অন্য একটি হাদিসেও একথা স্পষ্ট বলা আছে যে, দাজ্জাল তার খোদায়ী ঘোষনার পূর্বে দুনিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে।

উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসা রা. বলেন-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما يخرج الدجال من غضبة يغضـبها (صـحيح ابـن حبان:6793. مسند أحمد:26425)

অর্থাৎ- আমি রাসূলে কারীম সা. কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় দাজ্জাল কোন ব্যাপারে প্রচন্ড রাগান্বিত

হওয়ার পর তার আত্মপ্রকাশ ঘটবে। (মুহাক্কিক শুআইব আরনূত হাদিসটি ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্তের স্তরের হাদিস বলেছেন)

যদি দাজ্জাল অদ্যাবধি কোন অজানা দ্বীপে পূর্বের অবস্থায় শিকলে বাধা ধরে নেয়া যায়, তাহলে তার সম্পর্কে তো কারোরই জানা থাকার কথা নয়। এমতাবস্থায় দুনিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কেও সে অজ্ঞাত থাকবে। তাহলে হাদিসের মর্ম কি !! যখন তার কোন খবরই থাকবেনা, তবে তার রাগ কার উপর হবে!! সুতরাং নিশ্চয় সে তার খোদায়ী ঘোষণার পূর্বে মুক্ত-স্বাধীন হবে। এমনটি নয় যে, কোন গুমনাম অজানা দ্বীপ থেকে সে শিকল ছিড়ে বের হল, আর হঠাৎ খোদায়ী ঘোষনা করে বসল। পরিস্থিতি এমন হলে মুসলমান তো দূরে থাক; স্বয়ং তার অপেক্ষা করতে থাকা আসফাহানের ইহুদীরা পর্যন্ত তাকে খোদা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করবে। এখন আপনার চিন্তায় একটি প্রশ্ন হয়ত উদয় হচ্ছে যে, হাদীসে তো এ বর্ণনাই এসেছে- হঠাৎ দাজ্জাল বের হয়ে তার কারিশমা দেখাতে শুরু করবে। এর উত্তর হচ্ছে- দাজ্জালের বের হওয়া মানে তার খোদায়ী ঘোষনা করা। খোদায়ী ঘোষনার পরই সে তার সকল অলৌকিক বিষয়াদী -যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- জনসম্মুখে প্রকাশ করবে। দাজ্জাল কর্তৃক "দাজ্জালী রূপে আত্মপ্রকাশ এবং সেই যে দাজ্জাল তা প্রকাশ হওয়া" তার খোদায়ী ঘোষনার পর বুঝা যাবে। এরপরই ঐ সকল ব্যাপারগুলো প্রকাশ হতে থাকবে, যার সাহায্যে সে নিজেকে প্রভু বলে সাব্যস্ত করতে চাইবে।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ "ফাতহুল বারী"তে বর্ণনা করেন-

فيقول : أنا نبي ، ثم يثني أنا ربكم ، فإنه يحمل على أنه إنما يظهر الخوراق بعد قوله الثاني. (فتح الباري لابن حجر العسقلاني رحمه الله)

অর্থাৎ- দাজ্জাল বলবে- আমি নবী। এরপর সে বলবে- আমি তোমাদের প্রভূ।" সুতরাং বাক্যের ভাবভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, তার থেকে যে সকল অলৌকিক বিষয়াদীর প্রকাশ ঘটবে, তা তার দ্বিতীয় দাবীর পর ঘটবে।) ইবনে হাজার রহ. এর প্রমাণস্বরূপ দাজ্জাল কর্তৃক ঐ ঘটনাটি পেশ করেছেন, যেখানে সে এক গ্রাম্যব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলবে- "আমি যদি তোমার মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেই, তাহলে কি তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আমি তোমার প্রভূ।"

অপর একটি ঘটনা থেকেও একথাই সাব্যস্ত হয় যে, তার অপবিত্র ব্যক্তিত্ব ঐ সময়ই প্রকৃত রূপে প্রকাশ পাবে, যখন সে নিজেকে খোদা বলে দাবী করবে। মুসলিম শরীফের একটি হাদিসে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে- “দাজ্জালের কাছে ঘোরবিরোধী এক যুবককে গ্রেফতার করে আনা হবে। দাজ্জাল তাকে খোদা বলে বিশ্বাস করার দাবী জানালে ঐ যুবক তা অস্বীকার করবে। অতপর দাজ্জাল তাকে কেটে দু'টুকরা করে পূণরায় জীবিত করবে। অতপর পূণরায় তাকে খোদা বলে বিশ্বাস করার দাবী জানালে যুবকটি আরো শক্তভাবে তাকে অস্বীকার করবে।" পাশাপাশি দাজ্জাল আসমানকে হুকুম করবে বৃষ্টি বর্ষন করার- আসমান বৃষ্টি বর্ষন করবে। যমিনকে আদেশ করবে ফসল ফলানোর- যমিন ফসল ফলাবে। মোটকথা- যতপ্রকার অলৌকিক বিষয়াবলী তার থেকে প্রকাশ পাবে বলে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে, সবগুলোই দাজ্জাল কর্তৃক খোদায়ী ঘোষনার পর প্রকাশ পাবে। এর আগে মানুষ বুঝতে পারবেনা যে, সেই হচ্ছে দাজ্জাল। একারণেই উপরোক্ত ঘটনায় দাজ্জাল যখন যুবকটিকে কেটে দু'টুকরা করে পূণরায় জীবিত করে তাকে খোদা বলে বিশ্বাসের দাবী জানাবে, তখন যুবকটি উত্তরে বলবে- এখন তো আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, তুইই হচ্ছিস দাজ্জাল, যার ব্যাপারে নবী করীম সা. আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন।

উল্লেখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটাই সাব্যস্ত হয় যে, দাজ্জালের "দাজ্জালী মনোভাব" তার খোদায়ী দাবীর পরই প্রকাশ হবে। এর পূর্বে সে কোন সংশোধনকারী, জনদরদী, শান্তিকামী এবং মহান পথনির্দেশক হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি লাভ করবে। পাশাপাশি খোদায়ী দাবীর পূর্বে সে জিঞ্জির থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন হবে। তবে পূর্ণ স্বাধীনতা ও অলৌকিকতা তার খোদায়ী দাবীর পর ঘটতে থাকবে। (বাকী আল্লাহ তা'লাই ভাল জানেন والله أعلم ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا)

পেন্টাগনের সাথে কি দাজ্জালের কোন যোগাযোগ রয়েছে ??

দাজ্জাল সম্পর্কে বিশেষ গবেষণাকারী "আছরার আলম" রহ. বলেন- ইহুদীবাদী তথ্য মোতাবেক পেন্টাগন হচ্ছে দাজ্জালের গোপন শক্তির সেনা-হেডকোয়ার্টার। আজও এর হর্তা-কর্তা সকলেই ইহুদী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট শুধু নামমাত্র এখানে আসা-যাওয়া করে; এর বেশি কিছু নয়। প্রতিটি বিভাগে একজন করে ডিক চেনি বিদ্যমান, যার মুখনিস্রিত প্রতিটি ফায়সালাই পলিসি হয়ে যায়।

১৯৯৯ সালে আমেরিকাকে যে লোকটি শাসন করেছে, তার নাম হচ্ছে ডিক চেনি। তখন আমেরিকার সকল ফায়সালাই; স্বরাষ্ট্রীয় বিষয় হোক বা পররাষ্ট্রীয় বিষয়; যেমন- টেক্সের বিষয়, আফগানিস্তানে হামলার বিষয় অথবা ইরাকে হামলার বিষয়। সংসদের অধিকাংশ সদস্যের বিরোধীতা সত্তেও বুশের সিগনেচার ডিক চেনির ফায়সালামতেই হয়েছে। এমনকি এফবিআই-এর প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত ইস্তফার ঘোষনা দিয়েছিলেন, তবুও শেষপর্যন্ত সকল সিদ্ধান্তই ডিকচেনির সন্তুষ্টিতে হয়েছে। গুয়ান্তানামো, বাগরাম এবং আবূগরীব ইত্যাদি কারাগারে মুজাহিদীনের সাথে শয়তানী (দাজ্জালী) আচরণের আদেশ একতরফাভাবে শুধুমাত্র ডিক চেনির মুখ থেকেই বের হয়েছে এবং এগুলোই শেষপর্যন্ত স্বাধীন সার্বভৌমত্বের অধিকারী শিক্ষিত মার্কিন সমাজের সংবিধান হয়েছে। মার্কিন জাগ্রত নাগরিক তো দূরের কথা; কলিন পাওয়েল এবং "কালিজাদুগীরনী" কন্ডোলিসা রাইস পর্যন্ত এবিষয়ে দুই বৎসর পর জানতে পারে। তাও কি; পত্রিকা-সংবাদের ভিত্তিতে। উভয়েই তখন প্রচন্ড রাগান্বিত হয়...। কিন্তু ডিক চেনির বিপরীতে কেউ তখন কোন কথা বলার সাহস দেখায়নি। সবদূষ চাপে বুশের উপর; কারণ সেই তো সাইনবোর্ড ছিল।

ডিক চেনির ব্যাপারে "আছরারে আলমের দাবী যে, ডিক চেনি দাজ্জালের সাথে সাক্ষাত করেছে এবং দাজ্জাল নিয়মিতভাবে তাকে হেদায়েতও করে থাকে।

ডিক চেনি এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যে দাজ্জালের পক্ষ থেকে জনসম্মুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। অন্যথায় আমেরিকাই বা কি; ব্রিটেন, সুইডেন, নরওয়ে, আসফাহান, কাবুল এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রক ফেলর, রথ শিল্ড ও মরগান বংশের মত কত হারামযাদারা বসে আছে, যাদের ঠোঁটের একপলক নড়াচড়াই গণতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের সংবিধান হয়ে যায়। আমেরিকার সাথে সারাবিশ্বের শাসনকর্তারাও আইএমএফের সদরদফতরের স্থলে নিউয়োর্কে এক টুকরা যমিনে মাথা গুজার ঠাই খুঁজছে। আমেরিকা ও ব্রিটিশের মত শক্তি যেখানে ওদের ইশারায় চলছে, সেখানে সাধারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দরজাগুলি তো এমনিতেই মাথা নাড়াবে।
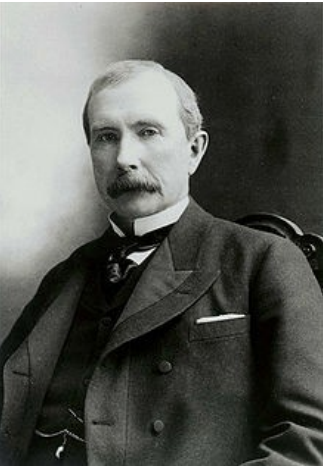
সুতরাং একথা সঠিক বলেই মনে হয় যে, দাজ্জাল যদি তৎপর থাকে, তাহলে ইহুদী বংশীয় লোকদের সাথে অবশ্যই সে যোগাযোগের মধ্যে রয়েছে। ইহুদী বংশীয় লোকদের ব্যাপারে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কথা লম্বা হয়ে যাবে। শুধু এতটুকু জেনে রাখুন যে, আফগানিস্তানে তালেবান পতনের পর সর্বপ্রথম রক ফেলর ইহুদী ফ্যামিলির বাইশ বৎসরের এক ছেলে এসেছিল; সেই সর্বপ্রথম আফগান অপারেশানের তদারকি করেছিল। ইহুদী এ বংশটিই আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জাতিসংঘ, জঙ্গিবিমান প্রস্তুতকারী কোম্পানীসমূহ, অত্যাধুনিক অস্ত্র, দূরপাল্লার মিযাইল, মহাকাশ গবেষণা সংস্থা "নাসা" এবং মার্কিন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রী হলিউড ইত্যাদি সকল কিছুর মালিক। জ্বী হ্যাঁ...! এসবকিছুর মালিক।

বিস্তারিত লেখার সময় হাতে নেই। আগ্রহী হলে(The Rock feller Syndrome) গ্রন্থটির অধ্যয়ন আপনাকে বিস্তারিত সব জানিয়ে দেবে।

উপরোক্ত এ ইহুদী বংশটি শুধু ব্যাংকারিই নয়; বরং "ক্যাবালা" সম্পর্কেও প্রচুর জ্ঞান রাখে। একারণেই কতিপয় ইংলিশ লেখক এদেরকে "পাঁচ ক্যাবালা" নামেও সম্বোদন করেছে। এরাই হচ্ছে কট্টর ইহুদী সম্প্রদায়। দাজ্জাল তার খোদায়ী ঘোষনার পূর্বে এসকল লোকদের ব্যবহার করেই স্বীয় রাস্তা প্রসস্ত করবে। কারণ, কুরআন-হাদিসে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, শয়তান মানুষের মাঝে বিদ্যমান বন্ধুদেরকে সাহায্য করে থাকে।

হযরত জাবের রা. বর্ণিত যে, রাসূলে করীম সা. কে আমি বলতে শুনেছি- ইবলিস তার সিংহাসনকে সমুদ্রে স্থাপন করে। মানুষের মাঝে ফেতনা ছড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সে তার সহযোগী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে যে সবচে বেশি ফেতনা সৃষ্টি করতে পারে, সে ততই শয়তানের নৈকট্যশীল হিসেবে গন্য হয়। (মুসলিম শরীফ) মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারী ইমাম নববী রহ. বলেন- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবলিসের মারকায বা কেন্দ্র। অর্থাৎ শয়তানের কেন্দ্র হচ্ছে সমুদ্রে।

হযরত কা'ব আহবার রা. বলেন- সমুদ্রের কোন এক দ্বীপে একটি জাতি বাস করে, যারা খৃষ্টধর্ম চর্চা করে থাকে। প্রতিবৎসর এক হাজার করে রণতরী তৈরী করে। রণতরীগুলো তৈরী হওয়া শেষ হলে তারা বলে যে, আল্লাহ চান বা না চান- যাত্রা শুরু কর!। অতপর যখন তারা যাত্রা শুরু করে, তখন আল্লাহ পাক তাদের বিপরীতে প্রবল বাতাস প্রেরণ করেন যা তাদের রণতরীগুলো মুহুর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেয়। প্রত্যেক বৎসরই তারা এমনিভাবে জাহাজ তৈরী করে, আর প্রত্যেক বৎসর আল্লাহ তালা তাদের ষড়যন্ত্র বাতাস পাঠিয়ে ধ্বংস করেন। সুতরাং আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনে যখন বিষয়টি পূর্ণ করতে চাইবেন, তখন এমনসব রণতরী তৈরী করা হবে যা ইতিপূর্বে কখনো তৈরী করা হয়নি। অতপর বলা হবে- আল্লাহ চাহেন তো যাত্রা শুরু কর! সুতরাং তারা রওয়ানা হয়ে যাবে। বলবে যে, আমরা ঐ যমিনে ফিরে যাচ্ছি, যেখান থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। (আল-ফিতান, নুআইম বিন হামাদ)

হাদিসের দ্বারা স্পষ্টতই সাব্যস্ত যে, শয়তানের কেন্দ্র হচ্ছে সমুদ্রে। সুতরাং ইবলিসের মারকায সমুদ্রের এমন স্থানেই হবে, যেখানে আল্লাহর নাম এবং আযানের আওয়াজও কোন সময় পৌছেনা, যেখান থেকে মানবতার বিরুদ্ধে তার অভিযান সফলভাবে চালিয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি হযরত কা'বে আহবার রহ. এর উপরোক্ত বর্ণনা সামনে রেখে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের রহস্যময় বিষয়াবলী; অবিশ্বাস্য সব ঘটনাবলীর উপর যদি চিন্তা করা হয়, তবে অসম্ভব কিছু না যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলই ইবলিসের কেন্দ্রীয় মারকায এবং "কানা দাজ্জাল"ও তাকে সার্বিক সহযোগীতা করছে। অথবা ইবলিস এখানে আর "দাজ্জাল" জাপানের শয়তানী সমুদ্রে।

ইবলিস কর্তৃক মানুষের আকৃতিতে এসে তার সহযোগীদের পরামর্শ দেয়া কুরআনে কারীম দ্বারা সাব্যস্ত। বদরের যুদ্ধে স্বয়ং ইবলিস সহযোগীতার জন্য রণাঙ্গন পর্যন্ত গিয়েছিল। সে বনু কেনানার সরদার সুরাকা বিন মালেকের আকৃতিতে এসেছিল এবং আবূ জেহেলকে যুদ্ধের জন্য নিয়মিত উৎসাহ দিচ্ছিল। যেরকমভাবে আল্লাহ তা'লার নেক বান্দাদের "আওলিয়াউল্লাহ" বলা হয়, ঠিক তদ্রুপ শয়তানেরও কিছু বন্ধু থাকে, যাদেরকে কুরআনে কারীমের ভাষায় "আউলিয়াউশ শাইতান" বলা হয়।

কুরআনে কারীমে এমন আয়াত বহুবার এসেছে-

(وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم (سورة الأنعام

"অবশ্যই শয়তানেরা তাদের বন্ধুদের কুপরামর্শ দিয়ে থাকে।"

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل أفاك أثيم ، يلقون السمع وأكثرهم كــاذبون. (سورة الشعراء)

"আমি কি তোমাদের বলব যে, শয়তান কাদের কাছে অবতরণ করে?! সে প্রত্যেক মিথ্যুক পাপিষ্ঠের কাছে অবতরণ করে; তারা শ্রুত কথা এনে দেয়। তাদের অধিকাংশই মিথ্যুক।"

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.(سورة الزخرف)

"আর যে রহমানের যিকির থেকে গাফেল থাকে, আমি তার পেছনে শয়তান লাগিয়ে দেই; যে সদা তার সাথে অবস্থান করে। নিশ্চয় ঐ শয়তানেরা তাদেরকে সঠিক পথ অনুসরণ করতে বাধা দেয়। আর সে মনে করতে থাকে যে, সে সঠিক পথেই আছে।"

কুরআনে কারীমের এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টতই সাব্যস্ত হয় যে, ইবলিস শয়তানেরা সবসময় তাদের মানুষবন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে থাকে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. তার "أولياء الشيطان وأولياء الرحمن " গ্রন্থে লিখেন- কতিপয় লোকদের চোখে আকাশে সিংহাসন ভেসে থাকে। যার উপরিভাগে জ্যোতি থাকে। জ্যোতির ভেতর থেকে আওয়াজ আসে যে, আমি তোমার প্রভূ। ঐ ব্যক্তি যদি আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে অবগত থাকে, তাহলে বুঝতে পারে যে, সে শয়তান। তাই সে শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় এবং আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থণা করে। যারফলে জ্যোতিময় সিংহাসন শেষ হয়ে যায়। কিছু লোক এমনও আছে- যাদেরকে শয়তান জেলখানা থেকে মুক্ত করে দেয় (আর যদি তাদের উপর কেউ অস্ত্র দিয়ে হামলা করে, তবে) শয়তানেরা তার থেকে হামলা প্রতিহত করে। যেমনটি ঘটেছে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনকালে "হারেস দিমাশকী"র বেলায়। সে শামে নবুওয়ত দাবী করেছিল। (তাকে আবদ্ধ করলে) শয়তানেরা তাকে বারবার জিঞ্জির থেকে মুক্ত করে দিত এবং কোন হামলার শিকার হলে অস্ত্রের সাহায্যে তার থেকে প্রতিহত করত। সে পাথরের উপর স্পর্শ করলে পাথর তাছবীহ পড়া শুরু করত। মানুষের চোখে শূন্যে মানুষ ও অশ্বারোহী ভেসে উঠত। মিথ্যুক হারেস বলত যে, এগুলো ফেরেশতা। অথচ এগুলো ছিল শয়তান। অতপর গ্রেফতারের পর যখন তাকে হত্যা করার জন্য একজন মুজাহিদ তার বুকে বল্লম মারল, তখন বল্লম তার উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান তখন বল্লমধারী মুজাহিদকে বললেন- তুমি বিসমিল্লাহ পড়নি। অতপর পূণরায় বিসমিল্লাহ বলে বল্লম দিয়ে তার বুকে আঘাত করল সাথে সাথে হারেস মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। (أولياء الرحمن وأولياء الشيطان-شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله)

ইউরোপের কয়েকটি জাদুঘরে এমনটি পরিলক্ষিত হয়েছে যে, তারা শো'তে অলৌকিক সব কার্যক্রম এবং ম্যাজিক দেখিয়ে থাকে। যাদের মধ্যে "ডেভিড কপার ফিল্ড" অন্যতম। তার ব্যাপারে মুহাম্মাদ ঈসা দাউদের দাবী- দাজ্জাল তাকে সহযোগীতা করে থাকে।

বুঝা গেল- শয়তানেরা তাদের এজেন্টদের সাথে যুদ্ধে শরীক থেকে বিভিন্ন রকমভাবে তাদের রক্ষা করে থাকে (সুতরাং মুজাহিদীনের অবশ্যই তাদের কার্যক্রম পরিচালনার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়া চাই)।

ইউরোপের সাইন্সে বৈপ্লবিক পরিবর্তন... দাজ্জালের কর্তৃত্ব

কথাটি যদিও বড় আশ্চর্যের মনে হয় যে, ইউরোপের সাইন্সে বৈপ্লবিক পরিববর্তনের পেছনে দাজ্জালের হাত রয়েছে। কিন্তু যদি এব্যাপারে কারো কাছে কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থেকে থাকে, তাহলে তা না শুনা পর্যন্ত এটাকে প্রত্যাখ্যান করা যায়না। এটাই মুহাম্মদ ঈসা দাউদ মিসরীর মতামত।

ঈসা দাউদের দাবী হচ্ছে- বর্তমান আমেরিকা এবং সকল কুফরী শক্তির কাছে যে অত্যধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন অস্ত্র-সস্ত্র বিদ্যমান, তা মূলত দাজ্জালের ঐ সকল বৈজ্ঞানিকদের আবিস্কৃত বিষয়; যাদেরকে সে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের পানিতে গায়েব করেছিল। আমেরিকা ও অন্যান্য কুফরী শক্তি মূলত ওখান থেকেই

প্রকৃত টেকনোলোজী গ্রহণ করে থাকে। পরে তারাও এবিষয়ে আরো গবেষণা করে। প্রযুক্তির ব্যাপারে নতুন নতুন বৈপ্লবিক পরিকল্পনাসমূহ সর্বপ্রথম দাজ্জালের কাছে ছিল। পরে আস্তে আস্তে তা পশ্চিমাবিশ্বে ট্রান্সফার করা হয়েছে। যদি বলা হয়- পশ্চিমাবিশ্বের বড় বড় বৈজ্ঞানিকদেরকে দাজ্জাল তাদের নবআবিস্কৃত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল- তাহলে আপনার কেমন লাগবে ??! নিশ্চয় আপনি টেনশানে পড়ে যাবেন..। আসুন.. একটু বিস্তারিত আলোচনা করা যাক...

আলবার্ট আইনষ্টাইন এবং দাজ্জাল...
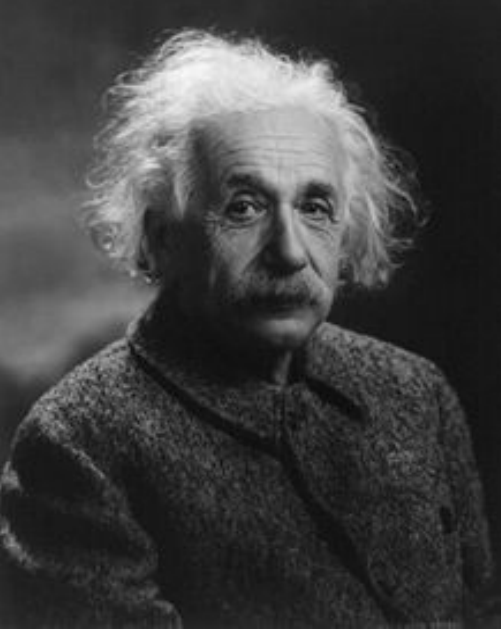
আলবার্ট আইনষ্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) এমন একটি নাম; বিজ্ঞান ইতিহাস থেকে যদি তার নাম মুছে দেয়া হয়, তাহলে বিজ্ঞানের এ উন্নতি শত শত বছর পেছনে চলে যাবে। আইনষ্টাইন ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ জার্মানীর এক ইহুদী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। জন্মের পর তিন বৎসর পর্যন্ত সে কথা বলতে পারতনা। তার ব্যাপার একটি কথা প্রসিদ্ধ যে, বাল্যকালে সে মোটা-দেমাগের ছেলে ছিল। শৈশব কেটেছে তার "মিউনিখে"। অর্থনৈতিক দৈন্যদশার দরুন তার পিতা-মাতা ওখান থেকে ইটালী চলে গিয়েছিল। আইনষ্টাইন ১৮৯৫ সালে শিক্ষার জন্য ইটালী থেকে সুইজারল্যান্ডে চলে যায়। সুইজারল্যান্ডের যিউরোখ শহরে অবস্থিত ETH ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি-ইন্টারভিউ দেয়, কিন্তু সে ইন্টারভিউতে পাস করতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তী বছর ঐ ইউনিভার্সিটিতেই সে ভর্তি হতে সক্ষম হয়। ১৯০০ সালের আগষ্টে ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেও সে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে পাঁচ শিক্ষার্থীর মধ্যে চতুর্থ হয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, সুইজারল্যান্ডের শিক্ষাজীবনে সে কোন মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে গন্য ছিলনা।

১৯০০ সালের পর থেকে আইনষ্টাইনের মধ্যে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ১৯০৫ সালকে আইনষ্টাইনের সফলতার বৎসর হিসেবে মনে করা হয়। এ বৎসরই সে তার গবেষণাময় কয়েকটি রচনা পেশ করে। প্রথম রচনাটি ছিল- জ্যোতির আকৃতি এবং দ্বিতীয় রচনাটি ছিল- Brownian Motion এর মডেল নিয়ে। তৃতীয় রচনাটি ছিল তার গবেষণার প্রসিদ্ধ E=mc2 এর সমঝোতা নিয়ে। যার মধ্যে পদার্থ এবং সম্ভাবনার পারস্পরিক পরিবর্তন অসম্ভব বলা হয়েছিল। অথচ ইটালীর এক প্রসিদ্ধ গবেষক এর কয়েক বৎসর পূর্বে একই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছিল। চতুর্থ রচনাটি ছিল Special Theory of relativity নিয়ে। এর মাধ্যমে "সময়" এবং "আকাশ"কে আলাদা আলাদা মনে করার পরিবর্তে সময়-আকাশ এবং স্থান-কাল এর মতবাদ আলোচনায় আসে। ১৯১১ সালে ব্যাপক মতামত সংযোজনের মধ্য দিয়ে পূণরায় সে রচনা পেশ করে।

মুহাম্মাদ ঈসা দাউদ মিসরী অত্যন্ত জোর দিয়ে এ কথা সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন যে, সুইজারল্যান্ডে অবস্থান করা কালেই দাজ্জালের সাথে তার যোগাযোগ হয়। আর দাজ্জালই তাকে Theory of relativity এর জ্ঞান প্রদান করে।

মুহাম্মাদ ঈসা দাউদের দাবীর প্রেক্ষিতে দু'ধরনের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে-

(১) কোরআন-হাদিসের আলোকে এধরনের দাবী কি সম্ভব যে, দাজ্জাল তার আত্মপ্রকাশের পূর্বেই মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে ??!!

(২) আইনষ্টাইনের মধ্যে এমন কোন গুণটি বিদ্যমান ছিল; যাতে খুশি হয়ে দাজ্জাল তাকে হিরো

বানিয়ে দেয়।

প্রথম প্রশ্নের জবাব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আলবার্ট আইনষ্টাইনের ব্যাপারে মুহাম্মদ ঈসা দাউদের দাবী মেনে নিতে শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে কোন বাধা নেই। তারপরও দ্বিতীয় প্রশ্নটি বাকী থাকে যে, কি এমন বিশেষ ব্যাপার ছিল; যাতে সন্তুষ্ট হয়ে দাজ্জাল তাকে মতামত দিয়ে উপরে উঠিয়ে দিয়েছে ??!! এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমাদেরকে তার ব্যক্তিগত জীবন ও মতামতসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

আইনষ্টাইন যদিও কট্টর ইহুদী ছিল। কিন্তু সে অন্যদের (খৃষ্টান ও মুসালমানদের)কে ধর্মহীনতার প্রতি আহবান করত। ব্যক্তিগতভাবে তারমধ্যে ঐ সকল খারাপ গুণাবলী বিদ্যমান ছিল; যা ইবলিস ও দাজ্জালকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল। মেয়েদের সাথে খারাপ সম্পর্ক- ১৯০২ সালে তার প্রথম মেয়ের জন্ম হয়েছিল খারাপ সম্পর্কের স্ত্রীর গর্ভ থেকে। পরে সেই মেয়েকে আর সে লালন পালন করেনি। কোন খবরও পাওয়া যায়নি যে, পরবর্তীতে মেয়ের ভাগ্যে কি ঘটেছে। বুঝতেই পারছেন- ভদ্রতা এবং সন্তানের প্রতি স্নেহ তার মধ্যে কি পরিমাণ বিদ্যমান ছিল!!

স্ত্রীর সাথে দৈনন্দিন আচার-ব্যবহার-ও ছিল অত্যন্ত নিম্নপর্যায়ের। ১৯১৪ সালে সে যখন তার প্রথম স্ত্রী মিলেভা মেরিক"কে নিয়ে জার্মানীর বার্লিনে চলে যায়, তখন তাদের দাম্পত্য জীবনে টানাপোড়নের সৃষ্টি হয়। আইনষ্টাইন স্ত্রীকে এইশর্তে তার সাথে রাখতে রাজী হয় যে :-

(১) আমার কাপড়-চোপড় এবং বিছানাপত্র ঠিকঠাকরূপে গুছিয়ে রাখতে হবে। (২) আমার বেডরুমে দৈনিক তিনবার খাবার দিয়ে আসতে হবে। (৩) আমার পড়া ও শয়নকক্ষ সবসময় পরিস্কার রাখতে হবে এবং পাঠ্যপুস্তকে কোন সময় হাত লাগাবেনা। (৪) তোমার থেকে আমার যাবতীয় দৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন থাকবে। তবে হ্যাঁ... লোকদেরকে দেখানোর জন্য আমি যখন তোমাকে আহবান করব, সাথে সাথে তুমি আমার ডাকে সাড়া দেবে। সন্তানদেরকে আমার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে তুলবেনা।

বার্লিনে চাচাত বোন ইলসা"র সাথে আইনষ্টাইনের সম্পর্ক গড়ে উঠে। কিন্তু আইনষ্টাইন বিপাকে পড়ে যায় যে, তাকে বিবাহ করবে নাকি তার যুবতী কন্যাকে। তার ধর্ম সম্পর্কে যতদূর জানা যায় যে, সে কট্টর ইহুদী; বরং ইহুদী ধর্মের দিকে আহবানকারী ছিল। সে ফিলিস্তিনে ইসরাইলী কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ পক্ষে ছিল। সে ১৯২১ সালে চীম ওয়াইজমেনের (ওয়াইজমেন ইসরাইলের প্রথম প্রেসিডেন্ট হয়েছিল) সাথে আমেরিকা ভ্রমণ করেছিল। ওখানে সে ইহুদী ধর্ম রক্ষার্থে মানুষের কাছ থেকে চাঁদা এবং বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা পর্যন্ত করেছিল। এমনকি ১৯৫২ সালে তাকে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য পর্যন্ত প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু সে গ্রহণ করেনি।

পারমাণবিক বোমা বানানোর পরিকল্পনা সেই সর্বপ্রথম আমেরিকাকে দিয়েছিল। ১৯৩৯ সালে সে তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রোজভেল্টের কাছে চিঠি লিখেছিল, যাতে স্পষ্টভাষায় সে আণবিক বোমা বানানোর জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সে পরোক্ষভাবে আমেরিকাকে সার্বিক সহযোগীতার পাশাপাশি একজন অস্ত্রবিশেষজ্ঞ হিসেবে মার্কিন নৌসেনাদেরকে সর্বপ্রকার পরামর্শ প্রদান করেছিল।

আইনষ্টাইনের খোদা...

তার কথায় বেশি বেশি ইংরেজী "গড" God শব্দের স্মরণ পাওয়া যায়। কিন্তু আপনি একথা ভাববেন না যে, "গড" বলতে সে আমাদের পরিচিত ধর্মীয় খোদাকেই উদ্দেশ্য করত! বরং আইনষ্টাইনের ব্যাপারে গবেষণাকারী সকল ব্যাক্তিবর্গ একথায় একমত যে, আইনষ্টাইনের খোদা ধর্মীয় খোদা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন খোদা হওয়ার বহুল প্রমাণ বিদ্যমান। সুতরাং আইনষ্টাইনের খোদা যদি ধর্মীয় খোদা না-ই হয়, তাহলে কে

তার খোদা ??!! এটিই চিন্তার বিষয় যে, কথায় কথায় সে "খোদা" বলে কোন খোদাকে উদ্দেশ্য করত। যদিও কতিপয় গবেষকদের দাবী- সে খোদা বলতে প্রকৃতি (Nature)কে উদ্দেশ্য করত। কিন্তু এটি সঠিক নয়।

এই স্থানে মুহাম্মদ ঈসা দাউদের মতামত যথেষ্ট ভারী অনুভূত হয় যে, হতে পারে- আইনষ্টাইন দাজ্জালকে খোদা হিসেবে মানত। তার লিখিত একটি রচনা-ও একথার প্রতিই ইঙ্গিত করে। তা হল- সে স্বীয় মতামতের ব্যাপারে "আমার মতামত" বলার বদলে "আমাদের মতামত" শব্দ ব্যবহার করত।

দাজ্জাল কর্তৃক কোন মানুষকে দিকনির্দেশনা দেয়ার বিষয়টি অবাক হওয়ার মত কিছু নয়। কেননা কুরআন-হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে একথা সাব্যস্ত যে, ইবলিস তার মানুষ বন্ধুদের কাছে আসে এবং তাদেরকে নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করে থাকে। আর দাজ্জালই হচ্ছে ইবলিসের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এবং আদমসন্তানদের বিরুদ্ধে তার সর্বশেষ ভরসা। বর্তমান যুগে যথারীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দল বিদ্যমান, যারা প্রকাশ্যে ইবলিস শয়তানের পূজা করে থাকে। দলটি আমেরিকা এবং ব্রিটেনে খুবই শক্তিশালী। তাদের মধ্যেও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ বিদ্যমান। সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একজন। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস-ও এদের সাথে সম্পৃক্ত। মার্কিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সংস্থা "হলিউডে"র বড় বড় প্রযোজক-পরিচালকদের উদ্দেশ্যও শয়তানকে সন্তুষ্ট করা। ভারতের প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র নায়ক অমিতাভ বচ্চন, মিসরের উমর শরীফ, প্রসিদ্ধ জাদুগর ডিয়োড কপার ফিল্ড এবং মার্কিন জনপ্রিয় পপশিল্পী মাইকেল জ্যাকসন শয়তানের পূজা করে থাকে। মাইকেল জ্যাকসনের প্রোগ্রামে লোকেরা অচেতন হয়ে যায়, আসলে শয়তান তাদের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ফেলে।

আমেরিকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যম কি তাহলে বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল ??

একটি কথা আপনি ভাল করেই বুঝে এসেছেন যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের ভেতরে যে "গোপন শক্তি" বিদ্যমান, তারা অত্যন্ত উন্নতশীল এবং বর্তমান পৃথিবীর অত্যাধুনিক প্রযুক্তি অপেক্ষা বহু শক্তিশালী। সুতরাং একটি কথা এখানে ভাল করে বুঝা দরকার যে, পৃথিবীর পরাশক্তি বিশেষত আমেরিকার হাতে বর্তমানে যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন অস্ত্র-সস্ত্র বিদ্যমান; তা বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের গোপন শক্তির কাছে বহুপূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকার কথা। তাহলে কি বর্তমান প্রযুক্তির মূল আবিস্কারক বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে অবস্থিত "গোপন শক্তি"??!! কথাটি অবশ্যই আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হবে। কিন্তু নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলো একটু চিন্তা করুন...

(১) ১৯০৮ সালের ৩০ জুন রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলের অত্যন্ত দূরবর্তী এক এলাকা Tunguska তে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে; বিশ্ববাসী এর আগে কখনো এমন ঘটনার কথা শুনেনি।

সকাল বেলা। ঘড়ির কাটা সাতটা বেজে পনের মিনিট দেখাচ্ছিল। চল্লিশ মেগাটনের কোন একটি অজানা পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠের আট কিলোমিটার উপরে শূন্যে বিস্ফোরিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে এক হাজার বর্গকিলোমিটারের বিশাল ময়দান সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। জঙ্গলে আগুন লেগে যায়। এক সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে আগুন জ্বলতে থাকে। ২১৫০ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত বিশাল জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বিশ বৎসর পর্যন্ত ওই এলাকা সম্পূর্ণ বাঞ্জার থাকে। এখন পর্যন্ত সেখানে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন স্পষ্টরূপে বিদ্যমান। রেক্টর স্কেলে ওই ধামাকার প্রচন্ডতা ৫.০ রেকর্ড করা হয়। বিস্ফোরণটি চল্লিশ মেগাটন (চল্লিশ লাখ টন) ভারী ছিল; যা জাপানের হিরোশিমায় ১৯৪৫ সালে বিস্ফোরণকৃত আণবিক বোমা অপেক্ষা দুই হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে যারা বহু দূর থেকে ধ্বংসযজ্ঞের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল- তাদের বর্ণনামতে-

"ওই দিন আবহাওয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পরিস্কার ছিল। আকাশে কোন মেঘ বা বৃষ্টির কোন নিদর্শন ছিলনা। তারা শূন্য থেকে প্রচন্ড জ্যোতিময় একটি বস্তু ভূপৃষ্ঠের দিকে আসতে দেখে। অতপর বিশাল

বিস্ফোরণ ঘটে। কতিপয় দর্শনকারীদের মতে- বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ পর ওখান থেকে ধোয়ার ন্যায় একটি বড় মেঘখন্ড আকাশে ওঠে। গরম অনুভূত হচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর প্রচন্ড গরম বাতাস চালিত হয়। মুহুর্তের মধ্যে এলাকাটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

টাংগসকা থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এলাকা "ভিনাবারা"য় ছোট একটি বসতি বিদ্যমান। ওখানকার লোকেরা বিস্ফোরণের আওয়াজে বহুদূরে গিয়ে পতিত হয়। বাড়ীঘরের খুটিগুলো ভেঙ্গে ছাদগুলো মাটির সাথে মিশে যায়। দুর্ঘটনা থেকে বহুমাইল দূরে "কান্সাক" নামক শহরে বিস্ফোরণের আওয়াজে চলতি ট্রেন পর্যন্ত অকেজো হয়ে যায়। কিছু মানুষ প্রচন্ড শব্দের দরুন বধির হয়ে যায়। বিস্ফোরণের পর খামবা(Mushroom)এর ন্যায় ধোয়া আকাশে উঠতে দেখা যায়, কিছুক্ষণ পর কালো বৃষ্টির বর্ষন হয়। ওই ঘটনার পরে ওই এলাকায় এবং সারা মধ্যএশিয়ার আকাশেই বহু জ্যোতিময় মেঘ প্রদর্শিত হয়। এমনকি লন্ডনেও রাত্রে (চন্দ্রীমা ছাড়া) আকাশ এত আলোকিত থাকত যে, ইচ্ছা করলে যে কেউই ওই আলোতে পুস্তক অধ্যয়ন করতে পারতো।

ওই সময় না এ ব্যাপারে কোন গবেষণা করা হয়েছিল, না আণবিক বিস্ফোরণের ব্যাপারে কেউ অবগত ছিল। একারণেই বিস্ফোরণটিকে পৃথিবীর সাথে শিহাব-পাথরের সংঘর্ষ বলে ব্যক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন রেডিয়াই টেষ্ট সম্পন্ন হয়, তখন প্রতীয়মান হয় যে, সেটি শিহাব-পাথর ছিলনা; বরং আণবিক বিস্ফোরণ ছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, এমন এক সময়- যখন পৃথিবীতে আণবিক বোমা আবিস্কারের পরিকল্পনাও করা হয়নি (আণবিক বোমা পরিক্ষা সর্বপ্রথম আমেরিকার পক্ষ থেকে ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই সম্পন্ন করা হয়), তাহলে এ বিশাল বিস্ফোরণ কার পক্ষ থেকে করা হয় ??

কতিপয় গবেষক বিস্ফোরণটিকে ফ্লাইং সোসার্স অধিকারীদের পক্ষ থেকে করা হয়েছে বলে মন্তব্য পেশ করে। কেউ কেউ ফ্লাইং সোসার্সের পৃথিবীর সাথে সংঘর্ষ বলে উল্লেখ করে। একটু চিন্তা করুন- যদি সেটি শিহাব-পাথর হতো, তাহলে তো ওখানে বিস্ফোরণের পর প্রচুর পরিমাণে ইউরেনিয়াম পাওয়া যেত। এমনটিই আশা করেছিলেন বিজ্ঞানী লিয়োন্ড এলেক্সোচ(Leonid Alekseyevich 1883-1942)। উনিই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানী; যিনি প্রথমবার ওই এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর এর কোন নিদর্শনও উনি খুজে পাননি। অথচ যদি শিহাব-পাথরের সংঘর্ষ হত, তবে অগণিত খনিজ বিষয়াদীও ওখানে পাওয়া যেতো। সবশেষে গবেষকদের কাছেও নতুন একটি প্রশ্নের সূত্রপাত হয়- "তাহলে বিস্ফোরণটি কিসের ছিল এবং কে করেছিল ????!!!!

সর্বসাধারণকে বুঝ দেয়ার জন্য মার্কিন বিজ্ঞানী ফ্রেড হোপেল ১৯৩০ সালে এই মতামত পেশ করে- "এটি ধূমকেতু (Comet) ছিল, যার ভেতরে শুধু বরফ থাকে। বুঝাই যায় যে, মতামতটি শুধু জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রচার করা হয়েছিল।

বারমুডা ট্রাইএঙ্গেল এবং ফ্লাইং সোসার্সের ব্যাপারে গবেষণাকারী প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী চার্লস ব্রিটলায শিহাব-পাথর বা ধূমকেতুর বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন।

(২) একশত বৎসর পূর্বে জিউলিস ওয়ার" তার গ্রন্থে "টাইলিস" নামক একটি সাবমেরিনের কথা উল্লেখ করেছিল। আর বর্তমান যুগেও রাসায়নিক সাবমেরিন হুবহু ওই আকারেই আমাদের সামনে বিদ্যমান। এমন একটি বিষয়; যার কল্পনাও পর্যন্ত তখন কোন মানুষের ব্রেইনে আসেনি, এমন কথা বলে দেয়া শুধুই কি ভবিষ্যদ্বাণী নাকি জিউলিসকে ইতিপূর্বে কেউ রাসায়নিক সাবমেরিনের ব্যাপারে অবগত করেছিল ??!! বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের সমুদ্রের অভ্যন্তরেও সাবমেরিন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির অজানা সব আরোহী অধিকাংশ সময় ঘুরাঘুরি করতে দেখা গেছে; যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পানির তলদেশে চলাচল করে থাকে। এদের চলার গতি এতই দ্রুত যে, আজ পর্যন্ত কোন মানুষ এর ফটো ক্যামেরাবন্দি করতে সক্ষম হয়নি।

(৩) এমনিভাবে একশত বৎসর পূর্বে একজন বিজ্ঞানী ফ্লোরিডার পূর্ব সমুদ্র উপকূল থেকে একটি মহাকাশযান চাদেঁর দিকে যেতে দেখেছে। এর ঠিক একশত বৎসর পর বাস্তবই মানুষ চাদেঁর দেশে ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়। বিজ্ঞানীদের মধ্যে শুধু চন্দ্রে যাওয়ার কথাই আলোচ্য ছিলনা; বরং একশত বৎসর পর কোন জায়গা থেকে আকাশের উদ্দেশ্যে মানুষ ভ্রমণ করতে শুরু করবে, এরও আলোচনা হয়েছিল। আর সেটা আবার ফ্লোরিডার পূর্ব সমুদ্র উপকূল! অর্থাৎ ওই খোদার শহর- যার অপেক্ষা করা হচ্ছে। এ সবই কি ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে ??!!

(৪) পারমাণবিক বোমা তৈরীর পূর্বেই মেকবক্সে এর ধ্বংসযজ্ঞের কথা বর্ণনা করা হয়েছিল; যা আজ আমাদের চোখের সামনে বিদ্যমান। এই সকল ব্যাপারকে আপনি কি বলবেন ?? ভবিষ্যদ্বাণী ?? নাকি সাইন্সফিকশান ??!! নাকি বলতে পারি যে, মার্কিন বিজ্ঞানীদের বহুপূর্বেই বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে অবস্থিত "গোপন শক্তি" এর সফল পরীক্ষা করেছে। আর আমেরিকা ও রাশিয়াকে তারাই এসকল বিষয়ে অবগত করিয়েছে।

(৫) আরেকটি বিষয় চিন্তা করুন- ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে মার্কিন সামুদ্রিক জাহাজ U.S.S Cyclops বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের পানিতে গায়েব হয়েছিল। (চিন্তা করুন- সাইক্লোপস কাকে বলে। গ্রীক ভাষায় সাইক্লোপস অর্থ হচ্ছে একচোখ বিশিষ্ট দেবতা। এই একচোখ ওয়ালা কে ?? মনে আছে আপনার ??) জাহাজটি প্রচুর পরিমাণে মেগনেশিয়াম সহ তিনশ ষাটজন কর্মচারী নিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। জাহাজের সাথে সকলেই গায়েব হয়। একই বৎসর সাইক্লোপ নামক আরেকটি ব্রিটিশ জাহাজ ওখানে গায়েব হয়। ১৯৪১ সালে পূণরায় সাইক্লোপসের ন্যায় আরো দু'টি জাহাজ ওখানে গায়েব হয়। এখন চিন্তার বিষয়- মার্কিন জঙ্গি বিমান বহন করার মত সৌভাগ্য সর্বপ্রথম যে জাহাজের হয়েছিল, তাও সাইক্লোপসের ন্যায় ছিল। বিমানবাহী রণতরী নির্মাতাগণ আমেরিকাকে এমনই এক গবেষণা পুরস্কার দিয়েছিল যে, ইতিপূর্বে এমন

গবেষণা পৃথিবীর কোন সামুদ্রিক গবেষণা টীম প্রত্যক্ষ করেনি। তাহলে কি একথা বলা যায় যে, সাইক্লোপসকে বারমুডায় এ উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হয় যে, ভবিষ্যৎ সামুদ্রিক দুনিয়ায় এ জাহাজগুলিকেই নতুনভাবে তৈরী করে মিত্রদের কাছে সোপর্দ করে দেয়া হবে।

(৬) বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের পানিতে বেশিরভাগ সময়ই সাবমেরিন প্রদর্শিত হওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, আমেরিকার পূর্বেই এ প্রযুক্তি বারমুডা অধিকারীদের কাছে বিদ্যমান ছিল।

(৭) বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলে যে সকল মানুষদেরকে গুম করা হয়েছে, তাদের অধিকাংশই ছিল যুগের সুদক্ষ ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ। যেমন, তখনকার সুদক্ষ পাইলট, পৃথিবীর প্রসিদ্ধ জাহাজ ক্যাপ্টেন, বড় বড় ব্যবসায়ী, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, প্রসিদ্ধ অত্যাধুনিক জাহাজ ও প্লেন, বারুদভর্তি ও পেট্রোলবাহী জাহাজ ইত্যাদি। তাহলে বুঝা যায় যে, এদেরকে গায়েব করার পর হত্যা করা হয়নি; বরং এদের যোগ্যতাগুলিকে নিজেদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এমনটিই দাবী করেছেন গায়েব হওয়া জনৈক পাইলটের স্ত্রী। তার বক্তব্য- গায়েবকৃত সকল ব্যক্তিবর্গই জীবিত রয়েছে। কিন্তু মার্কিন প্রশাসন কোন অজানা কারণে বিষয়টিকে গোপন রাখতে চায়।

তবে যারা এদের সহযোগীতা করতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে অবশ্যই মেরে ফেলা হয়েছে। পাশাপাশি যেসকল জাহাজ এবং প্লেন গুম করা হয়েছে, এগুলোও ধ্বংস করা হয়নি; বরং অজানা কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ, এরকম বহু রেকর্ড রয়েছে যে, বারমুডা ট্রাইএঙ্গেলের এরিয়ায় এমন জাহাজ এবং বিমান প্রত্যক্ষ করা গেছে, যার ব্যাপারে কারোরই কিছু জানা নেই যে, কোন দেশ থেকে এসেছে বা এগুলি কোন কোম্পানীর !!! এগুলো হচ্ছে ওই সকল জাহাজ এবং প্লেন, যা ইতিপূর্বে ওখানে গায়েব করা হয়েছিল। চার্লস ব্রিটলাযের মতামতও তাই যে, "অপরিচিত ব্যক্তিদের দিয়ে গায়েবকৃত ব্যক্তিবর্গকে এমন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে গায়েব করা হয়েছে; যা আমাদের জানা নেই।

(৮) যে সকল অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আমেরিকার হাতে আসে, কিছুকাল পর সেগুলি মার্কিন বিরোধীদের কাছেও পৌছে যায়। যেমন- আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ের কাছে। কিছুদিন পর চায়নাতেও তা তৈরী হতে শুরু করে। অথচ এ প্রযুক্তি মার্কিন বৈজ্ঞানিকদের বৈপ্লবিক সফলতা বলে গণনা করা হয়। যথা- মহাকাশ ভ্রমণ, চাদেঁর দেশে যাত্রা, আণবিক বোমা তৈরী এবং অত্যাধুনিক লেজার বীম প্রযুক্তি ইত্যাদি।

দরকার তো ছিল যে, এগুলো মার্কিন বিরোধি শক্তির হাতে পৌঁছবেনা। কিন্তু দেখা গেছে কিছুকাল পরই মার্কিন বিরোধীরাও এসকল বিষয়ে আমেরিকার সাথে পাল্লা দিতে শুরু করে। কিছু পার্থক্য দেখা যেতে পারে, কিন্তু মূল টেকনোলোজী অভিন্ন।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, আমেরিকাকে এসম্পর্কে যারা অবগত করে, তারাই অন্যান্য কুফরী শক্তিদেরকেও একই বিষয়ে অবগত করে থাকে।

"নাসা" NASA, গবেষণা ভ্রমণ ? নাকি কপি !

উপরোক্ত আলোচনা সামনে রেখে একথা বললে ভুল হবেনা যে, মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা "নাসা" গবেষণা করেনা; বরং কপি করে। যে টেকনোলোজী তাদের খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়, এগুলোই তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিখে নেয়। আপনি যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে (১৯৩৯-১৯৪৫) আবিস্কৃত সকল প্রযুক্তি নিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে বিস্ময়কর সব ব্যাপার আপনার জ্ঞানে ধরা পড়বে।

উল্লেখিত আলোচনা বুঝার পর এ বিষয়টিও আর বলার অপেক্ষা

রাখেনা যে, আমেরিকা এবং অন্যান্য কুফরী শক্তি বর্তমান সময়ে আরো কতইনা অত্যাধুনিক ও দ্রুতগামী জঙ্গি বিমান বানিয়ে ফেলেছে।
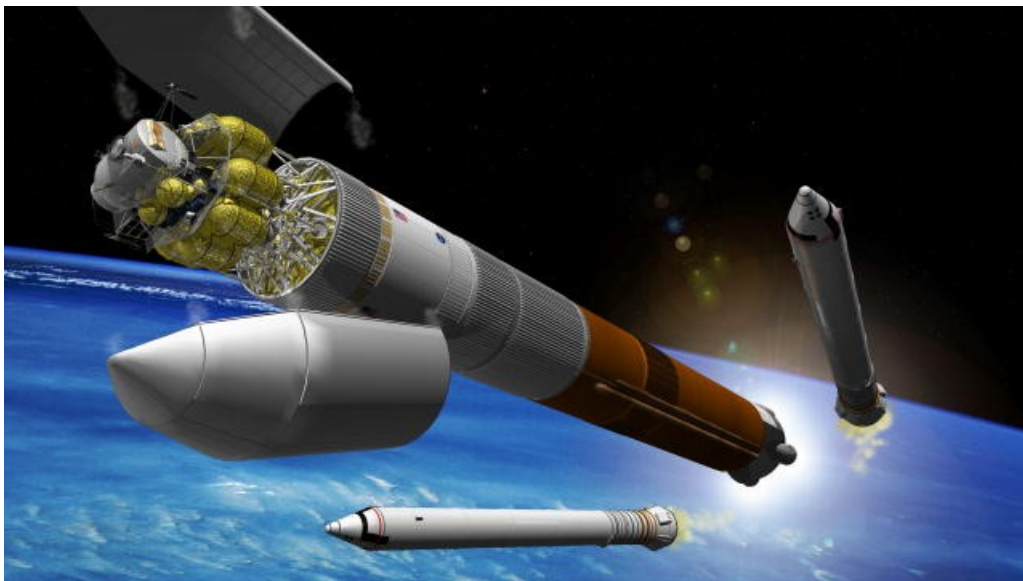
দ্বিতীয় অধ্যায়

দাজ্জালের ফেতনা

উপরোক্ত অধ্যায়ে আপনি এমন এক ফেতনা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন যা সমস্ত মানবতার জন্যই বিরাট হুমকি ও আশংকার বিষয়। আল্লাহ এবং তার রাসূল সা. এর দুশমন উম্মতে মুহাম্মদীকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষে সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। যাতে কেয়ামত দিবসে ইবলিস আল্লাহ তা'লার সামনে মুহাম্মদ সা.এর উম্মতকে ব্যর্থ বলে চিহ্নিত করতে পারে। এ গভীর চক্রান্তকে সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষে সে "কানা দাজ্জাল"(সমগ্র জগতের লা'নত তার উপর) কে প্রস্তুত করছে।

"কানা দাজ্জাল" অত্যন্ত গোপনে আত্মপ্রকাশের অনুমতির প্রহর গুনছে। পর্দার পেছনে থেকে সে সমগ্র পৃথিবীর শাসকদেরকে ঐ সকল লোকদের বিরুদ্ধে একত্রিত করছে, যারা ইমাম মাহদী আ.এর লস্করকে মজবুত করতে এখন থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একে একে একত্রিত হচ্ছে। হাদিসে নববীতে পরিস্কার ভাষায় উল্লেখ আছে যে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পূর্বেই হক্ব আর বাতিলের দলগুলো পৃথক পৃথক হয়ে যাবে। একদল দাজ্জালকে খোদা বলে স্বীকার করে নেবে। আরেকদল সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করে ইমাম মাহদী আ.এর সেনাদলে এসে শামিল হয়ে যাবে।

সুতরাং এখন থেকেই এরকম ফেতনা প্রকাশ হতে শুরু করেছে, যার মাধ্যমে ঈমানদার এবং মুনাফিক্বীন গ্রুপ পৃথক পৃথক হতে চলেছে। যার যেদিকে মন চাইছে, সেদিকেই বিনাদ্বিধায় চলে যাচ্ছে। সবাই নিজের ধ্যানধারণাকেই সত্য ও বাস্তব বলে বিশ্বাস করছে। যে সকল মুসলমান সর্বাবস্থায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে রব মেনে এর উপর অটল রয়েছে, আল্লাহ তা'লা ছাড়া কাউকে রব মানতে রাজী হয়নি এবং মুহাম্মদে আরাবী সা. এর আনীত দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে উঁচু করতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে দাজ্জাল বিশ্বময় যুদ্ধে ছড়িয়ে রেখেছে। এর মাধ্যমে সে জানার চেষ্টা করছে যে, কারা পরবর্তীতে তাকে খোদা বলে মেনে নেবে আর কারা তার মুখে থুথু মারবে। এ কারণেই আল্লাহর জন্য জান কুরবানকারী লোকদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে সে তার অনুসারীদেরকে নির্দেশনা দিচ্ছে যে, এমন লোকদের সাথে কোনরূপ আপোষ, সহানূভূতি বা কোন প্রকার নম্রতা অবলম্বন করলে চলবেনা।

সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের গভীর চিন্তা করা দরকার যে, সে কি মুহাম্মদে আরাবী সা. এর দুশমনদের কাতারে দাড়ানো ?? । কোন প্রকার মজবূরী, লোভ বা কারো ভয়ে ভীত হয়ে যদি কেউ রাসূলে আরাবী সা.কে কষ্ট দিয়ে থাকে, তাহলে সে যেন কাল হাশরের মাঠে সাহাবায়ে কেরামের মুকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকে; যারা শত্রুদের আঘাত সয়ে সয়ে নিজেদের শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছিলেন, তবুও রাসূলে আরাবী সা.কে বিন্দুমাত্র কষ্টে পড়তে দেননি।

ওহে মুসলমান ভাইয়েরা! ফেতনা সম্পর্কে অবগত হোন... এথেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন..!। অন্যথায় তা আপনাদের জান-মাল ও দ্বীন-ধর্মকে কেড়ে নিয়ে সর্বহারা করে ছাড়বে- এভাবে যে, আপনারা তা টেরও পাবেননা।

ফেতনা সম্পর্কে অবগত হোন... অন্যথায়...

قال حذيفة رضي الله عنه : كان الناس يسئلون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أسئله عن الشر مخافة أن يدركني. (رواه البخاري ومسلم)

অনুবাদ- হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- যে, মানুষেরা রাসূলে কারীম সা. এর কাছে মঙ্গলজনক বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করত। আর আমি অমঙ্গলজনক (ফেতনা) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম- এই ভয়ে যে, এ

অমঙ্গলজনক বিষয় (ফেতনা) যদি আমাকে ধরে ফেলে (আর আমি মনের অজান্তেই পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ি..)।

হযরত হুযায়ফা রা. আরো বলেন- এ ফেতনাসমূহ এমন লম্বা হয়ে যাবে, যেমন গাভীর জিহবা লম্বা হয়ে যায়। অধিকাংশ লোকই ফেতনায় পড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। শুধুমাত্র ঐ সকল লোকই এথেকে বাঁচতে সক্ষম হবে, যারা পূর্বে থেকেই ফেতনাসমূহ জেনে এথেকে দূরে থাকবে।(أحاديث حذيفة في الفتن:ج-1،ص-94،إسناده حسن موقوف)

عن عمير بن هاني العبسي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر الفتن ، فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنةَ الأحْلاسِ. فقال قائلٌ: وما فتنة الأحلاس ؟ قال: هي فتنة حربٍ وهرَبٍ ، ثم فتنة السَّرّاء ، دَخَنُها من تحتِ قدمي رجلٍ من أهل بيتي ، يزعم أنه مني ، وليس مني ، وإنما أوليائي المتقون ، ثم يصطلح الناس على رجلٍ كَوَرِكٍ على ضِلْعٍ ، ثم فتنة الدُّهَيْمَاء ، لاتَدَعُ أحَدًا من هذه الأمّة إلا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً ، فإذا قيل انقضتْ ، تمادتْ ، يُصبِحُ الرجلُ فيها مؤمناً ويمسي كافرًا ، حتى يَصِيرَ الناسُ إلى فُسطَاطَين: فُسطاط إيمانٍ لا نفاقَ فيه ، وفُسطَاط نفاقٍ لا إيمانَ فيه ، فإذا كان ذاكم ، فانتظروا الدّجّالَ من يومه أو من غده. (مسند أحمد:6168-أبوداود:4242-حاكم:8441-نعيم بن حماد في الفتن:92) وعدّ العلامة الألباني هذا الحديث في السلسلة الصحيحة-رقم:974

অনুবাদ- হযরত উমাইর বিন হানি থেকে বর্ণিত, যে, আমি আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. কে বলতে শুনেছি যে, একদা আমরা নবী করীম সা. এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। নবী করীম সা. ফেতনা সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করছিলেন। ফেতনার বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে করতে এক পর্যায়ে "ফেতনায়ে আহলাছ" সম্পর্কে বলতে লাগলেন। কেউ জিজ্ঞাস করল- হে আল্লাহর রাসূল! ফেতনায়ে আহলাছ কি ? রাসূল সা. বললেন- সেটা হচ্ছে মানুষের পলায়ন এবং ঘরবাড়ী ও মালসম্পদ লুটপাটের ফেতনা। এরপর হবে স্বচ্ছলতা ও বিলাসিতার ফেতনা। এর সূত্রপাত এমন এক ব্যক্তির পদনিচ থেকে হবে, যে মনে করবে- সে আমার আহলে বাইত (সৈয়দ বংশীয়)। কিন্তু সে আমার অধিনস্ত নয়; আমার অধিনস্ত হচ্ছে খোদাভীরুগণ। এরপর মানুষেরা অযোগ্য এক ব্যক্তিকে (প্রধান হিসেবে) মেনে নেবে। এরপর হবে অন্ধকার ফেতনা, উম্মতে মুহাম্মদীর কোন মানুষই এথেকে রক্ষা পাবেনা, সকলকেই থাপ্পড় মেরে যাবে। যখনই বলা হবে যে, ফেতনাটি খতম হয়ে গেছে, তখনই আরো বেড়ে যাবে। ঐ ফেতনার সময় মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, বিকালে কাফের হয়ে যাবে। শেষপর্যন্ত মানুষ দুইদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। (১) মুমিনের দল- যার মধ্যে বিন্দুমাত্র কপটতা থাকবেনা। (২) মুনাফিকের দল- যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান থাকবেনা। যখন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তখন তোমরা দাজ্জালের অপেক্ষা কর! ঐ দিন বা পরেরদিন।

হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, দাজ্জালের ফেতনার পূর্বে যে ফেতনাটি সৃষ্টি হবে, তা হবে "الدهيماء" তথা মারাত্মক অন্ধকার ফেতনা। এর বৈশিষ্ট হবে এই যে, ফেতনাটি সকলের ঘরেই প্রবেশ করবে। কোন ঘরই ফেতনা হতে রক্ষা পাবেনা। তাহলে দাজ্জালের পূর্বের যমানা বর্তমান যমানা তো নয় ?? (চিন্তার বিষয়) যদি নাই হয়; তবে এ অন্ধকার ফেতনা বলতে কোন ফেতনা উদ্দেশ্য ??!! যা সকল মুসলমানের ঘরে ঘরে পৌছে যাবে!! এটা কোন অন্ধকার ফেতনা ??!! যার মধ্যে উম্মতের সকলেই নিমজ্জিত!!

আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকেই সর্বপ্রকার ফেতনা থেকে হেফাজত করুন!! আমীন!

প্রসিদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ফেতনায়...

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, যে, (চতুর্থ নাম্বার ফেতনা বর্ণনা করতে গিয়ে) নবী করীম সা. বলেন- এর অনিষ্টতা থেকে তারাই বাঁচতে সক্ষম হবে, যারা নিমজ্জিত ব্যক্তিদের ন্যায় (একনিষ্ঠতা সহকারে)

দোয়া করে যাবে। এ ফেতনার মধ্যে সবচে' সৌভাগ্যশীল হবে ঐ ব্যক্তি, যে এথেকে গোপন থাকবে। আর সবচে' দুর্ভাগা হবে খতীবগণ (বড় বড় বক্তা) এবং যারা অগ্রে ভ্রমণ করে থাকে।

(الفتن: 363-رواه ابو نعيم في الحلية)

ফায়দা- অজানা অপরিচিত পরহেযগার লোক, যাদের কেউ চেনেনা, জানেনা। সামনে আসলেও পরিচয় নেই, পেছনে থাকলেও কারো কিছু যায় আসেনা, দূরে চলে গেলেও কেউ জিজ্ঞাসা করেনা যে, কোথায় গেল! কেন গেল!। আর অগ্রে ভ্রমণকারী লোক বলতে নেতৃস্থানীয় ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য। আপনি যদি চিন্তা করেন- তবে বর্তমান সময়ের অবস্থাও ঠিক তাই! যারা প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ -চায় আলেম হোক বা সাংবাদিক কলামিষ্ট- প্রতিটি বিষয়ে তাদেরকেই কেন্দ্রস্থলে রাখা হয়। লাল মসজিদ অপারেশান, ওয়াজিরিস্তানে মার্কিন জঙ্গি হামলা, জিহাদ ও ফেদায়ী কার্যক্রমগুলির বিরুদ্ধে ফতোয়া, বাতিলের যুদ্ধকে স্বীয় যুদ্ধ সাব্যস্ত করা- এ জাতিয় সকল পদক্ষেপে ঐ সকল ব্যক্তিদেরকেই আগে আনা হয়, যারা সর্বসাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়।

উপরোক্ত হাদীসে আরেকটি বিষয়; যা অত্যন্ত গভীরতার সাথে বর্তমান যুগের প্রতি ইঙ্গিত করছে। এ যুগে বাতিল শক্তিসমূহ চিন্তা গবেষণা করছে যে, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই তাদের দৃষ্টিসীমার আওতাভূক্ত হোক। কে কোথায় যাচ্ছে, কে কার সাথে আলাপ করছে, কি আলাপ করছে, কোন বংশের, কোন দেশের, কে কি পরিমাণ ধনসম্পত্তির মালিক, কার কি পছন্দ আর কি না পছন্দ ইত্যাদি। এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে তারা আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট ক্যামেরা, কম্পিউটারাইজড্ আইডি কার্ড (পরিচয়পত্র), অনলাইন ব্যংকিং, কম্পিউটারাইজড্ (ডিজিটাল) পাসপোর্ট, টাকা পয়সার বদলে ছোট ক্রেডিট কার্ডের প্রচলন এবং জাগায় জাগায় রাডার এবং সিকিউরিটি ক্যামেরা ফিট করছে। পরিস্কার ভাষায় বলতে গেলে তারা চায় যে, সারাটা পৃথিবী একটি চোখের সামনে অবস্থান করুক।

পারভেজ মুশাররফ পাকিস্তানে "নাদেরা" সিষ্টেম চালু করে পাকিস্তানের সকল নাগরিককে বিশ্ব ইহুদী সংগঠনগুলির সামনে সোপর্দ করে দিয়েছে। যে সকল ভাইয়েরা কম্পিউটার হ্যাকিংয়ের সুক্ষ্ম বিষয়াদী সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তারা বুঝেন যে, কোন বস্তু অনলাইনে চলে যাবার পর তা কতটুকু নিরাপদে থাকতে পারে। যেখানে সি,আই,এ' এবং "র" (RAW)এর পা-চাটা গোলামেরা এবং "ফ্রেমেসনে"র মেম্বারগণ আমাদের গোড়ায় গোড়ায় বসে আছেন। এহেন পরিস্থিতে "নাদেরা" কার্ডবিশিষ্ট ব্যক্তি কি করে অপরিচিত (নিরাপদে) থাকতে পারে।

"নাদেরা" সংস্থা পাম্প্রতিক সময়েই ইহুদী সংগঠনগুলোর ইশারায় এক নতুন প্রোগ্রাম শুরু করেছে, যাকে R,F বা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি বলা হয়। এই R,F সিষ্টেম প্রত্যেক আইডি কার্ডে বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং পাকিস্তানের আইডিভুক্ত সকল মানুষ সম্পর্কে ইহুদীদের সবসময় জানা থাকবে যে, লোকটি বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছে। একটু চিন্তা করুন! যে কোম্পানী এসকল কিছু মনিটরিংয়ের দায়িত্বে থাকবে, তা ইহুদী কোম্পানী। সুতরাং এই নাদেরা পদ্ধতি সবচে' বেশি দাজ্জাল ও তার এজেন্টদেরই কাজে আসবে। এখন তো আপনি চিন্তায় পড়ে যাবেন যে, তাহলে এখন উপায় ??!! উপায় একটাই- যা রাসূলে কারীম সা. এমন যুগের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন- "ফেতনার সময় সবচে' সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে তার ঘোড়ার লাগাম প্রস্তুত করে আল্লাহর দুশমনদের পেছনে লেগে থাকে। ইসলামের শত্রুদেরকে সর্বদা ভীত রাখে এবং শত্রুরাও তাকে ভয় দেখাতে থাকে অথবা (সৌভাগ্যবান) ঐ ব্যক্তি, যে তার ছোট্ট ঘরে বসে বসে আল্লাহ তা'লার হক্ব আদায় করতে থাকে (বাইরের খবরাখবর থেকে সে গাফেল থাকে)। (مستدرك حاكم)

পথভ্রষ্ট দুটি দুল...

عن حذيفة رضي الله عنه قال: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع ، وآخر ما تفقدون من دينكم

الصلاة ، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة ، وليصلين النساء وهن حيض ، ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل ، لا تخطئون طريقهم ولا يخطئنكم حتى فرقتان من فرق كثيرة ، فتقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس لقد ضل من كان قبلنا ، إنما قال الله تبارك وتعالى (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل) لا تصلوا إلا ثلاثا. وتقول الأخرى: إيمان المؤمنين بالله كإيمان الملائكة ، ما فينا كافر ولا منافق ، حق على الله أن يحشرهما مع الدجال. (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.(مستدرك حاكم، ج:4، ص:574)

অনুবাদ- হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে যা হারিয়ে বসবে তা হবে (নামাযের মধ্যে) একনিষ্ঠতা। আর সর্বশেষ যা তোমরা হারাবে তা হচ্ছে নামায। ইসলামের কড়িগুলো এক এক করে ভেঙ্গে যেতে থাকবে। এমনকি মহিলারা হায়েয (ঋতুস্রাব) অবস্থায় নামায পড়বে। তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী (লা'নতপ্রাপ্ত) জাতিদের হুবহু কদম-বকদম অনুসরণ করবে, তোমরা তাদের পথ ছাড়বেনা আর তারাও তোমাদের ছাড়বেনা। শেষপর্যন্ত মানুষ বহু দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। তন্মধ্যে দুটি দলের অবস্থা হবে এই- একদল বলবে: নামায পাঁচ ওয়াক্ত কোত্থেকে আসল; বরং আল্লাহ বলেছেন (তোমরা দিনের কিছু অংশে এবং রাতের একভাগে নামায আদায় কর) সুতরাং নামায তিন ওয়াক্ত পড়তে হবে। আরেকদল বলবে: মুমিনদের ঈমান ফেরেশ্তাদের ঈমানের ন্যায়; আমাদের মধ্যে কোন কাফের-মুনাফিক নেই। এই দু'দলকে অবশ্যই আল্লাহ তা'লা দাজ্জালের সাথে হাশর করাবেন।

হযরত হুযায়ফা ইবনুল য়ামান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে দু'টি জাহান্নামী দলকে ভাল করেই চিনি- একদল বলবে- আমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা পথভ্রষ্ট ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কি দরকার..! বরং নামায শুধু দুই ওয়াক্ত..! আসর এবং ফজর। আরেকদল বলবে: ঈমান তো হল মুখে (কালেমা) উচ্চারণ করার নাম; চায় কেউ যিনা করুক বা খুন করুক; তাতে কিছু যায় আসেনা। (মুস্তাদরাকে হাকিম-৮২৯৪, ইবনে আবী শাইবা-৩১০৫৪)

(ইমাম হাকিম রহ. বর্ণনাটি সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবী রহ.-ও উনার সাথে একমত পোষন করেন)

উপরোক্ত হাদিসদ্বয়ে দুটি পথভ্রষ্ট দলের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হয়েছে- একদলের বক্তব্য- পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরিবর্তে দুই ওয়াক্ত নামাযই যথেষ্ট। আর দ্বিতীয় দলের বিশ্বাস- ঈমান হচ্ছে শুধুমাত্র মুখে কালেমা পড়ার নাম। আমল যাই করুক, ঈমানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ কেউ যিনা করুক বা কাউকে হত্যা করুক বা অন্য কোন অপরাধে লিপ্ত হোক, এরদ্বারা ঈমানের মধ্যে কোনরূপ সমস্যার সৃষ্টি হয়না। বর্তমানে এই উভয় প্রকার দলই আমাদের সমাজে বিদ্যমান, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হচ্ছে, অপরকেউ পথভ্রষ্ট করছে। প্রসিদ্ধ টিভি চ্যানেলসমূহ এই পথভ্রষ্টতা প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পথভ্রষ্ট এ দলদুটিই প্রাচ্যের লোকদেরকে মুসলমানদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য করে তুলছে। ভাল করেই জেনে রাখুন- এ সমস্ত লোকেরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। সমস্ত মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট দল দুটি থেকে সদা সজাগ থাকা চাই।

দ্বিতীয় দলটির নিদর্শনও মুসলমানদের মধ্যে আস্তে আস্তে ভেসে উঠতে শুরু করেছে। মানুষের ধারণাও গুমরাহির দিকে ধাবিত হচ্ছে যে, মুসলমান যা চায় করুক, এরদ্বারা সে ঈমান থেকে বের হবেনা- যদিও সে এমন গুনাহে লিপ্ত হয়; যার মাধ্যমে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবার কথা পরিস্কারভাবে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। এ ব্যাপারে উম্মতের জ্ঞানীব্যক্তিবর্গ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, কোন কোন কাজে লিপ্ত হলে একজন মুসলমান ঈমানের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। পাশাপাশি এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল ফুকাহায়ে কেরামের ফতোয়াও বিদ্যমান। যেমন- মুসলমানদের মোকাবেলায় কাফেরদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদেরকে কোনরূপ সাহায্য সহযোগীতা করা, ইসলামের মৌলিক বিষয়াদী নিয়ে ঠাট্টা করা। এসব কাজে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মানুষেরা এদেরকে মুসলমানই মনে করে থাকে, যা মনচায় করুক; তাতে কিছু যায় আসেনা।

মিথ্যুক এবং অত্যাচারী শাসক...

عن حذيفة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون أمراء يَكذبون ويَظلمون ، فمن صدقهم بكذبهم ، وأعانهم على ظلمهم فليس منا ولست منهم ، ولا يَرِدُ علي الحوض ، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يُعِنْهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه ، وسَيَرِدُ على الحوض. (مسند أحمد: 23308)
قال المحقق شعيب أرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

অনুবাদ- হযরত হুযায়ফা রা. নবী করীম সা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সা. বলেছেন- ভবিষ্যতে এমন সব শাসক (দেশে দেশে) প্রতিষ্ঠিত হবে, যারা মিথ্যা কথা বলবে এবং অত্যাচার করবে। সুতরাং যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং অত্যাচারের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগীতা করবে, তারা আমাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভূক্ত নয়, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত নই এবং কাল কেয়ামতের দিন সে হাউযে কাউসারের ধারেকাছেও আসতে পারবেনা। পক্ষান্তরে যারা এদের মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবেনা, অত্যাচারে তাদেরকে সহযোগীতা করবেনা, সে আমাদের (মুসলমানদের) অন্তর্ভূক্ত, আমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত এবং হাউযে কাউসারেও সে আমার কাছে আসতে পারবে।"

হাদিসটি আমাদের গণতান্ত্রিক শাসকদের সাথে কতইনা মানানসই। হাজারো ইশতেহার বাস্তবায়ন করবে বলে প্রতিবার জনসাধারণকে মিথ্যা ধোকা দিয়ে নির্বাচনে বিজয়ী হয়। বিজয়ী হওয়ার পর পূর্বের সকল প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে অন্যায়ভাবে মানুষের টাকা-পয়সা খেয়ে দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়। এভাবে সে দুর্নীতির সর্বোচ্চ শিখড়ে আরোহন করে। জুলম-অত্যাচার-নির্যাতন তাদের নিত্যদিনের কার্যক্রম। দেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে সর্বসাধারণকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। জানপ্রাণ দিয়ে পার্টির সকল সিদ্ধান্তকে রক্ষা করে। সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে মানুষের মাঝে প্রচার করে। ঘরের দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার লাগিয়ে, রাস্তায় রাস্তায় হ্যান্ডবিল বিলি করে, সড়কের মুড়ে মুড়ে বক্তৃতার মঞ্চ তৈরী করে জুলুম, অত্যাচার ও অন্যায়-অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগীতা করে থাকে।

সুতরাং এরকম সহযোগীতায় যারা লিপ্ত আছেন বা ন্যুনতম ভোটের মাধ্যমেও যারা এসকল মিথ্যুক-অত্যাচারী শাসকদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, তারা যেন রাসূলে আরাবী সা. এর হুশিয়ারিমূলক কথাটি স্মরণ রাখেন "তারা আমার অন্তর্ভূক্ত নয়, আমিও তাদের অন্তর্ভূক্ত নই। কেয়ামতের দিবসে হাউযে কাউসারের পানিপান তো দূরের কথা; আমার কাছেও আসতে পারবেনা।" আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন!!!

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নেতা-ই মুনাফিক হবে...

عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قوم منافقوهم. (المعجم الأوسط،ج:4ص:355)

অনুবাদ- হযরত আবূ বাকরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না প্রত্যেক জাতিকে তাদের মুনাফিকেরা নেতৃত্ব দেবে।

রাসূলে কারীম সা. হাদিসটিতে স্বীয় উম্মতের সাধারণ মেযাজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, তাদের মধ্যে তো কাপুরুষতা, অলসতা এবং ঈমানী দুর্বলতা সৃষ্টিই হবেই। উপরন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মুনাফিক থাকায় কখনোই জনসাধারণের ঈমানকে তারা তাজা হতে দেবেনা।

আজ আমাদের সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের দিকে তাকালে এমনই গুনাগুণ দেখতে পাবেন। সমাজের চেয়ারম্যান, মেম্বার, শাসনকর্তা, নির্বাচিত সংসদ সদস্য যদি বাস্তবে মুনাফিক নাই হয়ে থাকে, তবে বাংলাদেশের মত গরীব রাষ্ট্রে নির্বাচনের পূর্বে এত কোটি কোটি টাকা খরচ করে তারা মানুষের সেবা করার লোভ করে কেন..??!! বিনা পয়সাতেও তো কেউ গরীব দুঃখী মানুষের সেবা করতে চায়না!! আর মুনাফিকের

প্রধান আলামত হচ্ছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। সুতরাং আপনারাই যাচাই করে দেখুন- নির্বাচনের পূর্বে মুখের বড় বড় বুলি দিয়ে, ইশতেহার প্রকাশ করে তারা জনগণের সামনে কতকিছু করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। মানুষের বাড়ীর দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দোয়া নিয়ে আসে। কিন্তু নির্বাচন জয়ী হয়ে গেলে পূর্বের সকল প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে নির্বাচনে খরচকৃত টাকা পুণরোদ্ধার, সামনের দিবসগুলির জন্য যথেষ্ট পুঞ্জি মজুদ এবং প্রত্যাশিত টার্গেট পূরণে মনোনিবেশ করে। আর আমাদের জনগণও কতইনা সরলমনা!! প্রতিবার নির্বাচনের সময় তারা জানে যে, প্রতিশ্রুতিগুলো ভুয়া, তারপরেও সাময়ীক কিছু টাকা অর্জনের আশায় দলাদলি করে তাদেরকে ভোট দিয়ে থাকে।

একদিকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে একে একে কাফেররা দখল করে নিচ্ছে। কোন মুসলমান এদেরকে প্রতিহত করার জন্য যদি কোণরূপ চেষ্টা করে, তবে তাকে জঙ্গি বলে জেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ পাকের প্রকাশ্য আয়াতকে অস্বীকার করে কাফেরদের সাথে হাত মিলিয়েছে। আল্লাহ তালা বলেন- “হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে। সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথপ্রর্শন করেননা।

রাসূলে কারীম সা.এর যুগে হাতেব ইবন আবি বালতা নামক এক ব্যক্তি পরিবারের রক্ষার জন্য ছোট্ট একটি চিঠি প্রেরণ করার ইচ্ছা করেছিলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আল্লাহ তালা কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে কঠোর নিষেধ করতঃ আয়াত নাযিল করেছিলেন। শুধুমাত্র একটি চিঠি প্রেরণ যদি বন্ধুত্বের নিদর্শন হয় এবং আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির উপকরণ হয়, তবে বর্তমানে শুধু চিঠি নয়; মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসকবর্গ প্রকাশ্যে কাফেরদের সাথে হাত মিলিয়ে বিভিন্নরকম চুক্তি সম্পাদন করে যাচ্ছে। গলায় গলা মিলিয়ে মুসলমানদের জমিগুলো তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। মুসলমানদের ভূমিতে তাদের জায়গা দিয়ে মুসলমানদের ঈমানকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলো আক্রান্ত হওয়া সত্তেও নিরীহ মুসলিমদের সাহায্য না করে শত্রুবাহিনীকে পূজা করা হচ্ছে। কাফেরদের কথামত উলামায়ে কেরামকে গ্রেফতার করে জেলখানাগুলো পূর্ণ করা হচ্ছে। সুদী কারবারীকে প্রতিটি ব্যাংকে চালু করে দিয়ে প্রকাশ্যে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এরপরও কি বলবেন- তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়নি। তাদের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট আছেন...!! স্মরণ করুন.. রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী- কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘটিত হবেনা, যতক্ষণ না প্রত্যেক জাতিকে তাদের মুনাফিকেরা নেতৃত্ব দেবে।

মুনাফিকদের ফেতনা...

হযরত আবূ ইয়াহয়া বলেন- হযরত হুযায়ফা রা.এর কাছে মুনাফিকদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় (মুনাফিক কারা ??) উত্তরে বলেন- যে ব্যক্তি ইসলামের প্রশংসা করে, কিন্তু এর উপর আমল করেনা।(مصنف ابن أبي شيبة،ج:15ص:115)

বর্তমান যুগ খুবই আশ্চর্য এক যুগ; মুনাফিকেরা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে মেনেও নিচ্ছেনা পাশাপাশি নিজেদেরকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ মুক্তও ঘোষনা করছেনা। বরং কথা বলার সময় ইসলামের প্রশংসা করতে করতে কয়েক ঘন্টা পার করে দেয়- ইসলামই সত্যিকারের জীবনব্যবস্থা, ইসলামই সফলতা ও মুক্তির একমাত্র পথ, ইসলামই একমাত্র সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম। কিন্তু যখনই নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আসে, তখন তারাই ইসলামী বিচারব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুখ খুলতে শুরু করে- "ইসলামের চৌদ্দশত বৎসরের পূরাতন জীবনব্যবস্থা অত্যাধুনিক কম্পিউটারের এই যুগে গ্রহনযোগ্য নয়"। কখনো কোথাও যদি কেহ আবূ বকর-উমরের ইসলামকে বাস্তবায়ন করে ফেলে, তাহলে দুনিয়ার সমস্ত অশালীন অনিষ্টকর বাক্য তার জন্য ব্যবহৃত হয়। "মৌলবাদী", "মতলববাজ", "ফতোয়াবাজ","সমাজবিরোধী","নারী নির্যাতনকারী", "মোল্লাদের ইসলাম প্রত্যাখ্যাত" ইত্যাদি সকল প্রকার বিশ্রি পরিভাষা এদের বরণ করতে হয়। তাদের এমন ইসলাম দরকার যা মনোচাহিদাগুলি পূরণ করে দেবে। তাদের কাছে সবচে' ঘৃণিত ইসলাম হচ্ছে- যা তাদের চোখের সামনে থেকে সমাজের মা বোনদেরকে পর্দার

আড়ালে লুকিয়ে রাখে।

তারা ঐ সকল লোক, যাদের শরীরের উপরের চামড়াটা ঠিকই মানুষের, কিন্তু অন্তরটা পশুর চরিত্র দিয়ে ঢাকা। হিংস্র ও মনপূজারী এ মুনাফিকেরাই তাদের লোভী চোখ দু'টিকে সান্তনা দেবার আশায় মা-বোনদেরকে ঘর থেকে বের হতে বাধ্য করেছে। তাদের বাসনা হচ্ছে যে, সবসময় সুন্দরী মহিলারা তাদের মন জুড়াতে থাকুক। এই হচ্ছে আমাদের মুসলমান...। ইসলাম নারীদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছে..., ইসলামই পরিপূর্ণ জীবনবিধান..., এগুলো হচ্ছে তাদের মুখের বুলি। অন্যথায় তাদের অবস্থাতো কুরআনে কারীমেই বর্ণিত হয়েছে

وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. (سورة النساء)

অর্থাৎ যখনই মুনাফিকদের বলা হয়- "এসো! আল্লাহর নাযিলকৃত হুকুম আহকামের দিকে। এসো! আল্লাহর রাসূলের আনীত জীবনব্যবস্থার দিকে। তখন আপনি দেখবেন যে, তারা আপনাকে কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে।" অন্য একস্থানে তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে-

بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين (سورة النساء)

অর্থাৎ হে নবী! আপনি মুনাফিকদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে। (তাদের পরিচয়)- তারা মুসলমানদের মোকাবেলায় কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে।

এতদসত্তেও মুনাফিকদের অবস্থা...

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون (سورة البقرة)

অর্থাৎ মুনাফিকেরা যখন ঈমানদারদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে- আমরা তো মুসলামান..। পক্ষান্তরে যখন তারা কাফের সরদারদের সাথে গোপনে সাক্ষাত করে, তখন বলে- আরে! আমরা তো তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো মুসলমানদের সাথে ঠাট্টা করি..।

وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين (سورة النساء)

অর্থাৎ যদি কখনো কাফেরদের বিজয় হয়ে যায়, তখন মুনাফিকরা তাদেরকে বলতে থাকে- আমরা (মুসলমানগণ) তোমাদের উপর তো বিজয়ী হয়েই গিয়েছিলাম (কিন্তু এরপরও আমরা তোমাদের সাহায্য করেছি) এবং আমরাই তোমাদের থেকে মুসলমানদের বাধা দিয়েছি। (মুনাফিকদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক)

চাঁপাবাজ মুনাফিকদের ফেতনা...

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أخْـوَفَ مـا أخـافُ على أمتي كلُّ منافقٍ عليمِ اللسان.(مسند أحمد، ج:1ص:22) قال المحقق شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন- যে, নবী করীম সা. বলেছেন- আমার উম্মতের উপর সবচে বেশি যে ফেতনাটি নিয়ে আমি শংকিত, তা হল প্রত্যেক চাঁপাবাজ মন্তব্যকারী মুনাফিকের ফেতনা।

সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণে দেখতে পাবেন, মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্ট করতে আজ প্রতিটি ক্ষেপে ক্ষেপে চাঁপাবাজ মুনাফিক বসে আছে। একজন থেকে অপরজন বেশি ফেতনাবাজ। কেউ আল্লাহর নাযিলকৃত

জীবনবিধান নিয়ে ছেড়াছেড়ি করছে, কেউ জিহাদকে সন্ত্রাস বলে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করছে, কেউ লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরলমনা লোকদের ধোকা দিচ্ছে আর কেউ রাসূলে আরাবী সা. এর আনীত শাসনব্যবস্থা ছেড়ে মডার্ন শাসনব্যবস্থার দিকে আহবান করছে।

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة منافق ، يقرأ القرآن لا يخطي فيه واوا ولا ألفا ، يجادل الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى ، وزلة عالم ، وأئمة مضلين. (صفة المنافق الفريابي ج:1ص:54)

অনুবাদ- হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন- তোমাদের মধ্যে সবচে' বেশি যে বিষয়টি নিয়ে আমি শংকিত, তা হচ্ছে- তিন প্রকার মুনাফিক। (১) ঐ মুনাফিক যে কুরআনে কারীম উত্তমরূপে পড়ে, এমনকি তাতে **واو، ألف** পর্যন্ত ভুল করেনা। সে মুসলমানদের সাথে (ধর্মীয় বিষয়ে) বাকবিতন্ডা করে, বুঝাতে চায় যে, সেই বেশি জ্ঞানী। এর দ্বারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (২) আলেমের পদস্খলন (ভুল ফতোয়া)। (৩) পথভ্রষ্টকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

হযরত যায়েদ বিন ওয়াহ্ব রহ. বলেন- একদা একজন মুনাফিকের মৃত্যু হলে হযরত হুযাইফা রা. তার জানাযার নামাযে শরীক হননি। তা দেখে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. জিজ্ঞাসা করলেন- ব্যক্তিটি কি মুনাফিক ? উত্তর দিলেন- হ্যাঁ..। এরপর উমর রা. জিজ্ঞাসা করলেন: -আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি- বলুন- আমিও কি এদের অন্তর্ভূক্ত ?? হুযাইফা রা. জবাব দিলেন- না। অতপর তিনি বললেন- এধরনের জবাব আপনার পর আর কাউকে আমি বলবনা। (ابن أبي شيبة:7\481) হাদিসের সনদ সহীহ।

নবী করীম সা. সমস্ত মুনাফিকের নাম হুযাইফা রা. এর কাছে বর্ণনা করে গিয়েছিলেন। মদীনার সকল মুনাফিককে উনি অক্ষরে অক্ষরে চিনতেন। একারণেই সাহাবায়ে কেরাম রা. উনাকে রাসূলে কারীম সা. এর "সি.আই.ডি" বলে জানতেন। বলতে পারেন যে, উনি মুসলমানদের ইন্টেলিজেন্স প্রধান ছিলেন। যেহেতু উমর রা.'র অন্তরে আখেরাতের ভয় বেশি ছিল, তাই তিনি প্রায়ই উনার কাছে এসকল প্রশ্ন করতেন।

একবার হযরত হাছান বসরী রহ. কে কেহ জিজ্ঞাসা করল- নেফাক কি আজও বিদ্যমান ? উত্তরে বললেন- বসরার অলিগলি থেকে যদি সকল মুনাফিক বের হয়ে যায়, তাহলে বসরা বিরানভূমিতে পরিণত হবে।(**صفة المنافق-جفعر بن محمد الفريابي**)

অন্য বর্ণনায়- "আল্লাহর শান! এই উম্মতকে কত মারাত্মক ধরনের মুনাফিক আক্রমন করছে, এমনকি তারা সমাজের অধিপতিও হতে চাইছে..!!"

মুআল্লা বিন যায়েদ বলেন- আমি হযরত হাছান বসরী রহ. কে এই মসজিদে আল্লাহর শপথ দিয়ে বলতে শুনেছি যে, "কোন মুমিন এমন অতিবাহিত হয়নি, যে নিজের সম্পর্কে নেফাকীর ভয় করেনি, আর কোন মুনাফিক এমন অতিবাহিত হয়নি, যে নিজেকে নেফাক থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ও নিরাপদ ভাবেনি"। তিনি আরো বলেন- "যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নেফাকীর ভয় না করে, সেই প্রকৃত মুনাফিক। (**صفة المنافق-جفعر بن محمد الفريابي**)

আইয়ূব রহ. বলেন- আমি হযরত হাছান বসরী রহ. কে বলতে শুনেছি যে, "কোন মুমিন ব্যক্তি এই পেরেশানী ব্যতিত সকাল-সন্ধ্যা যাপন করেনা যে, কখন নেফাকী আমার ভেতরে প্রবেশ করে যাবে আর আমি গুমরাহ হয়ে যাবো।"

একস্থানে কালের মানুষ নিরীক্ষা আর সাহাবায়ে কেরামের যামানা স্মরণে তিনি বলেন- "হায় আফসোস..! নিরাশার কালো ছায়া আর মনের সুধারণা মানুষকে পশুত্বে পরিণত করেছে। সর্বস্থানে শুধু মুখের বুলি; আমলের কোন নাম নেই। জ্ঞান আছে, (জ্ঞানের চাহিদা পূরনার্থে) ধৈর্য নেই। ঈমান আছে, বিশ্বাস নেই। মানুষ অনেক ভাসে, সঠিক বুঝ নেই। শুরগোল অনেক শুনা যায়, কারো প্রতিই মনের ভক্তি-শ্রদ্ধা উদয় হয়না।

মানুষ আসে আর যায়। তারা সবকিছু জেনেও প্রতারিত হয়েছে। তারাই প্রথমে একে হারাম বলেছে, পরে আবার হালাল বলে তা ব্যবহার করতে শুরু করেছে...। এই যদি হয় তোমাদের পরিচয়..., তবে তোমাদের ধর্ম কি ??!! মুখে অনেক রস... চাঁপা অনেক মারতে পারে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয়- তোমরা কাল হাশর বিশ্বাস কর ?? তখন বলে- হ্যাঁ... হ্যাঁ...! কেন করবনা...!!

জাহান্নামের দিকে আহবানকারী...

عن علي رضي الله قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم ، فذكرنا الدجال ، فاستيقظ مُحمَرًا وجهُه ، فقال: غير الدجال أخْوَفُ عندي عليكم من الدجال أئمة مضلون.(مصنف ابن أبي شيبة ، مسند أحمد ، مسند أبي يعلى)

অনুবাদ- হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, একদা আমরা নবী করীম সা. এর কাছে বসা ছিলাম। উনি ঘুমন্ত ছিলেন। আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলে নবীজী ঘুম থেকে উঠে পড়লেন। উনার চেহারা গোস্বায় লাল হয়ে গিয়েছিল। বলতে লাগলেন- দাজ্জাল থেকেও বড় একটি বিষয় নিয়ে আমি তোমাদের উপর শংকিত, সেটা হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী নেতৃবর্গ।

বুখারী শরীফের অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

دعاة على أبواب جهنم ، من أجابهم إليها قذفوه فيها ، قلت: يا رسول الله! صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا.

অর্থাৎ জাহান্নামের দরজার দিকে আহবানকারী কিছু লোক তৈরী হবে, যেই তাদের ডাকে সাড়ে দেবে, জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমরা বললাম- হে আল্লাহ রাসূল! তাদের কিছু পরিচয় বর্ণনা করুন। বললেন- তারা আমাদের থেকেই হবে এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে।

বাহ্যত তারা মুসলমান হবে এবং কথাবার্তাও বলবে দ্বীনের। কিন্তু ধর্মের নামে তারা মানুষকে গুমরাহ করবে। রাসূলে কারীম সা. নেতৃস্থানীয় লোকদের ফেতনাকে সবচে' ভয়ানক ফেতনা বলে চিহ্নিত করেছেন। বাস্তবেই সমাজের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ যদি ফেতনার দিকে আহবান করতে শুরু করে, তবে তা ভয়ানক আকার ধারন করবেই। ধর্মের নামে তারা জনসাধারণকে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। তাদের ধর্মীয় কর্মতৎপরতা বরং বাতিলকেই বেশি শক্তিশালী করছে। তাদের কথা, কলম এবং কার্যক্রম দাজ্জালের সৈন্যদের মদদ যোগাচ্ছে। বর্তমানে মুসলমানদের কত দল কত পার্টি বিদ্যমান; কিন্তু তারা সত্য থেকে ততটুকু দুরত্বে অবস্থান করে, যতটুকু পূর্ব থেকে পশ্চিম। আর সরলমনা জনসাধারণ দলে দলে তাদের পিছু পিছু জাহান্নামের দিকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। এদের অনুসারীরা অন্ধভক্তের ন্যায় তাদের সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিয়ে এলাকায় এলাকায় তা বাস্তবায়নে ব্রতী হচ্ছে। তাদের চোখে ঐ সকল "বস", "গডফাদার", "ম্যাডাম", "নেত্রী" আর "সভাপতি-সেক্রেটারী ছাড়া কিছুই ভাসেনা। উপর থেকে যে "ওয়াডার" আসবে- হক না বাতিল, সমাজের জন্য মঙ্গল না অমঙ্গল এসব কিছু না ভেবেই সেদিকে চলে যাবে। তারা যদি বলে- বিষয়টি হালাল, তবে হালাল। যদি বলে হারাম, হারাম। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, আল্লাহ তা'লাকে ভুলে গিয়ে তারা ঐ সকল নেতানেত্রীকে প্রভু প্রভূ বলে মেনে নিয়েছে।

মানুষকে প্রভু বানিয়ো না...

হযরত আদী ইবনে হাতিম তাই রা. বলেন- আমি রাসূলে কারীম সা. এর দরবারে উপস্থিত হলাম। আমার গলায় স্বর্ণের একটি ক্রোশ ঝুলানো ছিল। তখন নবী করীম সা. আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন- হে আদী! গলায় ঝুলানো ঐ মূর্তিটি ফেলে দাও। নবী করীম সা. কে এ-ও বলতে শুনেছি যে, (তিনি সূরায়ে

বারাআতের নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন-

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

"খৃষ্টানেরা আল্লাহকে ছেড়ে আলেম ও পাদ্রী (ধর্মীয় গুরু)দেরকে প্রভূ বানিয়ে ফেলেছিলো।" তারা ঐ সকল পাদ্রী ও ধর্মীয় প্রধানদেরকে পূজা করতনা, বরং তারা যদি কোন বিষয় হালাল বলত, তবে তারা তা হালাল বলে ব্যবহার শুরু করত। পক্ষান্তরে যদি কিছুকে হারাম বলত, হারাম বলে মেনে নিত।

(رواه الترمذي:3095 ، وحسنه الألباني)

বর্তমান মুসলমানদের অবস্থাও তাই...। লোকেরা প্রধানদেরকে প্রভূ মেনে বসে আছে। কোন কিছু হালাল বললে তা হালাল হয়ে যায়- যদিও আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন একে হারাম বলে উল্লেখ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রা., মুফাছছিরীন, মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরামের যিন্দেগীও এর সাক্ষী হয়ে আছে। পক্ষান্তরে যদি কোন বস্তুকে হারাম বলে দেয়, তবে একে হারাম মানতে শুরু করে অথবা কমছেকম তাদের কর্মের মাধ্যমে তাই সাব্যস্ত করে। অথচ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বিষয়টিকে প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা.এর জন্য হালাল করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্তের জন্য এটাকেই উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই রোগটি সমাজে এতই ব্যাপক যে, আপনি যদি কুরআনে কারীম থেকেও স্পষ্ট আয়াত তাদেরকে শুনান, তারপরও সে তা এজন্যই মানতে রাজী নয়; কারণ তার "বসে"র আদেশ এর বিপরীত। তাদের কাছে ওই ব্যাপারটাই শরীয়ততুল্য; যা পীর নিজে অনুসরণ করছে। তাই কোনপ্রকার চিন্তাভাবনা ছাড়াই সে বলে দেয়- "শরিয়ত যদি এতই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়, তাহলে আমাদের পীর তো সবার আগেই এর উপর আমল করত..!! আপনি কি আমাদের পীর থেকেও বেশি বুঝেন নাকি..??!!

ওহে মুসলমান ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এই ধর্মকে রাসূলে আরাবী সা. এর উপর কোন প্রকার সন্দেহ বা অস্পষ্টতা রেখে নাযিল করেননি। বরং তা সূর্যের আলো অপেক্ষা অধিকতর জ্যোতিময়, চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের চেয়েও বেশি উজ্জল এবং আমাদের অস্তিত্বের চাইতেও বেশি বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে একে আল্লাহ পূর্ণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের ঐ ধর্মই পছন্দ; যা তিনি চৌদ্দশত বছর পূর্বে তাঁর প্রিয় হাবীব রাসূলে আরাবী সা. এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম রা. বুকের তাজা রক্ত দিয়ে পৃথিবীর বুকে তা প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, মুফাছছিরীন, মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কেরাম স্বীয় যিন্দেগীকে এর জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। উম্মতের ঐ সকল মহামনীষী দ্বীনকে সঠিকরূপে পৌছে দেবার লক্ষে খুনের সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন। যুগের প্রতাপশালী শাসকবর্গের মুখে লাথি মেরে তাদের উচিৎ শিক্ষা দিয়েছিলেন। কখনো দরসে বসে...আর কখনো ঘোড়ার পিঠে চড়ে...। নিজের সকল আশা-আকাঙ্খা এই দ্বীনের জন্য কুরবান করে দিয়েছিলেন। তারা আমাদের মত ছিলেননা যে, দুনিয়াও কামাই হবে আর দ্বীনও না ছুটবে। তারা তাদের রবের কাছে শুধুই আখেরাত কামনা করেছিলেন এবং জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জান-মালকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

এ সকল ত্যাগ-তিতীক্ষা আর কুরবানীর বিনিময়ে আজো আমাদের পর্যন্ত এ মহান ধর্ম সঠিকরূপে পৌছেছে। দুনিয়াতে যত বড় জ্ঞানীই পয়দা হোক; কখনো সে আল্লাহর হালালকৃত বিষয়গুলি হারাম করতে পারবেনা। আর যাকে আল্লাহ তা'লা হারাম করেছেন, তা হালাল বানাতে পারবেনা। কোন জামাতের আমীর, শায়েখ বা কোন বুযুর্গের এ অধিকার নেই যে, সে নবী করীম সা. এর আনীত ধর্মকে পরিবর্তন করে নিজের চাহিদামত ঢেলে সাজিয়ে নেবে, চায় সে যত বড়ই বাহাদুর বা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী ব্যক্তি হয়। এমন অহংকারী ফেরাউন এবং নিজেকে খোদা বলে দাবীকারীদেরকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য যুগে যুগে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন হক্কের জন্য সর্বস্ব ত্যাগকারী তৈরী করেছেন, যারা নিজেদের জান বাজী রেখে এই মহান দ্বীনকে আসল চেহারায় বাকী রেখেছে। তারা আল্লাহর হালালকৃত বিষয়গুলি হালাল এবং হারাম বিষয়গুলিকে হারাম সাব্যস্ত করেই ছেড়েছে- যদিও এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পৃথিবীর সকল মানুষের সঙ্গে তাদের লড়াই করতে

হয়েছে, কাটা ঘায়ে নূন ছেটানোর মত কথা শুনতে হয়েছে। সমস্ত কলমশক্তি ও মৌখিক শক্তি এদের বিরুদ্ধে চতুর্দিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হয়নি। পূর্ববর্তী উলামায়ে হক তাদেরকে যা শিখিয়ে গেছেন, তারা তাতেই অটল রয়েছে। বরং তাদের পূর্বের উলামায়ে হক তো তাদেরকে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তরে রক্ত ঝরায়ে স্বীয় ছাত্র ও মুরীদদেরকে সামনের দিকে চলার সাহস যুগিয়েছেন।

সুতরাং মুসলমানদেরকে মনপূজা ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে মনযোগ দিতে হবে এবং এমন হক্বপন্থীদের সাথে সম্পর্ক কায়েম করতে হবে, যাদের কথা ও কাজ কোন সময় এদিক সেদিক হয়না, যারা নিজেদের পূজার দিকে নয়- বরং আল্লাহর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহবান করে থাকে। দুনিয়ার ঘোর অন্ধকার থেকে বের করে আখেরাতের উজ্জল স্থায়ী সফলতার দিকে নিয়ে যায়। সন্দেহের গর্ত থেকে বের করে বিশ্বাসের উপত্যকায় নিয়ে যায়। আল্লাহকে ছাড়া পৃথিবীর কোন পরাশক্তিকেই ভয় করেনা। বাতিলকে বাতিল বলে স্বীকৃত দেয়ার সাহস বুকে লালন করে, এরকম হক্বপন্থী উলামাগণই আল্লাহ তা'লার কাছে বেশি পছন্দের। যারাই তাদেরকে পছন্দ করবে, আল্লাহ তা'লাও তাদেরকে পছন্দ করবেন।

আজকাল প্রত্যেক জামাতই স্বীয় আলেমদেরকে হক্বপন্থী আর অন্যান্য আলেমদেরকে উলামায়ে ছু' (বাতিলপন্থী) বলে দাবী করে। আসুন- ইমাম গাযালী রহ. এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "إحياء علوم الدين"এর কিছু অংশ পড়ে নেই, যাতে বুঝে নিতে পারি যে, কোন বিশেষ জামাতের আমীর হলেই বা কোন বড় আলেম-শায়েখের ছাহেবযাদা হলেই উলামায়ে হকের মধ্যে শুমার হবেনা। বরং প্রত্যেকের নিজস্ব আমলই ফায়সালা করে দেবে যে, সে কি উলামায়ে হক্ব (আখেরাতকামী) ?! নাকি উলামায়ে ছু' (দুনিয়ালোভী)।

ইমাম গাযালী রহ. এর দৃষ্টিতে দুই প্রকার আলেমের পার্থক্য :-

রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- "মানুষের মধ্যে নবীদের সবচে নিকটবর্তী স্তরে অবস্থান করবে উলামায়ে কেরাম এবং দ্বীনের জন্য লড়াইকারী মুজাহিদীন। উলামায়ে কেরাম তাদের জ্ঞানের মাধ্যমে লোকদেরকে সৎপথের দিকে আহবান করেন। পক্ষান্তরে মুজাহিদীন তাদের তরবারীর মাধ্যমে দ্বীন রক্ষায় জিহাদে লিপ্ত থাকেন। নবীদের কাজও ছিল দু'টি- সত্য দ্বীনকে মানুষের মাঝে প্রচার করা এবং কুফরী শক্তিকে পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া।

নবী করীম সা. এরশাদ করেন- "জ্ঞানীদের কলমের কালি কেয়ামতের দিন শহীদের রক্তের সাথে উজন করা হবে"।

অপর হাদিসে বলেন- "আমার উম্মতের দু'টি দল যদি সত্যের উপর অটল থাকে, তবে সকল মানুষ ঠিক থাকবে। তারা যদি খারাপ হয়ে যায়, সবাই খারাপ হয়ে যাবে। তারা হচ্ছে- আমার উম্মতের শাসক ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ।"

অপর হাদিসে নবী করীম সা. বলেন- "কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন সকল মানুষকে পূণর্জীবিত করে উলামাদের উদ্দেশ্যে বলবেন- হে আলেম সম্প্রদায়! তোমাদেরকে আমি এজন্য এলেম দান করিনি যে, তোমাদের শাস্তি দেবো। যাও! আজকে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। (সুসংবাদটি উলামায়ে হক্ব তথা সত্যপন্থী আলেমদের ব্যাপারে)

হযরত উছামা বিন যায়েদ রা. বলেন- আমি নবী করীম সা. কে বলতে শুনেছি- কেয়ামতের দিন একজন আলেমকে হিসাব-কিতাব শেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। শাস্তির প্রচন্ডতায় নাড়ীভূড়ী তার বাইরে বেরিয়ে আসবে। সে এমনভাবে দৌড়তে থাকবে, যেমন গাধা লাকড়ী নিয়ে দৌড়তে থাকে। তার এ অবস্থা দেখে অন্যান্য জাহান্নামীরা প্রশ্ন করবে- এই অবস্থা কেন ?? উত্তরে সে বলবে- দুনিয়াতে আমি অপরকে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিতাম; অথচ আমি নিজেই তার মধ্যে লিপ্ত থাকতাম। ভাল কাজের উৎসাহ দিতাম; আর নিজে ভাল কাজ থেকে বিরত থাকতাম।

ইমাম গাযালী রহ. বলেন- আলেমদের অন্যায়ের দরুন কেয়ামতের দিন তারা দুই গুণ বেশি শাস্তি ভোগ করবে; কারণ তারা জানাসত্তেও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছে। একারণেই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলেন- "অবশ্যই মুনাফিকেরা জাহান্নামের সর্বনিচ স্তরে অবস্থান করবে"। কেননা তারা জানার পরেও অস্বীকার করেছে। ইহুদীদেরকে আল্লাহ পাক খৃষ্টানদের থেকেও বেশি নিকৃষ্ট বলেছেন- কারণ- ইহুদীরা একথা বলেনাই যে, আল্লাহ হচ্ছেন তিনজনের একজন। বরং তারা সত্যকে ভাল করে জানার পরও তা অস্বীকার করেছে। তাই আল্লাহ তা'লা বলেন-

يعرفونه كما يعرفون أبنائهم

অর্থাৎ ইহুদীরা মুহাম্মদ সা. কে (সত্য নবী হওয়ার ব্যাপারে) এমনভাবে চেনে, যেমনভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চেনে। আল্লাহ ত'লা বলেন-

فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين

"অতপর যখন তাদের কাছে পরিচিত সত্য আসল, তখন অস্বীকার করল। সুতরাং অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর লা'নত।"

নিঃসন্দেহে আলেমদের মধ্যে সফল এবং আল্লাহর নিকটবর্তী তারাই; যারা সদা আখেরাতের ফিকির নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এমন আলেমদের কিছু নিদর্শন রয়েছে :-

আখেরাতঅন্বেষী আলেমগণ তাদের এলেমের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনে ব্যস্ত হবেনা। কেননা সর্বনিম্নস্তরের আলেমও দুনিয়ার তুচ্ছতা, অনিষ্টতা এবং ভরসাহীনতার কথা অন্তরে সৃষ্টি করে ফেলেছে। পাশাপাশি আখেরাতের উচ্চস্তরসমূহ, চিরস্থায়ী যিন্দেগীর স্থায়ী মালিকানা এবং নেয়ামতের গুরুত্ব তার অন্তরে বসিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে, দুনিয়া এবং আখেরাত দু'টি পৃথক পৃথক বিষয়, দু'টিকে কখনোই একত্রিত করা সম্ভব নয়। যখনই দু'টি থেকে কোন একটিকে সন্তুষ্ট করা হবে, অপরটি তখন অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। দাড়িপাল্লার দুটি অংশের ন্যায়, যখনই একটি ভারী হবে, অপরটি হালকা হয়ে যাবে। আখেরাতঅন্বেষী আলেম একথা বিশ্বাস করবে যে, দুনিয়া ও আখেরাতের দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের ন্যায়- যখনই একটির কাছে যাওয়া হবে, দ্বিতীয়টি দূরে চলে যাবে। দুটি পাল্লার মত- যখনই একটিকে পূর্ণ করতে থাকবে, দ্বিতীয়টি খালী হতে থাকবে। সুতরাং যেসকল আলেম দুনিয়ার নিকৃষ্টতা এবং কষ্টের পার্থক্য বুঝতে পারেনা, তারা "ফাসিদুল আকল" তথা বোধশক্তিহীন। কেননা, অভিজ্ঞতা এরই সাক্ষী দেয়।

সুতরাং ঐ সকল লোক আলেমদের মধ্যে কি করে শুমার হবে- যাদের ভেতরে বোধশক্তি পর্যন্ত নেই। আখেরাতের যিন্দেগীকে বড় এবং স্থায়ী মনে করেনা। বাস্তবে তারা তো কাফের, তাদের এলেমকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। ঐ ব্যক্তি কি করে আলেমদের মধ্যে গণ্য হবে- যার ভেতরে কোন ঈমানই বিদ্যমান নেই। যারা এ-ও অনুধাবন করতে পারেনা যে, দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের বিপরীত বিষয়। দুনিয়া এবং আখেরাতকে একসাথে জমা করার প্রচেষ্টা অপূরণযোগ্য এক ব্যর্থপ্রয়াস। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়টিই অর্জন করতে চায়, সে সমস্ত নবী-রাসূলের শরীয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ মুর্খ। বরং সে ৩০ পারা কোরআনকে অস্বীকারকারী। এমন ব্যক্তিদের কি করে আলেমদের মধ্যে গন্য করা হবে!! যে আলেম এসকল বিষয়কে ভাল করে বুঝা সত্তেও দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে প্রাধান্য না দেয়। বুঝা যাবে- সে শয়তানের কাছে বন্দি। তার ভেতরে থাকা পশুত্বের চরিত্রগুলো তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং দুর্ভাগ্য তার উপর প্রাধান্য পেয়েছে। এমন ব্যক্তিবর্গ উলামাদের কাতারে কি করে শরীক হবে ??!!

হযরত দাউদ আ. সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত যে, আল্লাহ তা'লা বলেন- যখন কোন আলেম আমার মহব্বতের পরিবর্তে তার মনোবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয়, তখন কমছেকম আমি তাকে এই শাস্তি দেই যে, এবাদতের মধুরতা থেকে তাকে বঞ্চিত করে দেই। হে দাউদ! আমার কাছে এমন আলেমদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিওনা! যাদেরকে দুনিয়ার যিন্দেগী কাবু করে ফেলেছে। এমন আলেমই আমার মহব্বত থেকে

তোমাকে বাধা প্রদান করবে। এসকল লোক আমার বান্দাদের জন্য ডাকাতস্বরূপ। হে দাউদ! যখন তুমি এমন আলেমকে দেখো যে, সে আমাকে পেতে চায়, (আমাকে রাজীখুশি করার জন্য সে সকল কার্য সম্পাদন করে), তুমি তার খাদেম হয়ে যাও।"

হাছান রহ. বলেন- উলামাদের শাস্তি হচ্ছে অন্তর মরে যাওয়া। অন্তর মরে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে আখেরাতের আমলের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষন করা।" হযরত ইয়াহয়া বিন মুআয রা. বলেন- যখন থেকেই জ্ঞান ও হেকমতের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষন শুরু হয়েছে, তখন থেকেই জ্ঞানের সম্মান উঠে যেতে শুরু করেছে।

হযরত উমর রা. বলেন- যদি তুমি কোন আলেমের মধ্যে দুনিয়ার মহব্বত গালেব দেখো, তখন তাকে দ্বীনের ব্যাপারে তুহমত দিও। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি ওই কাজেই লিপ্ত হয়, যার প্রতি তার ভালবাসা থাকে।

হযরত ইয়াহয়া বিন মুআয রা. দুনিয়াদার আলেমের উদ্দেশ্যে বলেন-

يا أصحاب العلم! قصوركم قيصرية ، وبيوتكم كسروية ، وأثوابكم ظاهرية ، وأخفافكم جالوتية ، ومراكبكم قارونية ، وأوانيكم فرعونية ، ومآثكم جاهلية ، ومذاهبكم شيطانية ، فأين الشريعة المحمدية ؟؟!!

হে জ্ঞানের বাহকগণ! তোমাদের প্রাসাদগুলো রুমের বাদশাদের প্রাসাদগুলোর মত। তোমাদের ঘরগুলো পারস্যের বাদশাদের ঘরগুলোর মত। তোমাদের পোশাক প্রকাশ্য (অহংকারী) লোকদের পোশাকের মত। তোমাদের পায়ের জুতা (মৌজা) জালূতী লোকদের জুতার মত। তোমাদের আরোহনগুলি কারুনের লোকদের সোয়ারীর মত। তোমাদের খাদ্যপাত্রগুলো ফেরআউনী লোকদের খাদ্যপাত্রের মত। তোমাদের অপরাধসমূহ অন্ধকার যুগের অপরাধের মত এবং তোমাদের মাযহাব শয়তানী মাযহাবের মত। তাহলে শরীয়তে মুহাম্মদীয়া কোথায় গেল...??!!

হযরত আবূ হুরায়রা রা. বলেন- যে ব্যক্তি এলেম অন্বেষন করল দুনিয়া অর্জনের আশায়। কেয়ামতের দিন সে জান্নাতের (কাছে তো দূরের কথা!) গন্ধও পাবেনা।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন উলামায়ে ছু'দের নিদর্শন বলেছেন- স্বীয় এলেমের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনে ব্রতী হওয়া। আর উলামায়ে হক্কের নিদর্শন বলেছেন- আল্লাহর জন্য সকল কর্মে একনিষ্ঠতা প্রদর্শন এবং দুনিয়া থেকে বিমুখ থাকা।

দুনিয়া অন্বেষী আলেম(উলামায়ে ছু')দের ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা বলেন-

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا.

অর্থাৎ ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'লা কিতাব প্রদানকৃত (ইহুদী-খৃষ্টান)দের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা মানুষের কাছে কিতাবের প্রতিটি আয়াতকে সঠিকভাবে বর্ণনা করবে, কোন আয়াতকে গোপন রাখবেনা। অতপর তারা কিতাবকে পেছনে নিক্ষেপ করেছিল (যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করেনি) এবং স্বল্প লাভের আশায় বিধানগুলোকে বিক্রি করে দিয়েছিল।

আর আখেরাত অন্বেষী আলেমদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'লা বলেন-

وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ، أولائك لهم أجرهم عند ربهم.

অনুবাদ- আহলে কিতাব(ইহুদী-খৃষ্টান)দের থেকে অনেক লোক এমন রয়েছে- যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজীখুশী করার জন্য তোমাদের এবং তাদের উপর নাযিলকৃত

বিষয়গুলোকে সত্য বলে জানে। তারা দুনিয়ার তুচ্ছ লাভের আশায় আল্লাহর আয়াতগুলিকে বিক্রি করে দেয়না। তাদের জন্য তাদের প্রভুর কাছে যথাযথ পুরস্কার প্রস্তুত রয়েছে।

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত- নবী করীম সা. এরশাদ করেন- তোমরা সকল প্রকার আলেমদের মজলিসে বসবেনা। শুধুমাত্র ঐ সকল আলেমদের মজলিসে বসবে, যারা পাঁচটি বিষয় থেকে সরিয়ে তোমাদেরকে অপর পাঁচটি বিষয়ের দিকে আহবান করে:-

(১) সন্দেহের অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের আলোর দিকে।

(২) রিয়া তথা লোকদেখানো আমল ছেড়ে এখলাছ তথা একনিষ্ঠতার দিকে।

(৩) দুনিয়ার লোভ লালসা ছেড়ে খোদাভীতির দিকে।

(৪) অহংকার-বড়ত্ব ছেড়ে নম্রতা অবলম্বনের দিকে।

(৫) শত্রুতা ছেড়ে মিমাংসা স্থাপনের দিকে।

(হাদিসটিকে আবূ নুআইম রহ. আল-হুলিয়্যা'তে এবং ইবনে জাওযী রহ. "মওযুআতে" বর্ণনা করেছেন)

হযরত মাকহুল রহ. আব্দুর রহমান বিন গানাম রা. থেকে বর্ণনা করেন- রাসূলে কারীম সা. এর দশজন সাহাবা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমরা 'মসজিদে কূবা'য় এলেম অন্বেষনে ছিলাম। নবী করীম সা. আমাদের কাছে আসলেন এবং বলতে লাগলেন- "যা শিক্ষা করার- কর, কিন্তু আল্লাহ তা'লা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে এর ছওয়াব দিবেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এর উপর আমল না কর।"

আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আ. বলেন- যে ব্যক্তি এলেম অন্বেষন করে এর উপর আমল না করে, তার দৃষ্টান্ত ঐ মহিলার ন্যায়- যে গোপনে যিনা করে গর্ভবতী হয়ে যায়। অতপর গর্ভ প্রকাশের ফলে সে মানুষের মাঝে লাঞ্ছিত অপদস্থ হয়। ঠিক তেমনি যে এলেম অন্বেষন করে এর উপর আমল না করে। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কেয়ামতের দিন সমস্ত মাখলূকাতের সামনে তাকে অপদস্থ করবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাছউদ রা. বলেন- যখনই আলেমদের অন্তর দুনিয়ার দিকে ধাবিত হয়ে যাবে, দুনিয়াকে আখেরাতের বিপরীতে প্রাধান্য দিতে শুরু করবে। তখন আল্লাহ পাক তার থেকে হেকমতের ঝর্ণাগুলোকে বন্ধ করে দেবেন এবং অন্তর থেকে হেদায়েতের প্রদীপ নিভিয়ে দেবেন।

হযরত কা'ব রহ. বলেন- শেষ যমানায় এমন সব আলেম তৈরী হবে, যারা দুনিয়া থেকে বিমুখ হওয়ার শিক্ষা দেবে, অথচ তারা নিজেরাই দুনিয়ার প্রাচুর্যে নিমজ্জিত থাকবে। মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখাবে, কিন্তু নিজে আল্লাহকে ভয় করবেনা। সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের আশেপাশে না যাওয়ার জন্য মানুষকে হেদায়েত করবে, কিন্তু সে নিজে ওদের আশেপাশে ঘুরবে এবং দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেবে। নিজেদের মুখের (চাঁপার) কামাই খাবে। গরীবদের ছেড়ে ধনীদেরকে কাছে টানবে। এলেম নিয়ে এমনভাবে গর্ববোধ করবে, যেমনভাবে পুরুষগণ মহিলাদের উপর গর্ববোধ করে থাকে। তার সম-মর্যাদার লোক যদি অন্য কেহর কাছে বসে, তখন তার গোস্বা উদয় হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাছউদ রা. বলেন- এলেম বেশি বেশি বয়ান করার নাম নয়; বরং এলেম হচ্ছে অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হওয়ার নাম।

إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه.

الباب السادس في آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء

---***---

হক্বপন্থী আলেম ও বাতিলপন্থী আলেমের ব্যাপারে ইমাম গাযালী রহ. এর বিস্তারিত বিশ্লেষন পড়ার পর প্রত্যেককেই ভাল করে চিন্তা করা দরকার যে, সে কার পেছনে দৌড়াচ্ছে!! দুনিয়ার পেছনে ?? না আখেরাতের পেছনে!! জান্নাতের উচুঁ উচুঁ অট্রালিকা এবং নেয়ামতরাজীর দিকে ?? নাকি জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির দিকে!! পাশাপাশি হক্বপন্থী আলেমদের গীবত বা তাদের সমালোচনা করা থেকেও সমস্ত মুসলমানদের বেঁচে থাকতে হবে। তারা আল্লাহর খাটিঁ বন্ধু। আর আল্লাহ তা'লা তার বন্ধুদের মন্দচারী অবশ্যই পছন্দ করবেননা।

টেলিভিশনের প্রতি মানুষের মনযোগ এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আজকাল প্রত্যেক বস্তুই সে টিভিতে তালাশ করতে চায়। হক্বপন্থী আলেমদের ব্যাপারেও তাদের ধারনা অনুরূপ। মনে করে- যে সকল আলেম টিভিতে সংবাদের ভিত্তিতে প্রসিদ্ধি লাভ করে, তারাই হক্বপন্থী আলেম। পক্ষান্তরে যারা মিডিয়া থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে- তাদের কোন গণনা-ই নেই। যখনই আপনি জনসাধারণের মুখে শুনবেন- "মৌলভী এমন এমন করে..., তার ছেলেকে আমেরিকান স্কুলে পড়ায়...।" তখন অবশ্যই তাদের যেহেনে এমন সব আলেমই উদ্দেশ্য হয়। এদেরকে সামনে রেখে তারা সকল উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে মন্দচারী শুরু করে দেয়। তাই ভাল করেই চিন্তা করা দরকার যে, প্রত্যেক প্রসিদ্ধ আলেমের জন্যই জরুরী নয় যে, সে হক্বপন্থী আলেমদের থেকেই হবে।

অযোগ্য নেতৃত্ব... কেয়ামতের নিদর্শন

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- যখন আমানতের খেয়ানত করা শুরু হবে, তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর। বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেন- আমানতের খেয়ানত বলতে কি উদ্দেশ্য ?? উত্তরে বলেন- যখনই অযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে নেতৃত্ব সোপর্দ করা হবে, তখনই কেয়ামতের অপেক্ষা কর।" (আবু উমর দানী-৩৮১) ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনাটি কিতাবুর রিকাক'এ এনেছেন)

বর্তমান যুগে এর তাজা দৃষ্টান্ত চারপাশে দৃশ্যমান। অযোগ্য ব্যক্তিদের নেতৃত্ব পূরো ইসলামী বিশ্বকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। কোন পদের জন্যই আজ যোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন পড়েনা, শুধুমাত্র কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ছাহেবযাদা (পুত্র) হলেই চলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ এখানেই সমাপ্ত। সামনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দাজ্জালের ব্যাপারে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ্।

---***---

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের নিদর্শনাবলী

স্মরণ রাখা দরকার যে, এখানে ঐ হাদিসগুলোর পুনরোল্লেখ হবেনা, যেগুলো লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল"-এ উলেখ হয়েছে। দাজ্জালের ব্যাপারে শুধু ওই সকল বিশ্লেষণই এখানে করা হবে, যা দ্বিতীয় গ্রন্থে করা হয়নি। সুতরাং এ ব্যাপারে যদি কেউ আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণের আগ্রহী হোন, তবে "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল" গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন।

রাসূলে কারীম সা. কেয়ামত পর্যন্ত সকল ফেতনার ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন। আমরা কোন যুগের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছি, বর্তমান যুগে দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা অর্জনের জন্য কিরকম পদক্ষেপ নেয়া দরকার, নিকট ভবিষ্যতে কোন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে ইত্যাদি বিষয়গুলি যতক্ষন পর্যন্ত আমরা রাসূলে আরাবী সা. এর হাদিসের মধ্য দিয়ে তালাশ না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দাজ্জালী মিডিয়ার ছড়ানো অন্ধকার ফেতনা থেকে বের হতে সক্ষম হবনা। এভাবে একের পর এক গভীর অন্ধকার ফেতনার মধ্যে ঢুকতে থাকব।

সংবাদগুলো যে ধাচেঁ মিডিয়াতে প্রচার করা হয়, সমাজের উল্লেখযোগ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ঐ ধাঁচেই তাদের মতামত পেশ করতে থাকে। মিডিয়াজগত কন্ট্রোলকারী ইহুদী ষড়যন্ত্রকারীরা যে দিকেই তাদের নিয়ে যেতে চাইছে, সেদিকেই তারা দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

রাসূলে আরাবী সা. এর হাদিসের উপর আমল ছেড়ে দেয়ার দরুন এ উম্মতের যে দশা হয়েছে, তা সকলেরই জানা। সুতরাং হক্ব ও বাতিলের মধ্যকার এ যুদ্ধে আমরা যদি নিজেদেরকে, পরিবারকে এবং দেশবাসীকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে হাদিসে নববীর আলোকে বর্তমান পরিস্থিতি যাচাই করতে হবে। তদানুযায়ী এখন থেকেই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরিস্থিতিগুলো কি ?? রাসূলে আরাবী সা. এ ব্যাপারে কি বর্ণনা করে গেছেন?? এহেন পরিস্থিতিতে কি কি পদক্ষেপ নেয়ার এবং কোন কোন বস্তু থেকে বেঁচে থাকার আদেশ করেছেন!! এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল হাদিসগুলো সামনে রেখে প্রতিটি মুসলমানকে এখন থেকেই আমল শুরু করা দরকার। নিজের ঘরে আমল শুরু করুন! বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনকে এ বিষয়ে অবগত করুন! এভাবে ইনশাআল্লাহ চালিয়ে যান..। আল্লাহ তা'লা অবশ্যই আপনার মেহনতে বরকত দান করবেন। আল্লাহ তা'লা সকল মুসলমানকে ফেতনাসমূহ থেকে রক্ষা করুন!! আমীন!!

দাজ্জালের পূর্বে যুদ্ধের কাতারবন্দি...

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- একদা আমরা রাসূলে কারীম সা. এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। উনি দাজ্জালের বর্ণনা দিচ্ছিলেন :- "তোমাদের মধ্যে সৃষ্ট কতিপয় ফেতনা দাজ্জালের ফেতনা অপেক্ষা মারাত্মক হবে। ফেতনা ছোট হোক বা বড় হোক; দাজ্জালের ফেতনা পর্যন্ত গিয়েই তা ক্ষান্ত হবে। সুতরাং পূর্বেথেকেই যারা ফেতনা সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেদের কে গুটিয়ে নেবে, তারাই দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচতে সক্ষম হবে। আল্লাহর শপথ! দাজ্জাল মুসলমানদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। তার দুই চোখের মাঝখানে "কাফের" (আরবী ভাষায়) লেখা থাকবে। (চিন্তার কোন কারণ নেই- মুমিনদের মধ্যে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তা বুঝতে পারবে)(أحاديث في الفتن والحوادث، ج:1ص:256)

উপরোক্ত হাদিস এবং সামনের হাদিস দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পূর্বেই মুমিনদের দল এবং মুনাফিকদের দল পরস্পরে বিভক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ দাজ্জালের পূর্বেই সকলকে এ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে হবে যে, সে কি মুহাম্মদে আরাবী সা. এর লস্করে শামিল হবে ?? নাকি দাজ্জালের

জোটবদ্ধ সেনাদলের ইন্ধন হবে।

গতবৎসর আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা "সিআইএ" মার্কিন সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে যে, এ ভয়ানক যুদ্ধে এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণরূপে বুঝা যাচ্ছেনা- কারা আমাদের সাথে আছে আর কারা আমাদের শত্রুদের সাথে। সুতরাং এরকম পলিসি তৈরী করা দরকার; যাতে উভয় দলের লোকেরাই স্পষ্ট হয়ে যায়।

তাই আশপাশ তাকালে আপনি দেখবেন যে, বর্তমানে এরকমই পলিসি (সংবিধান) তৈরী করা হচ্ছে এবং খুব দ্রুত কাতারগুলি চিহ্নিত হতে শুরু করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ বিভক্তি অব্যাহত থাকবে।

প্রত্যেক মুসলমানকে একটি কথা স্মরণ রাখা চাই যে, কেয়ামতের দিন সে মুহাম্মদের আরাবী সা. এর সামনে সে কোন অবস্থায় যেতে চায়। ইমাম মাহদী আ.এর সাথে হাশরে উঠতে চায়?! নাকি তার দুশমনদের সাথে!! দাজ্জালের সাথে হাশরে উঠতে চায়?! নাকি ঐ জামাতের সাথে; যার ব্যাপারে সত্যনবী মুহাম্মদে আরাবী সা. ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন- "আমার উম্মতের একটি দল কেয়ামত পর্যন্ত সত্যের উপর অটল থাকবে, বিরুদ্ধবাদীর বিরুদ্ধাচারণ তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। এদের সর্বশেষ দলই দাজ্জালকে হত্যা করবে।" হক্বপন্থীগণ হক্বের উপর অটল রয়েছেন, হক্বকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ময়দানের দিকে পাড়ি জমাচ্ছেন এবং দাজ্জালের অগ্রসৈনিক (Advanced Force)দের সাথে লড়াই করে তাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে চলেছেন।

হে ঘুমন্ত মুসলমান ভাইয়েরা! নিজের ব্যাপারে এখনই সিদ্ধান্ত নাও! ভাল করে চেয়ে দেখো- ছফর কোন দিকে জারী রয়েছে! তোমাদের মুখের কথা কাদের সহযোগীতা যোগাচ্ছে! তোমাদের কলম কোন দলকে শক্তিশালী করছে! তোমাদের মাল কোন পথে ব্যয় হচ্ছে! মনে রেখো! দুই নৌকায় একসাথে কখনো পা রাখা সম্ভব নয়। যে কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। এমনটি কখনো সম্ভব নয় যে, আল্লাহর লস্করেও শরীক থাকবে পাশাপাশি দাজ্জালের জোটবদ্ধ সৈন্যরাও অসন্তুষ্ট হবেনা। যদি তোমাদের পায়ের মাধ্যমে বিশ্বদাজ্জালী শক্তি অসন্তুষ্ট না হয়, তবে নিজেদের পদসমূহ নিয়ে ভাবো যে, এটা কেমন হক্ব, যার মাধ্যমে বাতিল শক্তির কোন ক্ষতি হয়না। এটা কেমন সত্য, যদ্দারা দাজ্জালের দাজ্জালীতে কোনরূপ শিহরণ পড়েনা। বস্তুত হক্বের শান তো হচ্ছে যে, তা শুনা মাত্রই বাতিল শক্তি ভয়ে চিৎকার দিয়ে উঠবে, যদিও এই আওয়াজ পাহাড়ের গর্ত থেকে বের হয়।

মিম্বর ও মেহরাব থেকে দাজ্জালের আলোচনা বন্ধ হয়ে যাওয়া...

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لايخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. (رواه عبدالله ابن الإمام أحمد،قال الهيثمي: هي صحيحة)

অনুবাদ- রাসূলে কারীম সা. এরশাদ করেন- দাজ্জাল ততক্ষণ পর্যন্ত বের হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকেরা তার থেকে গাফেল না হয়ে যাবে। এমনকি মসজিদের খতবীগণ পর্যন্ত মিম্বরের মধ্যে তার আলোচনা ছেড়ে দেবে।

ধূমকেতু (Comet) প্রকাশ হওয়া...

ইবনে আবি মুলাইকা রহ. বলেন- একদিন সকালে আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন- গতকাল সারারাত আমি ঘুমাতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করলাম- কেন ? উত্তরে বললেন- লেজবিশিষ্ট তারকা (ধূমকেতু) উদয় হয়েছিল, আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, দাজ্জাল প্রকাশ হয়ে গেছে। (মুস্তাদরাকে হাকিম:৮৪১৯)

(ইমাম হাকিম রহ. বর্ণনাটিকে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ.-ও এ

ব্যাপারে একমত পোষন করেছেন)

লেজবিশিষ্ট তারকা' (ধূমকেতু) কে ইংরেজীতে Comet বলে। তারকাটির পেছন দিক থেকে আলো ফুটতে থাকে, যা দর্শকদের চোখে লেজের মত ভাসতে থাকে। প্রসিদ্ধ মহাকাশ বিজ্ঞানীগণ একে "হেলি" বলে নাম দিয়েছেন; যা ব্রিটিশ বিজ্ঞানী Edmond Halley এর নামের দিকে সম্বোদন করে রাখা হয়েছে।

প্রথমবার ১৯৮৬ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৯৬ সালের ২৫ মার্চ ধূমকেতু রাতের আকাশে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে। এর বয়স বলা হয় দশ হাজার বৎসর। ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসেও তা প্রত্যক্ষ করা গেছে বলে জানা যায়। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা "নাসা"র বিজ্ঞানীগণ তারকাটিতে বিদ্যমান রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। মহাকাশ যানকে সফলভাবে এতে অবতরণ করাতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী- তারকাটিকে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান।

ঝর্ণা এবং নদীগুলো শুকিয়ে যাবে...

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قـال: للـدجال آيـات معلومـات: إذا غـارت العيـون، ونزفت الأنهار، واصفر الريحان ، وانتقلت مذحج وهمدان من العراق فنزلت قنسـرين ، فـانتظروا الـدجال غاديا أو رائحا. هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجـاه ، ووافقـه الـذهبي. (مسـتدرك حـاكم:ج:4ص:

অনুবাদ- হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রা. বলেন- দাজ্জাল প্রকাশের সুনির্ধারিত কিছু নিদর্শন রয়েছে :- "যখন ঝর্ণাসমূহের (বা যমিনের অভ্যন্তরের) পানি নিচে চলে যাবে। নদীগুলো থেকে পানি উঠিয়ে তা শুকিয়ে ফেলা হবে। ঘাস (লতাপাতা) হলুদ হয়ে যাবে। মাযহাজ ও হামাদান গোত্র ইরাক থেকে সরে যাবে। অতপর কুনসিরীনগণ তাতে অবতরণ করবে। তখন তোমরা দাজ্জালের অপেক্ষা কর- ঐ দিন সকালে বা বিকালে।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ আনসারীয়া রা. বলেন- নবী করীম সা. আমার ঘরে প্রায়ই তাশরীফ আনতেন। একদিন দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-তার আত্মপ্রকাশের পূর্বে তিনটি বৎসর এমন হবে- "প্রথম বৎসর আসমান একতৃতীয়াংশ বৃষ্টি উঠিয়ে নেবে এবং যমিনও একতৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেবে। দ্বিতীয় বৎসর আসমান দুইতৃতীয়াংশ বৃষ্টি উঠিয়ে নেবে এবং যমিনও দুইতৃতীয়াংশ ফসল বন্ধ করে দেবে। তৃতীয় বৎসর আসমান সম্পূর্ণ বৃষ্টি বন্ধ করে দেবে এবং যমিনও সম্পূর্ণ ফসল বন্ধ করে দেবে। ফলে সকল প্রকার প্রানী এবং গাছপালা-তরুলতা ধ্বংস হয়ে যাবে। (رواه احمد في المسند 1317-الفتن)

ফুরাত নদী শুকিয়ে যাবে...

হযরত হুযায়ফা ইবনুল য়ামান রা. বলেন- ঐ সময় তোমাদের কি অবস্থা হবে, যখন কুফা (ইরাকের একটি শহর) বাসীদেরকে দেখবে যে, তারা ওখান থেকে বের হয়ে যাচ্ছে বা বের করে দেয়া হচ্ছে। ফুরাত নদী থেকে এক ফুটা পানিও তারা পান করতে পারবেনা। তা শুনার পর একব্যক্তি বলল- হে আবু আব্দিল্লাহ (হুযায়ফা রা. এর উপনাম)! আপনি কি তাই মনে করেন ? উত্তরে বললেন- শুধু মনে করিনা; বরং এ সম্পর্কে আমার দৃঢ় জ্ঞানও রয়েছে।

(হাদিসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, হাফেয যাহাবী রহ. ও তাই মনে করেন) (مستدرك حاكم،ج:4ص:549)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ রা. বলেন- খুব নিকটবর্তী সে সময়- যখন তোমরা ঐ গ্রামে বসবাসরত অবস্থায় হাত ধোয়ার জন্য পানি চাইবে, কিন্তু তোমাদের পানি মিলবেনা। সমস্ত পানিই যে পথ দিয়ে এসেছিল সে পথ দিয়ে চলে যাবে। তখন অবশিষ্ট মুসলমান এবং পানি শুধু শামে (সিরিয়ায়) থাকবে। (مستدرك حاكم،ج:4ص:549)

(হাকিম রহ. হাদিসটি সহীহ বলেছেন, ইমাম যাহাবী রহ.ও একমত পোষন করেছেন)

ফুরাত নদীর উপর তুরস্ক তেরটি "বাঁধ" স্থাপন করেছে, যারমধ্যে সবচে' বড় "বাঁধ" হচ্ছে 'আতাতুর্ক বাঁধ", যা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বাঁধসমূহের অন্যতম। একে ভরাট করার জন্য ফুরাত নদী থেকে সম্পূর্ণ একমাস পানি ঢালতে হবে। ফলে শাম ও ইরাকের পানি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। পরিস্থিতি শুধু ইরাক আর শামের জন্যই হুমকিস্বরূপ নয়; ব্যাপারটি অন্যান্য উপসাগরীয় দেশের জন্যও মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করবে। তুরস্কে পানিকে রাজনৈতিক কারণে অপচয় করা হয়। বরং বাস্তবতা হচ্ছে- ইসরায়েলকে সন্তুষ্ট করার জন্য তুরস্কের বিধর্মী সরকার এমনটি করে আসছে। উল্লেখ্য, এসবকিছুই দাজ্জালের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানেও ইরাকের ফুরাত নদীতে খুব অল্প পানি অবশিষ্ট আছে। আজকাল সাধারণত ওখানে দুই/তিন মিটার পানি থাকে।

হযরত আরতাত্ রা. বলেন- দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের নিকটতম নিদর্শনাবলীর একটি হচ্ছে- পূর্ব দিক থেকে বাতাস আসবে, যা গরমও হবেনা এবং বেশি ঠান্ডাও হবেনা। বাতাসটি ইসকান্দারিয়ার মূর্তিকে মাটিতে ফেলে দেবে, মরক্কো ও শামের যাইতূন বৃক্ষগুলো কেটে দেবে, ফুরাতনদী ও ঝর্ণা-নহরগুলো শুকিয়ে

দেবে। যারফলে মানুষ দিন-মাসের গণনা ও চন্দ্রের নির্ধারিত সময় ভুলে যাবে। (ص:314،عن الحكم بن نافع عن جراح عن أرطاة)

(মুহাক্কিক আহমদ বিন শুয়াইব বর্ণাটিকে لا بأس به এর স্তরের বলেছেন)

উপরোক্ত বর্ণনায় স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে যে, দাজ্জাল প্রকাশকালে বিশ্বময় পানিশূন্যতা সৃষ্টি করা হবে, বৃষ্টি কমে যাবে এবং যে বৎসর দাজ্জাল বের হবে সে বৎসর সম্পূর্ণ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে। শেষ বর্ণনায় যে বাতাসের কথা উল্লেখ হয়েছে, তার মাধ্যমে ঝর্ণা, নদী-নালা এবং পুকুরগুলো শুকিয়ে যাবে। মুসলিম বিশ্বের বড় বড় ঝর্ণাগুলো শুকিয়ে দেবার জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পক্ষ থেকে কার্যক্রম চালু রয়েছে। ছারহাদ প্রদেশ এবং কাশ্মীরের পাহাড়ী এলাকাগুলোর মধ্যে তা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। যে সকল ঝর্ণার উপর ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের স্পন্সরে ট্যাংকি বসানো হয়েছে, সবগুলোকে অল্পসময়ের মধ্যে শুকিয়ে যেতে দেখা গেছে। পক্ষান্তরে স্থানীয় লোকদের খরচে স্থানীয়ভাবে যে ঝর্ণাগুলোর মধ্যে ট্যাংকি বসানো হয়েছে, সেগুলোর অবস্থা অনেকগুণে ভাল রয়েছে।

ঋতুর পরিবর্তন...

قال مالك: سمعت عمرو بن سعيد ابن أخي حسن شيخ قديم من أهل اليمن ، يقول: من علامة قرب الساعة اشتداد حر الأرض.(رواه أبو عمرو الداني:429)

অর্থাৎ- কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে- যমিনের উষ্ণতা (তাপমাত্রা) বেড়ে যাওয়া।

পৃথিবীর উষ্ণতা বা তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার অনুভূতি বর্তমান বিশ্বের সকলেই অনুধাবন করতে পারছেন। ফলে এন্টার্কটিকায় বরফের পাহাড় গলতে শুরু করেছে। ইহুদী বৈজ্ঞানিকেরা বাতাসের মাত্রা কমবেশি করে ঋতুতে পরিবর্তন আনতে সফল গবেষণা চালিয়েছে, যার সফল পরীক্ষা ২০০৮ সালে চীনের অলিম্পিক গেমসের আসরে সম্পন্ন করা হয়।

১৯৮৭ থেকে ১৯৯২ এর মাঝামাঝিতে ইষ্ট-লন্ডনের "আরকো পাওয়ার টেকনোলোজিস ইনকারপোর্টেড" এর বৈজ্ঞানিকগণ এমন একটি হাতিয়ার আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছেন, যার মাধ্যমে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক গোলাকৃতিকে পরিবর্তন করা সম্ভব। ১৯৯৪ সালে মিলিটারী কন্ট্রেকটার্য "ই সিস্টেমস" হাতিয়ারটি খরিদ করেই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হিটার তৈরীর ঘোষনা দেয়। এই প্রজেক্টকে (HAARP) "হার্প" বলে নামকরণ করা হয়। প্রজেক্টটির মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে :-

(১) মানুষের ব্রেইনকে বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী করে তুলা।

(২) পৃথিবীর সকল যোগাযোগ ব্যবস্থা (Communication)কে জ্যাম করে দেয়া।

(৩) পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে ঋতুর পরিবর্তন আনতে সক্ষম হওয়া।

(৪) জংলী প্রাণীসমূহকে স্থানগত পরিবর্তনের আওতাভুক্ত করা।

(৫) মানুষের সুস্থ্যতাকে নেতিবাচক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করে দেয়া।

(৬) পৃথিবীর আকাশে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দেয়া।

একটি বাস্তবতা আপনি সবসময় স্মরণ রাখবেন যে, ইসলামের দুশমন দাজ্জালী শক্তিসমূহ ঋতু পরিবর্তন করে দেয়ার মত সম্পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। সামনে আরো পড়ুন...

পাকিস্তান...অস্বাভাবিক ঋতুর পরিবর্তনসমূহ...

বিশেষজ্ঞদের দাবী- যে, বাংলাদেশে আবহাওয়া পরিবর্তনের নিদর্শনসমূহ প্রকাশ হতে শুরু করেছে। যারফলে পানিসংরক্ষণ, ক্ষেতিকারবার, জনস্বাস্থ্য, ঋতুকাঠিন্যতা ও জংলী-প্রাণীদের বসবাস ইত্যাদি ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

সুতরাং তাদের সফলতার সময় এসে গেছে... নদী-নালার পানি শুকিয়ে যাচ্ছে... বরফের মধ্যে রেকর্ড পরিমান শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে... মানুষ নিজেই আবহাওয়া পরিবর্তনের উপর ক্ষমতাবান... বিশ্বময় পানিশূন্যতা...।

২০০৩ সালটি আবহাওয়া পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটি বৎসর ছিল। যার মধ্যে এমন সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যেগুলি অস্বাভাবিক ঋতু পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করে। ওই বৎসর জুন মাসে প্রচন্ড গরম অনুভূত হয়, যারফলে (HAARP)ছাড়াও আরো কয়েকটি প্রজেক্ট যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঋতু পরিবর্তনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয়। তন্মধ্যে সবচে' ভয়ানক যে পরীক্ষাটি করা হয়- তা ছিল ২০০৮ সালের পরিচালিত Big Bang পরীক্ষা। যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল- পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তন বিষয়াবলীর রহস্য উন্মোচন করে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে আবহাওয়া কন্ট্রোলের যোগ্যতা অর্জন করা।

(HAARP)এর মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোতেও তা অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিন্তু মিডিয়াতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ অন্যকিছু বলা হয়েছে। তার মানে হচ্ছে- জনসাধারণ বিশেষত মুসলমানগন যাতে প্রকৃত বাস্তবতা বুঝতে না পারে। যেমন- মিডিয়ায় বলা হয়েছে- কল-কারখানা এবং সিএনজির ধোয়ার ফলে আবহাওয়া মারাত্মক ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। অথচ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং জনসাধারণকে গুমরাহ করার প্রচেষ্টা বৈ কিছু নয়। ইহুদী বৈজ্ঞানিকেরা এসবকিছুই দাজ্জালের পথ প্রশস্ত করার জন্য করছে। কারণ ইহুদীদের বিশ্বাস- যখন ঐ সকল নিদর্শনসমূহ পূর্ণ হয়ে যাবে; যার ব্যাপারে তাওরাত, ইঞ্জীল ও মুহাম্মদ সা. ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তখন তাদের (মিথ্যা) খোদার আত্মপ্রকাশ ঘটবে।

ফ্যাশন... নাকি দাজ্জালের ষ্টাইল...

নবী করীম সা. দাজ্জালের ব্যাপারে সকল বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে গেছেন। তার চোখ কেমন হবে... তার চুল কেমন হবে। চুলের ব্যাপারে বিশেষ বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে।

আধুনিক হেয়ারষ্টাইল... নাকি... দাজ্জালের হেয়ারষ্টাইল!

দাজ্জালের চুলের ব্যাপারে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

(১) جعد الرأس অর্থাৎ প্রচুর ঘন কুকড়ানো।

(২) أنه شاب قطط অর্থাৎ ঘনচুল বিশিষ্ট এক যুবক।

(৩) رأسه من ورائه حبك حبك মাথার পেছন দিকে তার চুলগুলি জমাট জমাট হয়ে ঝুলে থাকবে। (مسند أحمد)

ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন- দেখতে বৃক্ষের জড়ের মত দেখাবে (অধিক ঘন এবং এলোমেলো হওয়ার কারণে)।

অর্থাৎ তার চুলগুলি শুস্ক, ঘন এবং অত্যন্ত বিশ্রী হবে। অবিন্যস্ত এলোমেলো হয়ে থাকবে। দেখতে গাছের ঝাড়ের মত দেখা যাবে কারণ পেছন দিকে তা এলোমেলো অবস্থায় ঝূলে থাকবে। চুল যদি হালকা ঘন হয়, তবে দেখতে তা সুন্দর দেখা যায়। কিন্তু দাজ্জালের চুল শক্ত ঘন, চমকহীন এবং এলোমেলো হয়ে

থাকবে। চুলগুলিকে যদি কেটে ছোট করে দেয়া যায়, তবে তা সোজা দাড়িয়ে থাকে। মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীর হেয়ারষ্টাইলের এ্যাডে উভয় প্রকারের ষ্টাইলই সবসময় দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ কুকড়ানো মোটা মোটা চুলের ষ্টাইল এবং সোজা দাড়িয়ে থাকা (বৃক্ষের মত) ষ্টাইল। এই হেয়ারষ্টাইলকে আস্তে আস্তে ফ্যাশনে রূপান্তরিত করা হচ্ছে।

দাজ্জালে চোখ... এবং মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীসমূহ...

দাজ্জাল কানা-ও হবে এবং ট্যারাও হবে। তার এক চোখ সম্পূর্ণ অকেজো থাকবে "وعينه اليسرى كأنها كوكب دري" তার বাম চক্ষু দেখতে উজ্জল তারকার মত দেখা যাবে।

মুসনাদে আহমদ এবং মুসনাদে ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে যে, "الدجال عينه خضراء كالزجاجة" অর্থাৎ দাজ্জালের চোখ কাঁচের মত সবুজ বর্ণের হবে। সনি এরিকসন মোবাইল সেটের উপর আপনি সবুজ বর্ণের গোলাকার নিশানা দেখেছেন।

Sony Ericsson

যদি বড় কোন এ্যাডে তা দেখানো হয়, তবে তা চোখের মত দেখা যায়। যেহেতু দাজ্জাল হচ্ছে বাহ্যিক-অভ্যন্তরীণ সকল অনিষ্টতার মূল- তাই তার চুল, চোখ, বর্ণ এবং আকৃতিও এমন, দেখা মাত্রই যে কোন সাধারণ মানুষ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করবে। কিন্তু ইহুদী সংস্থাগুলো দাজ্জালের আকৃতিকে এমনভাবে মানুষের সামনে পেশ করছে, যাতে যে কেউ দেখে পছন্দ করা শুরু করে। দাজ্জালের চোখ ও চুল ফ্যাশনেবল করার জন্য ইহুদীদের প্রচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে।

খারাপ ও অনিষ্টকর কার্টুনের দৃশ্য টিভি পর্দায় দেখিয়ে দেখিয়ে বাচ্চাদের রুচিকে এখন থেকেই অশালীণতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন কোম্পানীর এ্যাডে একচোখ বিশিষ্ট নিশান আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। কখনো এ চোখ বাইরে বেরিয়ে আসছে, কখনো চোখের ভেতরে সাদা আলো ঝলঝল করছে। ক্যামেরা, সেন্সর যন্ত্রাদী, গাড়ীর হেডলাইট, নতুন নতুন গাড়ীসমূহ ইত্যাদি অনেক প্রস্তুতকৃত বস্তু বর্তমানে একচোখের আকৃতিতে তৈরী করা হচ্ছে।

একচোখের ব্যাপারে ইহুদীরা একটি কথা প্রসিদ্ধ করেছে যে, "এটি হচ্ছে বদ নজর থেকে হেফাজতকারী চোখ"। এটাকে তারা Evil's Eye বলে থাকে। আমাদের সমাজের টিভিভক্ত মুসলমান কোন কিছু না বুঝেই তা অনুসরণ করতে শুরু করে দেয়। এই চোখকে বর্তমানে অনেক ছেলেপেলে গলায় ঝুলাতে শুরু করেছে। এমনকি তছবীর ভেতরেও এ চোখের আকৃতি বানানো হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে- Devil's Eye বা শয়তানের চোখ। এটাই দাজ্জালের চোখ, যার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে।
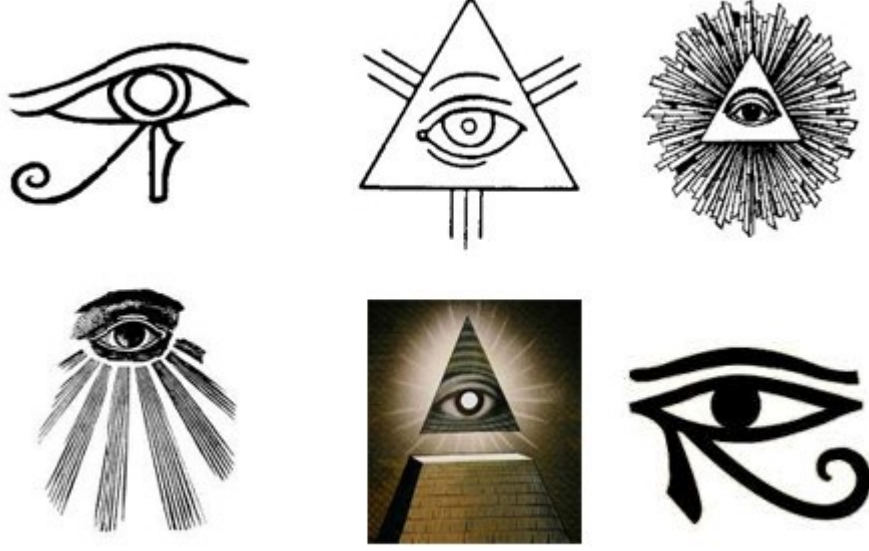
এক চোখে দর্শনের প্রবণতা প্রায় সকল ভাষায়ই বিদ্যমান, যা ন্যায়সঙ্গত বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটিও বাস্তবে দাজ্জালের চোখ থেকেই পরিচিত করা হয়েছে। ইহুদী সাহিত্যিকরা একে প্রত্যেক ভাষা-সাহিত্যে অন্তর্ভূক্ত করিয়েছে।

দাজ্জালের জান্নাত ও জাহান্নাম...

معه مثل الجنة ومثل النار ، فالنار روضة خضراء ، والجنة غبراء ذات دخان.

অর্থাৎ তার (দাজ্জালের) সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের মত (জান্নাত ও জাহান্নাম) হবে। সুতরাং তার জাহান্নাম সবুজ-শ্যামল বাগিচা দেখাবে আর জান্নাত ধুলাবালির মত ধোয়ার কুন্ডলী দেখাবে।

হাদিসটিকে প্রসিদ্ধ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. স্বীয় গ্রন্থ قصة المسيح الدجال এ কয়েকটি সনদে বর্ণনা করে একে "হাসান" বলেছেন।(ج:1ص:13)

হাদিসে দাজ্জালের জান্নাতের ব্যাপারে مثل শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তার সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের মত দু'টি বস্তু থাকবে। দ্বিতীয়ত- তার জান্নাতকে ধুলাবালির মত ধোয়ার কুন্ডলী বিশিষ্ট বলা হয়েছে। এটা আবার কেমন জান্নাত, যা ধুলাবালি আর ধোয়ার মত ??!! কতিপয় মুহাক্কিকীনের ধারনা- দাজ্জাল এ দৃশ্যটি লেজার বীম ব্যবহারের মাধ্যমে আবিস্কার করবে। যে কোন স্থানে লেজার বীমের আলো নিক্ষেপ করে যে কোন দৃশ্যই দেখানো যেতে পারে। কিন্তু কোন স্থানে বিশাল পরিমাণে লেজার বীমের আলো পড়লে ওই স্থানে গরমের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে, যদ্দরুণ ওখানকার মানুষের জন্য তা মারাত্মক ধরনের মানসিক শাস্তির বিষয় হয়ে উঠতে পারে। প্রচন্ড গরমে আপনি কোন যমিনকে উত্তপ্ত অবস্থায় দেখে থাকবেন- মনে হয় যে, তার উপরে ধুলাবালি আর ধুয়া উঠছে। কানা দাজ্জালের জান্নাতও এরকম কিছু হতে পারে।

একটি মোবাইল ফোন ব্যবহার যদি কারো জন্য ক্যান্সারের কারণ হতে পারে, তবে আপনি আন্দাজ করুন- যেস্থানে লাখো মোবাইলের আলো থেকেও বেশি আলো পতিত হয়, সেখানকার যমিনের অবস্থা কেমন হবে ??!! এর ভেতরে প্রবেশের ফলে যে কোন মানুষ যন্ত্রণাদায়ক মানসিক ও দৈহিক শাস্তির কবলে পড়ে

যাবে।

দাজ্জালের জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে লেখেন-

فإما أن يكون الدجال ساحرا ، فيخيل الشيء بصورة عكسه ، وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال نارا وباطن النار جنة ، وهذا الراجح ، وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة ، وعن المحنة والنقمة بالنار ، فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته ، يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس. (فتح الباري لابن حجر العسقلاني، ج:13ص:99)

অনুবাদ- হয়ত দাজ্জাল বড় জাদুগর হবে, যারফলে যে কোন বিষয়কেই সে বাস্তবের বিপরীত করে দেখাবে। অথবা আল্লাহ তা'লা দাজ্জালের জান্নাতের ভেতরে জাহান্নাম বানিয়ে দেবেন এবং তার জাহান্নামের ভেতরে জান্নাত বানিয়ে দেবেন। এই মতটিই প্রাধান্য। অথবা তার জান্নাতের দ্বারা উদ্দেশ্য তার সাথে বিদ্যমান নায-নেয়ামত ও বিলাসপূর্ণ বিষয়াদী এবং তার জাহান্নামের দ্বারা উদ্দেশ্য তার অসন্তুষ্টি। মান্যকারীকে সে স্বীয় জান্নাতে প্রবেশ করাবে (পরিণতিতে আখেরাতে জাহান্নাম)। এটাই তার জাহান্নামের নমুনা।"

তার জাহান্নামের স্পষ্ট বিবরণ মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদিস থেকেও জানা যায়-

"হযরত হুযায়ফা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. বলেন- দাজ্জালের সাথে যা কিছু থাকবে, সে সম্পর্কে আমার ভাল করেই জানা আছে- তার সাথে দু'টি প্রবাহমান নদী থাকবে। একটি দেখতে সাদা পানির মত মনে হবে, আর অপরটি দেখতে প্রস্ফুটিত আগুনের মত হবে। দাজ্জাল যদি কারো সামনে এসে পড়ে, তাহলে সে যেন দুই চোখ বন্ধ করে দাজ্জালের প্রকাশিত আগুনে ঢুকে পড়ে এবং পানি পানের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুকিয়ে ফেলে, তাহলে সে (দাজ্জালের প্রকাশিত) আগুনকে ঠান্ডা পানি হিসেবে পাবে। (মুসলিম শরীফ)

অর্থাৎ নবী করীম সা. বলেন- চোখে দেখতে যা আগুনের মত দেখা যায়, তাতে যেন সে প্রবেশ করে এবং চোখ বন্ধ করে ঠান্ডা পানি পানের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুকিয়ে ফেলে, তবে সে (আগুনকে) ঠান্ডা পানি হিসেবে পাবে।

আল্লাহ এবং তার রাসূলকে সত্য বলে বিশ্বাসকারীগণ! এরপরও কি আপনারা আমেরিকা ও তার মিত্রগুলোর বাহ্যিক শক্তি দেখে ভীত হয়ে পড়বেন ??!! অথচ আপনাদের চোখের সামনে প্রতিদিন নিরীহ সব মুসলিম নারী-শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। মনে রাখবেন- দাজ্জালের সময় বর্তমান পরিস্থিতি থেকেও কঠিনতর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। এরপরও মহানবী রাসূলে কারীম সা. স্বীয় উম্মতকে সান্তনা দিচ্ছেন যে, ঘাবড়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই! এহেন পরিস্থিতিতে নিজের ঈমানকে বিক্রি করে দিয়োনা; বরং তাতে প্রবেশ হয়ে যাও! আল্লাহ তা'লা দাজ্জালের আগুনকে তোমাদের জন্য ঠান্ডা পানি বানিয়ে দেবেন। সুবহানাল্লাহ......!!

ওহে মুসলমান ভাইয়েরা! ইসলাম ধর্মে সন্তুষ্ট হয়েও ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে কেন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখছো ??!! ঈমান আনার পরও কেন আল্লাহর বড়ত্ব ও শক্তিকে অস্বীকার করছো ??!! মুহাম্মাদ মুস্তফা সা. এর "রব"কে সত্য বলে মানার পরও কেন দাজ্জালের দাজ্জালীতে ডুবে রয়েছো ??!! আল্লাহর সত্য ও চিরস্থায়ী জান্নাত ছেড়ে দাজ্জালের বাহ্যিক জান্নাতের দিকে কেন দৌড়াচ্ছো ??!! তাহলে কি সত্যবাদী নবী রাসূলে আরাবী সা. এর প্রতিশ্রুতিগুলোর উপর বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়েছে ??!!

দাজ্জালের বাহন... নাকি ফ্লাইং সোসার...

বিগত অধ্যায়ে আপনি ফ্লাইং সোসার্সের ব্যাপারে পড়ে এসেছেন। আসুন- এখন আমরা রাসূলে কারীম সা. এর যবানে মুবারক থেকে দাজ্জালের বাহন সম্পর্কে কিছু কথা শুনি:-

দাজ্জালের বাহনের ব্যাপারে যে সকল সহীহ হাদিস পাওয়া যায় এবং যেগুলির মাধ্যমে দলীল সাব্যস্ত করা সম্ভব হয়, এধরনের হাদিস থেকে মুসলিম শরীফের একটি এবং মুস্তাদরাকে হাকিমের একটি হাদিস অন্যতম:

(১) মুসলিম শরীফে হযরত নাওয়াছ বিন ছামআন রা. থেকে একটি লম্বা হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যার মধ্যে নবী করীম সা. দাজ্জালের বাহনের দ্রুতগতির কথা আলোচনা করেছেন। নবী করীম সা. বলেন- كالغيث استدبرته الريح অর্থাৎ দাজ্জালের বাহনের গতি হবে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া মেঘের গতির মত। এখানে আরবী শব্দ غيث এর তরজমা غيم (মেঘ) দ্বারা করা হয়েছে। ধরুন- মেঘের খন্ড যদি টেকনাফের আকাশে অবস্থান করে এবং বৃষ্টির ফোটাগুলো মেঘখন্ড থেকে সবেমাত্র বের হয়েছে, কিন্তু এমন সময় যদি প্রচন্ড বাতাস বৃষ্টির পিছু নেয়, তবে এ বৃষ্টির ফোটাগুলো তেতুলিয়াতে গিয়ে পতিত হবে। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়ার দূরত্ব ১২০০ (বারশত) কিলোমিটারেরও উপরে।

(২) দ্বিতীয় বর্ণনাটি এসেছে মুস্তাদরাকে হাকিমে। ইমাম হাকিম রহ. হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী রহ. ও উনার সাথে একমত পোষন করেছেন:-

হযরত হুযায়ফা বিন উছাইদ রা. থেকে বর্ণিত- "দাজ্জালের জন্য জমিনকে এমনভাবে লেপটিয়ে দেয়া হবে, যেমনভাবে ছাগলের চামড়া (জবাই করে আলাদা করার পর) লেপটিয়ে দেয়া হয়।

যমিন লেপটিয়ে (ভাজ করে) দেয়াকে তাসাউফের ভাষায় طي أرض বলা হয়। এর মাধ্যমে যমিন সংকোচিত হয়ে যায় এবং স্থান-কাল (Space-Time)এর ভেদাভেদ নিঃশেষ হয়ে যায়। এক সেকেন্ডে পূর্ব মেরু থেকে পশ্চিম মেরুতে পৌছে যাওয়া সম্ভব হয়ে যায়। তাসাউফের পরিভাষা নিয়ে অনেক মতানৈক্য হতে পারে। চলুন- আধুনিক সাইন্সের দৃষ্টিতে এর উত্তর শুনি...। বিস্তারিত বিশ্লেষণ যদিও মনের মধ্যে বিরক্তির ভাব সৃষ্টি করে। তবুও বিস্তারিত জানুন! মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর মু'জেযাগুলোকে বর্তমান টেকনোলোজীর যুগে অনুধাবন করুন এবং সকল মিথ্যুক নবী ও মিথ্যুক খোদাদাবীকারীদের মুখে থুথু মারুন..!!!

সময়ের হিসাবে ভূ-পৃষ্ঠের স্থানসমূহ অতিক্রম করা...

এর সম্পর্ক দু'টি বিষয়ের সাথে। একটি হচ্ছে নড়চড়া বা গতি, দ্বিতীয়টি বহন শক্তি। এ দু'টি বিষয় সময়ের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আপনি যদি একহাজার কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতে চান, তাহলে বাসের মাধ্যমে গেলে তাতে বাইশ ঘন্টা লাগবে আর প্লেনে গেলে শুধু দুই ঘন্টা লাগবে। গতি দ্রুত হওয়ার দরুন রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু একটি ব্যাপার উভয়াবস্থাতেই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। আর সেটা হচ্ছে বহন শক্তি। এই শক্তি কয়েকটি পদ্ধতিতে সময়ের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- সময় থমকে যাওয়া বা অন্য কোন দিকে চলে যাওয়া। পরিভাষায় একে (Time Warp) বলা হয়। যদি এই শক্তিটুকু সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেয়া হয়, তবে মানুষ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাতাসে উড়তে সক্ষম হবে। আর যদি কোনরূপ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ শক্তি ব্যবহারে যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হয়, তবে তার গতি অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য দ্রুত পর্যায়ে উন্নীত হয়ে যাবে।

ফ্লাইং সোসার্সের ব্যাপারে গবেষণাকারী ডক্টর জাইছোবের মতে- ফ্লাইং সোসার্সের মধ্যে এ ধরনের শক্তি ব্যবহৃত হয়। আর আইনষ্টাইনের বক্তব্যানুযায়ী- এ শক্তিসম্পন্ন বাহনের গতি "আলো"র গতির সমান অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে (২৯৯৩০০) দুই লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত কিলোমিটার। পাশাপাশি ফ্লাইং সোকার্সে "লেজার টেকনোলোজী"-ও (বর্তমান সাইন্স এখনও লেজার টেকনোলোজীকে পরিপূর্ণরূপে বুঝে উঠতে পারেনি) ব্যবহৃত হয়। লেজার লাইটের ব্যাপারে আধুনিক তথ্য হচ্ছে যে, এর গতি "আলো"র গতি থেকেও আরো দ্রুত। ইতিপূর্বে বৈজ্ঞানিকদের (বিশেষত আইনষ্টাইন) ধারনা ছিল যে, জগতের সবচাইতে দ্রুতগতিসম্পন্ন বস্তু হচ্ছে আলো, এথেকে দ্রুতগতিসম্পন্ন কোন কিছু জগতে নেই। কিন্তু মার্কিন প্রকৃতি

বিশেষজ্ঞ (Physicists)২০০০ সালে গবেষণাকালে লেজার বীমকে এথেকেও বেশি দ্রুতগতিসম্পন্ন আখ্যায়িত করেছেন। এমনি করে ফ্লাইং সোসার্স অধিকারীদের জন্য স্থান-কালের ভেদাভেদ নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সময় থমকে রয়েছে অনুভব হয়।

এই শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়া এবং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা ব্যবহার করাকে আপনি طيء أرض বলুন অথবা স্থান-কাল (Space-Time)এর ভেদাভেদ নিঃশেষ হওয়া বলুন অথবা সময় থমকে যাওয়া (Time Warp) বলুন। এমতাবস্থায় এক কদম পূর্ব মেরুতে এবং আরেক কদম পশ্চিম মেরুতে গিয়ে পড়বে এবং যমিনকে লেপটিয়ে সংক্ষিপ্ত করে দেয়া হবে। রাসূলে আরাবী সা. এর মুখনিস্রিত বাক্যটি নিয়ে চিন্তা করুন- "تطوى له الأرض" (তার জন্য যমিনকে লেপটিয়ে দেয়া হবে)। যমিন লেপটিয়ে যাওয়া শুধু এর দ্রুতগতির দিকে লক্ষ করে নয়; বরং হাদিসে অন্য আরেকটি বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে, এ ধরনের শক্তি দাজ্জালের ইচ্ছাধীন হবে। যারফলে সময় থমকে যাবে। সুতরাং طي الأرض দ্বারা উদ্দেশ্য স্থান-কাল (Space-Time)উভয়টাই। নবী করীম সা.এর অন্যতম মুজেযা মেরাজের ঘটনাটিও এধরনের সাইন্সী আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন- "দাজ্জালের গাধার কানের ছায়ায় সত্তর হাজার মানুষ এসে যাবে।" (الفتن ، مصنف ابن أبي شيبة)

দাজ্জালের বাহন... আরো কিছু দুর্বল বর্ণনা...

দাজ্জালের বাহনের ব্যাপারে অন্যান্য হাদিসের কিতাবেও বহু রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু সেগুলো যায়ীফ বা দুর্বল। তন্মধ্যে-

(১) নুআইম বিন হাম্মাদ রহ. "আল-ফিতান" গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন- নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন যে, "দাজ্জালের গাধার দুই কানের মাঝখানে চল্লিশ গজ দূরত্ব হবে। (এই অংশটি সহীহ হাদিসের মধ্যেও এসেছে) এবং তার গাধার পায়ের এক কদম তিন দিন ভ্রমনের সমান হবে। সে তার গাধায় আরোহন করে সমুদ্রের ভেতরে এমনভাবে ঢুকে পড়বে, যেমন করে তোমরা ঘোড়ায় চড়ে ক্ষুদ্র নালাতে ঢুকে পড়।"

(২) দাজ্জালের আওয়াজ পূর্ব-পশ্চিমে একসাথে শুনা যাবে। (কানযুল উম্মাল)

(৩) তার গতি এতই দ্রুত হবে যে, সূর্যের পূর্বেই সে সূর্য ডুবার স্থানে পৌছে যাবে। (ইবনে আবী শাইবা)

(৪) আকাশে উড়ার পাশাপাশি বাহনটি সমুদ্রের পানির গভীরেও দ্রুত চলাচল ক্ষমাতসম্পন্ন হবে ।

(৫) তার বাহন হবে লেজকাটা গাধা।

(৬) تحته حمار أقمر অর্থাৎ তার বাহন হবে চমকদার (জ্যোতিবিশিষ্ট) গাধা। তার গাধার দুই কর্নের মাঝে সত্তর হাজার মানুষের জায়গা হবে। (الفتن نعيم بن حماد، وأبو عمرو الداني ، كنز العمال)

ফায়দা- ফ্লাইং সোসার্সও অত্যাধিক জ্যোতিবিশিষ্ট হয়, সম্পূর্ণ চন্দ্রের মত।

হযরত আলী রা. একবার জনসমক্ষে ভাষন দিলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও নবী করীম সা. এর উপর দরূপ পাঠান্তে তিনি বলতে লাগলেন- ওহে লোকসকল! যা জিজ্ঞাসা করার- আমার মৃত্যুর আগেই জিজ্ঞাসা করে ফেলো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতপর সা'সা' বিন সাউহান আবদী রহ. দাড়িয়ে উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন- দাজ্জাল কখন বের হবে ? হযরত আলী রা. উত্তরে বললেন- হে সা'সা'! আল্লাহ তা'লা তোমার স্থান সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তোমার কথা শুনেছেন। এ ব্যাপারে তোমার থেকে আমি বেশি অবগত নই। তবে দাজ্জাল প্রকাশের কিছু নিদর্শনাবলী, কিছু উপকরণ এবং কিছু ফেতনা রয়েছে। যেমন- মানুষ একজন আরেকজনের কাজকে অনুসরণ করবে।

বর্ণনার শেষ অংশে বলা হয়েছে- "দাজ্জালকে যে ব্যক্তি মিথ্যারূপ করল, সে কামিয়াব হয়ে গেল। আর যে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে দুর্ভাগা হয়ে গেল। তবে মনে রেখো! দাজ্জাল সাধারণ মানুষের মতই খানাপিনা এবং বাজারে যাওয়া-আসা করবে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা এগুলো থেকে পবিত্র। শুনে রেখো! দাজ্জালের বাহন চল্লিশ হাত লম্বা হবে। তার সাথে চমকদার গাধা থাকবে। গাধার প্রতিটি কানের দৈর্ঘ্য ত্রিশ গজ করে হবে। গাধার এক কদম থেকে আরেক কদমের দূরত্ব একদিন ও একরাত্রির ভ্রমন সমপরিমান হবে। তার জন্য যমিনকে লেপটিয়ে দেয়া হবে। সে তার বাম হাতের দ্বারা মেঘবৃষ্টি কন্ট্রোল করবে এবং সূর্যের পূর্বেই অস্তের স্থানে পৌছে যাবে। সমুদ্রে দুই পায়ের পেন্ডুলি পর্যন্ত প্রবেশ করবে। তার সম্মুখে ধোয়ার পাহাড় হবে এবং তার পেছনে সবুজ-শ্যামল পাহাড় হব। এমন আওয়াজ দেওয়া হবে যা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত শুনা যাবে। সে বলবে- হে আমার বন্ধুগণ! আমার কাছে এসো...! আমার বন্ধুগণ! আমার কাছে এসো...! আমাকে মহব্বতকারীগণ! আমার কাছে এসো...! আমার শুভাকাঙ্খীগণ! আমার কাছে এসো! আমিই সেই সত্তা, যে তোমাদের সৃষ্টি করেছে এবং বিন্যস্ত করেছে, সবকিছু সঠিকরূপে তৈরী করে অতপর হেদায়েত করেছে। আমিই তোমাদের সবচে' বড় প্রভূ...।" হযরত আলী রা. বলেন- আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে। সে তোমাদের প্রভূ নয়। স্মরণ রেখো! তার অনুসারী অধিকাংশই ইহুদী এবং ভ্যাবিচারী (যিনার) সন্তান হবে। (أبو عمرو الداني:664، كنز العمال،ج:14ص:613)

হাদিসের সনদে হাম্মাদ বিন আমর বর্ণনাকারী "মাতরূক" বিধায় হাদিসটি দুর্বল।

জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ- ফ্লাইং সোসার্স হচ্ছে দাজ্জালের বাহন। এই দাবী পেশ করেছেন গবেষক মুহাম্মদ ঈসা দাউদ। লেখক এব্যাপারে জোর দিয়ে কোনকিছু নির্ধারণ করছেনা; বরং সহীহ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত বিষয়ই প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। সালফে সালেহীনের উক্তিগুলো বর্ণনার মধ্যেই মুক্তি নিহীত। যদি কারো পক্ষ থেকে এমন কোন মত প্রকাশ করা হয়, তবে তাদের জ্ঞানের আলোকেই এগুলো পরখ করা উচিত। তাছাড়া এটা কোন আক্বীদাগত বিষয়ও না যে, দাজ্জাল গাধার উপরে আরোহন করেই আসবে বা প্লেনে চড়ে আসবে বা ফ্লাইং সোকার্সে করে উড়ে আসবে। মূল কথা হচ্ছে যে, সে অবশ্যই আসবে এবং তার বাহনের গতি ঐ রকমই দ্রুত হবে, যেমনটি রাসূলে কারীম সা. এর যবানে মুবারক দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। চায় তা বাস্তব গাধা হোক বা গাধাসদৃশ অন্য কিছু!!!

(اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، اللهم إني اعوذ بک أن أکون من الجاهلين..اللهم أرنا الحـق حقـا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا...)

দাজ্জালের কারিশমা...

(১) দাজ্জাল জন্মান্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীদের সম্পূর্ণ সুস্থ্য করে দেবে। (মুসনাদেআহমদ)

(২) মৃত ব্যক্তিদের জীবিত করে দেখাবে। জীবিতকে হত্যা করে পূণরায় তাকে জীবিত করে দেখাবে। তার আদেশে আকাশের মেঘ বৃষ্টি বর্ষন করবে। নদীকে হুকুম করবে- "থেমে যাও"- নদীর স্রোত থেমে যাবে, আবার পূণরায় চলার হুকুম করলে চলতে থাকবে। তার আদেশে অনুর্বর জমি ফসলে সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠবে। যে তার উপর ঈমান আনবেনা, তার ক্ষেত-ক্ষামার নিঃশেষ হয়ে ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং পানি থেকে তাকে বঞ্চিত করে দেবে। দাজ্জালের সাথে খানা-পিনার ভান্ডার থাকবে। তার একহাতে আগুন এবং আরেক হাতে জান্নাত থাকবে। (মুসলিম শরীফের হাদিসের মর্মার্থ)

(৩) ভূমিকম্পন সৃষ্টির যোগ্যতা তার আয়ত্বে থাকবে। (আবূ দাউদ)

দাজ্জালের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত তথ্যের জন্য লেখকের "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল" অধ্যয়ন করতে পারেন।

দাজ্জালের উপর সবচে' ভারী... বনূ তামীম সম্প্রদায়...

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি বনূ তামীম গোত্রকে তিনটি কারণে ভালবাসি, যা রাসূলে কারীম সা. এর মুখ থেকে শুনেছি। রাসূলে কারীম সা. বলেন- আমার উম্মতের মধ্যে বনূ তামীম গোত্র দাজ্জালের বিরুদ্ধে সবচে' কঠোর অবস্থানে থাকবে। (আবূ হুরায়রা রা. বলেন-) বনূ তামীম গোত্রের সদকা আসলে রাসূলে কারীম সা. বলতেন- এটাকে গ্রহণ কর। এটা আমার ক্বওমের সদকা। (মহব্বতের তৃতীয় কারণ-) হযরত আয়েশা রা. এর কাছে বনূ তামীম গোত্রের একজন মহিলা বন্দী অবস্থায় ছিল, তা দেখে রাসূলে কারীম সা. বলেন- হে আয়েশা! একে মুক্ত করে দাও! কেননা সে ইসমাঈলী বংশের মেয়ে। (বুখারী-২৫৪৩, মুসলিম-২৫২৫)

মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় বনূ তামীম গোত্রের ব্যাপারে "দাজ্জাল" শব্দের বিপরীতে "هم أشد الناس قتالا في الملاحم" ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তারা (বনূ তামীম) শেষ যমানার সর্বশেষ ভয়ংকর যুদ্ধে সবচে' বেশি বাহাদুর এবং যুদ্ধবাজ হবে।

হযরত আবূ বকর রা. বনূ তামীম গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। গোত্রটি আজও ইয়েমেন, মক্কা-মদীনা এবং ইরাকে বিদ্যমান। পাশাপাশি বর্তমান সময়ে তারা আফগানিস্তান থেকে নিয়ে ইরাক পর্যন্ত রণাঙ্গনে দাজ্জালী শক্তির জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির বাহক হয়ে রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ!! মুহাম্মদে আরাবী সা. এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো ঈমানদারদের সামনে আস্তে আস্তে পূর্ণ হতে শুরু করেছে।

"খোয" এবং "কিরমান" গোত্রদ্বয়ের সাথে যুদ্ধ...

عن ابي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم ، حمر الوجوه ، فطس الأنوف ، صغار الأعين ، ووجوههم المَجَانُّ المُطْرَقَةُ ، ونعالهم الشعر. (الصحيح البخاري ، مسند أحمد بن حنبل ، ابن حبان). باب علامات النبوة في الإسلام.

"নবী করীম সা. বলেন- কেয়ামত ততক্ষন পর্যন্ত আসবেনা, যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা "খোয" এবং "কিরমান" গোত্রদ্বয়ের সাথে যুদ্ধ করবে। অনারবদের মধ্যে দু'টি গোত্র। (এদের পরিচয় হচ্ছে-) লাল চামড়ার অধিকারী, চ্যাপটে নাক ও ছোট ছোট চোখবিশিষ্ট। তাদের চেহারা হবে চামড়া দিয়ে পেচানো ঢালের মত

(প্রশস্ত চেহারার অধিকারী)। তাদের জুতা হবে চুল (দিয়ে তৈরী)।

বাইযাবী রহ. বলেন- হাদিসে المِجن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শাব্দিক অর্থ হল- ঢাল বা বর্ম, যা যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হল যে, তাদের চেহারা ঢালের মত প্রশস্ত ও গোলাকৃতির হবে। দ্বিতীয়ত- المُطْرَقَةُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ ভাজকৃত, চামড়া দিয়ে পেচানো, একটির উপর অন্যটি স্থাপনকৃত। উদ্দেশ্য হল যে, তাদের চেহারায় গোশ্তের স্তর বেশি থাকার কারণে বড় ও প্রশস্ত হবে।

হাদিসে "খোয" এবং "কিরমান" গোত্রদ্বয়ের যে পরিচয় বলা হয়েছে, এমনই অন্য একটি হাদিসে তুর্কীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। কিন্তু ইবনে হাজার রহ. বলেন- সেটি ভিন্ন হাদিস।

"খোয" পশ্চিম ইরানে অবস্থিত। বর্তমানে তা "খোযিস্তান" (Khuzestan) হিসেবে প্রসিদ্ধ। খোযিস্তানের কেন্দ্রীয় শহর হচ্ছে "আহওয়ায" (Ahwaz)। এখানকার উৎপাদিত বিষয়সমূহের মধ্যে তেল এবং টেক্সটাইল অন্যতম। ইরান-ইরাক যুদ্ধে এলাকাটি ইরাকের পক্ষ থেকে মারাত্মক বোম্বিংয়ের টার্গেট হয়েছিল। আর "কিরমান" হচ্ছে দক্ষিণ-পূর্ব ইরানের একটি প্রদেশ। ওখানকার সরকারী ব্যবস্থাপনাও কিরমানে'ই অবস্থিত। কিরমান প্রদেশের অন্যন্য বড় বড় শহরের মধ্যে "ছিরজান", "জারাফাত" এবং "রাফছিনজান" উল্লেখযোগ্য।

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهبط الدجال خوز وكرمان في ثمانين ألفا ، ينتعلون الشعر ويلبسون الطيالسة ، كأن وجوههم المجان المطرقة. (مسند أبي يعلى) قال الحسين سليم أسد: رجاله ثقات.

"হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. বলেন- দাজ্জাল "খোয" এবং "কিরমান" অঞ্চলে আশি হাজার লোকদের মধ্যে অবতরণ করবে (অর্থাৎ ওখান থেকে আশি হাজার তার অনুসারী হবে)। তাদের জুতা হবে চুলের তৈরী, তারা "তায়ালছানী" চাদর পরিহিত থাকবে। তাদের চেহারা হবে চামড়া দিয়ে পেচানো ঢালের মত (প্রশস্ত চেহারার অধিকারী)

মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় এদের সংখ্যা সত্তর হাজার বর্ণিত হয়েছে।

ইহুদীরা বিশেষ এক ধরনের চাদর পরে থাকে, যা মাথার উপর থেকে নিয়ে মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ছবিতে লক্ষ করুন.....

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত- তিনি বলেন- আমি রাসূলে কারীম সা. কে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই দাজ্জাল "খোয" এবং "কিরমান" অঞ্চলে অবতরণ করবে, ওখানে তার অনুসারী হবে সত্তর হাজার। তাদের চেহারা হবে চামড়া দিয়ে পেচানো ঢালের মত (প্রশস্ত চেহারার অধিকারী)।

তুর্কী, খোয এবং কিরমানবাসীদের চেহারা এমনই হবে- দেখতে তাদের চেহারা সম্মুখ ঢালের মত দেখাবে। হয়ত এখানে প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য- অর্থাৎ প্রশস্ত চেহারার অধিকারী হবে। অথবা তারা বেসুন্দর-বিশ্রি চেহারার অধিকারী হবে।

ইরানের সাথে দাজ্জালের সম্পর্ক ??...গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

দাজ্জাল এবং তার অনুসারীদের এলাকার ব্যাপারে যতগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে, অধিকাংশই বর্তমান ইরানের বিভিন্ন বড় বড় অঞ্চলে অবস্থিত। যেমন- "দাজ্জাল ইরানের "আসফাহান" থেকে আত্মপ্রকাশ করবে এবং তার সাথে সত্তর হাজার ইসফাহানী ইহুদী অনুসারী হবে। "খোয" ও "কিরমানে"র ব্যাপারেও সহীহ হাদিস উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসগুলোর প্রকৃত অর্থ কি ?? এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য.. ??

দু'টি অবস্থা হতে পারে। এক- ইরান সম্পূর্ণরূপে ইহুদীদের আয়ত্বে চলে যাবে। দুই- সরকার ব্যবস্থা বর্তমানের মতই থাকবে, কিন্তু মুল কড়ি ইহুদীদের ইশারায় চালিত হবে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ, ইহুদীরা ইরানে বহুকাল পূর্ব থেকেই বসবাস করে আসছে। তাদের মধ্যে কিছু গোত্র বাহ্যিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও মূলত ইহুদীই রয়ে গেছে। এমনই একটি সম্প্রদায় "আসফাহান", "রাফছানজান", "মাশহাদ"

এবং ইরানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রভাবশালী রয়েছে। যারা মডার্ন ইসলামের নামে প্রসিদ্ধ। আসফাহানের ইহুদী সম্প্রদায়ের মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ ইহুদীদের থেকে ভিন্ন। ব্যাপারটি আপনি অনুধাবন করতে পারবেন- যখন শুনবেন যে, ইসরায়েল সরকার একাধিকবার তেলআবিবে গিয়ে বসবাস করার আহবান জানালেও আসফাহানের ইহুদীরা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং ইসরায়েলের পরিবর্তে ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে বসবাসের জন্য প্রাধান্য দেয়। ইরানী ইহুদীরা "হাখাম য়েদীদ শূফাত"কে তাদের আত্মীক (রূহানী) পিতা বলে মনে করে। আর একারণেই ইরানী মায়েরা একের পর এক ইহুদী সন্তান জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সবার কথা না বলে এখানে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে দুইজন ইহুদীর কথা আলোচনা করব:-

ইবরাহীম নাথান- যার ডাকনাম হচ্ছে- মোল্লা ইবরাহীম (১৮১৬-১৮৬৮)। দ্বিতীয় জন হচ্ছে- আগাখান (প্রথম) (১৮০০-১৮৮১)। মোল্লা ইবরাহীম বুখারা, তুর্কিস্তান, কাবুল এবং হিন্দুস্থানে মুসলমানদের বিনাশ করে ছেড়েছে। পক্ষান্তরে আগাখান (প্রথম) আগে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের এবং পরে পাকিস্তানের মুসলমানদের আমলে নিয়েছে। আগাখান প্রথমে ইরানের কিরমান প্রদেশের গভর্ণরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। ১৮৪০ সালে সে সম্পূর্ণ ইরানের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চালালেও কুলিয়ে উঠতে পারেনি; ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ইরান থেকে পালিয়ে সে হিন্দুস্তানে চলে আসে। পাক-ভারত বিভক্তির পর সম্প্রদায়টি করাচীতে এসে বসবাস শুরু করে। ইহুদীদের বিশেষ নিদর্শন এবং তাদের বর্ণের ব্যাপারে যদি আপনি জানতে চান, তবে আসফাহানের প্রতিটি জাগায় জাগায় তা বড়সংখ্যায় দেখতে পাবেন- তাদের নকশা, নীল বর্ণের টাইলস এবং বড় বড় ইহুদী দরবার পাশাপাশি এর উপর বিশেষ নিদর্শনাবলী ইত্যাদি। আসফাহানের ইহুদীরা বর্তমান ইরানের অর্থনীতিতে মেরুদন্ডের পর্যায়ে অবস্থান করছে। ইরানের সাথে ইহুদীদের সখ্যতার কারণ ঐতিহাসিক। কেননা এখানেই আল্লাহর নবী হযরত দানিয়াল আ. এর কবর বিদ্যমান, হযরত বিনয়ামীনের শরীর বিদ্যমান, নবী ছারাবুত আশরের কবরও আসফাহানে অবস্থিত, অপর এক নবী "ইস্তার মরদ খায়ী" এর কবরও "হামাদানে" পড়েছে এবং আসফাহানের ভেতরেই ইহুদীদের বড় বড় কেন্দ্রসমূহ বিদ্যমান। ইরানের সংবিধানের মধ্যেও এমন কতিপয় বিষয় উল্লেখিত; যা ইরানের বাহ্যিক রূপের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইরান-আমেরিকা বানিজ্যিক সম্পর্ক, ইরান-ভারত গভীর বন্ধন- এমনকি পাকিস্তান থেকেও বেশি, আফগানিস্তানের উপর মার্কিন প্রশাসনের ব্যাপারে ইরানের নিরব অবস্থান; বরং আমেরিকাকে গোপন সাহায্য,

পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ষ্টেট ছেড়ে শীয়াদের ব্যবহার, পাক-ভারত মতানৈক্যের ব্যাপারে পাকিস্তানের পক্ষপাতিত্বহীনতা ইত্যাদি ইত্যাদি...।

ইহুদী অধ্যুষিত ইরানের মধ্যভাগ তেহরান হামাদান ও আসফাহান

ইরান এবং হিযবুল্লাহ...

ফিলিস্তীন পরিস্থিতির ব্যাপারে যদি আমরা গভীরভাবে ইরানী পলিসিগুলো পর্যবেক্ষণ করি, তবে তা জর্ডান এবং মিসরের পলিসি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়, পার্থক্য শুধুমাত্র বর্ণনার ভঙ্গিতে। তাছাড়া লেবাননের "হিযবুল্লাহ"কে ইরান কর্তৃক সার্বিক সহযোগীতা একে আরো সন্দেহপূর্ণ করে তুলে। কেননা হিযবুল্লাহ হচ্ছে ঐ সংগঠন, যার সার্বিক দেখাশুনা ও সংরক্ষণ ইসরায়েলী গোপন এজেন্সী "মোসাদ" এর পক্ষ থেকে করা হয়। এর মূর উদ্দেশ্য হচ্ছে- লেবাননে বিদ্যমান প্রকৃত মুজাহিদদেরকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অপারেশান থেকে বিরত রাখা। ইরাকের পরিস্থিতিও তাই- সেখানে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ মুকতাদা আলসদরের মাহদী মিলিশিয়াকে "আলকায়েদা"র মোকাবেলায় দাড় করিয়েছে।

কথাগুলো দৈনিক খবরের কাগজ পাঠকদের কাছে মনে হয় খুবই অবাক লাগবে। কিন্তু যে সকল লোকের কাছে রণাঙ্গন থেকে সংবাদ পৌছে, তারা হিযবুল্লাহকে এমনই চেনে- যেমননাকি "মোসাদ"কে চেনে। ইসরায়েল কর্তৃক হিযবুল্লার সাথে যুদ্ধ একটি ড্রামা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল আরব মুজাহিদীনের মনযোগকে ইরাকের পরিবর্তে লেবাননের দিকে সরিয়ে দেয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল- ইসলামী বিশ্ব বিশেষত আরববিশ্বে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠা আল-কায়েদাকে হটিয়ে হিযবুল্লাকে এর সমতুল্য

সাব্যস্ত করা। ঐ যুদ্ধের বিস্তারিত তথ্য যদি আপনি অধ্যয়ন করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে, এটা শুধুই একটি ড্রামা ছিল; যার কাহিনী ওয়াশিংটন এবং তেলআবিবে বসে রচনা করা হয়েছিল এবং এর হিরোর দায়িত্ব সোপর্দ করা হয়েছিল বাইরুতের বাসভবনে বিলাস জীবন-যাপনকারী হাসান নাসরুল্লা'র হাতে।

ইরান এবং মুকতাদা আল-সদর...

আপনি একটু চিন্তা করুন যে, হাসান নাসরুল্লাহ ইসরায়েল এবং আমেরিকার এত বড় দুশমন হওয়ার পরও যুদ্ধচলাকালীন সে বিক্ষোভ-মিছিলে শরীক হয়েছে এবং তার টিভি-ষ্টেশনও যথারীতি চালু ছিল। ঠিক তেমনটি হয়েছে ইরানের সহযোগীতাপ্রাপ্ত ইরাকে অবস্থানকারী মুকতাদা আল-সদরের ক্ষেত্রেও। যখনই আবূ মুসআ'ব যারকাভী শহীদ রহ. রণাঙ্গনে আমেরিকাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ ও পরাজিত করছিল এবং আমেরিকার সকল অত্যাধুনিক টেকনোলোজীকে পর্যুদস্ত করে পৃথিবীবাসীর সামনে রেখে দিয়েছিল, তখনই মুকতাদা আলসদরকে দাড় করানো হয় এবং মিডিয়ার সকল সুবিধা ব্যবহার করে তাকে পৃথিবীবাসীর সামনে হিরো বানিয়ে পেশ করা হয়।

চিন্তার বিষয়- সে আমেরিকাকে হুমকি-ধমকিও দিচ্ছে এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপারেশান চালানোর জন্য লোকদেরকে আহবানও করছে, আমেরিকার দুশমন হওয়া সত্তেও বড় বড় সভা-সম্মেলন এবং সাংবাদিক প্রেসে কি করে সে ওপেন বিবৃতি দিতে পারে ?? পক্ষান্তরে ইরাকেই আল-কায়েদা নেতার ব্যাপারে আপনি তাদের অবস্থান লক্ষ করুন- আবূ মুসআ'ব যারকাভী শহীদ রহ. কে গ্রেফতার বা হত্যার জন্য সিআইএ এবং 'মুসাদে'র লোকেরা পাগলা কুকুরের মত হন্যে হয়ে খুজছিল। ড্রোন বিমান, স্যাটেলাইট এবং মোবাইল বোষ্টারসহ সার্বিক অত্যাধুনিক গোয়েন্দা প্রযুক্তি যারকাভী শহীদ রহ. এর পেছনে লাগা ছিল।

এদিকে আফগানিস্তান ও ওয়াজিরিস্তানের পরিস্থিতি দেখুন- মার্কিন ড্রোন বিমান দিন-রাত এক করে আল-কায়েদা সদস্যদের পেছনে লেগে রয়েছে এবং প্রতিদিন সেখানে শাহাদাতের ঘটনা ঘটছে। কিন্তু হিযবুল্লাহ বা মুকতাদা আল-সদরের মাহদী মিলিশিয়ার ব্যাপারে কি কেউ কখনো শুনেছেন যে, তারা কখনো মার্কিন ড্রোন বিমানের বোম্বিংয়ের শিকার হয়েছে ??!! তাদের সাধারণ কর্মসমূহকে দাজ্জালী মিডিয়া অনেক সাজিয়ে গুছিয়ে বাড়িয়ে জনসমক্ষে পেশ করে। সংবাদ পড়ে মনে হয় যে, তারা আমেরিকা ও ইসরায়েলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে আল-কায়েদার বড় বড় অপারেশনগুলিকে গোপন বা নাইন ইলেভেনের মত ঘোলাটে করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। ইহুদী সংগঠনগুলো বিষয়টিকে মিডিয়াতে এমনভাবে প্রকাশ করে, যাতে জিহাদী অপারেশানের ফলাফলসমূহকে পর্দার আড়ালে ঢেকে রাখা যায়। হাসান নাসরুল্লাহ হচ্ছে সেই ব্যক্তি; যে আল-কায়েদার জনপ্রিয়তাকে হ্রাস করার হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। যাতে আরবদের থেকে দেওয়া কোটি কোটি ডলার আল-কায়েদার কাছে না পৌছে যায়।

হিযবুল্লাহ এবং মুকতাদা আল-সদরের মাহদী মিলিশিয়ার ব্যাপারে জ্ঞাত ব্যক্তিদের অন্তরে এ সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নেই যে, এদেরকে আমেরিকা ও ইসরায়েলের পক্ষ থেকে দাড় করানো হয়েছে। এর মাধ্যমে এ দাজ্জাল শক্তিদ্বয়ের যে উপকার হয়েছে, তা সবারই জানা। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষের জন্য যে তথ্যটি টেনশানের কারণ, সেটি হচ্ছে এই দুই গ্রুপের প্রতি ইরানের সার্বিক সহযোগীতা।

ইরানে অবস্থিত ইহুদীদের নিদর্শনসমূহ... নাকি অন্য কিছু...

এর উত্তরে দু'টি কথা বলা যায় :-

এক- ইরান কর্তৃক পররাষ্ট্রবিষয়ক সার্বিক পলিসি একজন ইহুদী (ইরানী) নির্ধারণ করে। দুই- নয়তবা ইরানী সরকার ইসলামী বিশ্বের ব্যাপারসমূহকে ইসলামী দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে শীয়াদৃষ্টিতে দেখে থাকে। আর এ বিষয়টি সামনে রেখেই তারা পররাষ্ট্রবিষয়ক পলিসি তৈরী করে থাকে। তারা কখনোই চায়না যে,

কোন সুন্নী সংগঠন পৃথিবীর কোন অঞ্চলে শক্তিশালী হয়ে উঠুক। যদ্দরুন তাদের অধিকাংশ পলিসিই ইহুদীদের সহযোগীতার কারণ হয়ে দাড়ায়। আর এ কারণেই মনে হয়- জিয়াউল হকের শাসনকালে পাকিস্তানে আইএসআই'এর সফলতাসমূহ ইরানের কখনোই ভালো লাগেনি। বিস্তারিত জানার জন্য সৌদি আরব, ফিলিস্তীন, ইরাক, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের ব্যাপারে ইরানের পলিসিগুলো অধ্যয়নই যথেষ্ট। আপনি যদি বর্তমান ইরানের দৈনন্দিন জীবন-যাপন, অর্থনীতি এবং সেনাবাহিনীর বর্তমান পরিস্থিতি লক্ষ করেন, তাহলে ইহুদী নিদর্শনগুলো তাতে স্পষ্ট লক্ষ করতে পাবেন। আপনাকে যদি বলা হয়- ইরানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ হচ্ছে ইহুদী গুপ্ত সংগঠন ফ্রেমেসনের নেতৃস্থানীয় সদস্য, তাহলে বিস্ময়ে হয়ত আপনি মাথায় হাত দিয়ে বসবেন !!!

এছাড়াও জেনে রাখুন... আরো কিছু তথ্য...

ইরানের জাতীয় প্রতীক কি ?? আপনি ইরানের পতাকায় তাকালে দেখতে পারবেন। এরপর আপনি নিজেই এই পতাকার রহস্য তালাশ করে নিন। প্রতীকটি ইহুদীদের কাছে জাদুতে বড়ই প্রতিক্রিয়াসৃষ্টিকারী। ইরানের সরকারী এয়ারলাইন্সে "শয়তান বুযুর্গে"র ছবি সংযোজিত করা আছে; এটা তাদের সরকারী চিহ্ন, এটা হচ্ছে Dragon। নিচের অংশে মাছের ছবি আর উপরে উলঙ্গ এক বৃদ্ধের ফটো, যার মাথায় রয়েছে ইবলিসের শাহী মুকুট। এটা হচ্ছে তাদের রিযিকদাতা খোদা, যাকে ইহুদীরা খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ সাল থেকে পূজা করে আসছে। ইরানের ব্যাপারে সাধারণত ধারনা করা হয় যে, ওখানে ইসলামী নিয়মে শাসনকার্য সম্পন্ন করা হয়। এটাও দাজ্জাল মিডিয়ারই একটি ধোকা। যে সকল মানুষ ইরানে বসবাস করে এসেছে, তাদের কাছে আপনি ইরানের দৈনন্দিন ইসলামী জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন- যে পরিমাণ অন্যায়-অপরাধ ইরানে করা হয়, আমরা মনে হয়না যে, পশ্চিমা বিশ্বের কোন দেশেও এরকম অন্যায়-অপরাধ করা হয়। তবে হ্যাঁ.. প্রতিটি বস্তুতে ইসলামী লেবেল লাগিয়ে ইরানের বাজারে বিক্রি করা হয়। মদ হোক বা সুদ, পর্দা হোক কিংবা অন্য কিছু, প্রতিটি বস্তুতেই ইসলামী নাম ব্যবহার করা হয়। কথা মনে হয় লম্বা হয়ে গেল! আমার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই ছিল যে, দাজ্জালের ব্যাপারে যতগুলো সহীহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে, এর অধিকাংশের সম্পর্কই ইরানের সাথে।

"নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার".. আন্তর্জাতিক নতুন সিষ্টেম.. নাকি নতুন ধর্ম...

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পূর্বেই ইহুদী ব্যাংকার পৃথিবীতে নতুন এক বিশ্বধর্ম আমদানী করার চেষ্টা করেছিল। এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষে তারা ১৯৯২ সালে "নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার" নামে একটি নতুন সিষ্টেম পৃথিবীবাসীর সামনে প্রনয়ণ করে। বস্তুত এটি আসলে একটি নতুন ধর্ম; যার মূলভীত্তিই হচ্ছে মনোবৃত্তির উপর। আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো নতুন এই ধর্মকে প্রচার করার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। আপনি শুনলে অবাক হবেন- যে, ১৯৯২ সালের পর থেকে কত দ্রুতপর্যায়ে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরে পরিবর্তন এসেছে।

বাহ্যত এই সিষ্টেমটি যদিও পৃথিবীর অর্থনৈতিক (Economical)পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু একে একটি সম্পূর্ণ জীবনবিধানাকারে রূপ দেয়া হয়েছে। চারিত্রিক এবং ধর্মীয় দিক থেকে একমাত্র ইসলামই এর সামনে বাধা ছিল বিধায় ইসলামের ঐ সকল শিক্ষাকে মিটিয়ে দেবার জোর চেষ্টা চালানো হয়; যেগুলি এই নতুন পদ্ধতির সামনে বাধা হয়ে আসতে পারে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সম্পূর্ণরূপে এ নতুন সিষ্টেমের আওতাভূক্ত করাই ছিল আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য। আপনি দেখে থাকবেন যে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য সমাজে কিরূপ তৎপরতা চালানো হচ্ছে- মানুষের পোশাকাশাক, খানা-পিনার টাইম নির্ধারণ, শুয়া এবং ঘুম থেকে জাগা, জীবন পরিচালনা, বিবাহ কখন করা উচিৎ, সন্তান কয়জন হলেই চলবে, মনোচাহিদায় একধাপ এগিয়ে থাকা, যৌন সম্পর্কের প্রচার, কাজ-কর্মের ধাঁচ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে লোকদেরকে টেনে ঐ নতুন ধর্মের প্রবেশ করানো হয়েছে। শুধু এই অনৈসলামিক জীবনবিধানকে পৃথিবীতে চালু করেই ক্ষান্ত হবেনা; বরং এছাড়া অন্য যত ধর্ম পৃথিবীতে আছে, সেগুলোকে জীবনবিধানরূপে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে যথারীতি যুদ্ধের ঘোষনা করা হয়েছে। খাদ্য আমদানী বন্ধ করে দেয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল সুবিধা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং পৃথিবীর সবকটি রাষ্ট্রকে আয়ত্বে এনে নতুন এই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অতপর একে রক্ষা করার জন্য সারা পৃথিবীর সেনাবাহিনীকে ওখানে নিযুক্ত

করা হয়েছে। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রকেই নতুন এ ধর্মের উপর আমল করতে হবে, নতুবা তাকে মৌলবাদী বা প্রাচীণমনা সাব্যস্ত করে পাথরের যুগে পৌছে দেয়া হবে। বিষয়টি বুঝার জন্য ছোট্ট একটি উদাহরণ নিয়ে নিন :-

ইহুদী সংস্থাগুলো কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পানীয়'র ব্যাপারেই ধরা যাক। যেমন- পেপসি, কোকাকোলা, মিনারেল ওয়াটার। এগুলোর ব্যবহার এ নতুন সিষ্টেমে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুতরাং কোন দেশের প্রেসিডেন্ট যদি ডাক্তারী পদ্ধতিতে এগুলোতে গবেষণার পর ক্ষতিগুলো চিহ্নিত করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চায়, তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারবেনা। পুরো দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা লাগলেও আরোপ করে দেবে, কিন্তু জিনিসগুলো অবশ্যই চলতে হবে। তবে তারা বিষয়টিকে ধর্ম প্রচারের বদলে "স্বাধীন আন্তর্জাতিক বিজনেস" নাম দিয়ে জবরদস্তিমূলক পরিচালনা করে থাকে।

আপনি বলতে পারেন যে, পেপসি বা মিনারেল ওয়াটার পান করা তো প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার বক্তব্য ভূল; কারণ ব্যক্তিগতভাবেও জোর করে এগুলো পান করানোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আর তা হচ্ছে মিডিয়ার শক্তি, যা মানুষের মনযোগকে জাদুর মত আয়ত্ব করে রেখেছে। নতুন এ ধর্ম অন্য কোন ধর্মকে প্রশ্রয় দিতে রাজী নয়। তার অগণিত প্রমাণ জীবনের প্রতিটি স্তরে দৃশ্যমান। এমনকি যদি এ ধর্মের সংবিধানে ননইহুদী ধর্মকে বিষপানে হত্যা বা জীবাণুমূলক পানি পান করানোর কথা লেখা হয়, তবুও এ বিষজাতীয় পানীয় বাচ্চাদেরকে পান করতেই হবে। ব্যক্তিগত কোন মতামত এমনকি সরকারী কোন আইনের প্রেক্ষিতেও এর বিরুদ্ধাচারণ সহ্য করা হবেনা। তার জ্বলন্ত প্রমাণ- পোলিও এর ফোটা বা পোলিও টিকা। এই বিষ প্রত্যেক পিতা-মাতা তার সন্তানকে অবশ্যই পান করাতে হবে। কোন সেনাবাহিনী বা রাজনৈতিক কোন পার্টি এর পথে বাধা হয়ে আসতে পারবেনা।

সুদি কারবারী এ ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। সুতরাং টাকা পয়সা লেনদেনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে সুদি সিষ্টেম ছাড়া অন্য কোন সিষ্টেম গ্রাহ্য হবেনা। তবে নামকাওয়াস্তে এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের নাম ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- "হিন্দু ব্যাংক", "খাঁটি রোমান ক্যাথলিক ব্যংক","ইসলামী ব্যংক" ইত্যাদি। তবে শর্ত হচ্ছে- সিষ্টেম অবশ্যই সুদি হতে হবে, শুধুমাত্র পরিভাষা পরিবর্তন করার অনুমতি রয়েছে।

নতুন এ ধর্মে নারীজাতিকে সম্মানের চৌকাঠ থেকে নামিয়ে ফুটপাথ, সড়কে দাড় করিয়ে পুরুষদের মনোচাহিদা পূরণের একমাত্র উৎস করা হয়েছে। পৃথিবীতে নারীজাতির সাথে এখন এমনই ইনসাফ ও আচরণ করা হবে। চায় তারা রাজী থাকুক বা না থাকুক।

নতুন এ ধর্মের স্পষ্ট ব্যাখ্যা ডক্টর "জন কোলেমান" তার Conspirators Hierarchy গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আন্তর্জতিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন ধ্বনি দিয়ে বিভিন্ন নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে এই নতুন ধর্ম মানুষের মাঝে প্রবেশ করাচ্ছে। ডক্টর কোলেমানের বক্তব্য পড়ার পর আপনি অনুধাবন করতে পারবেন যে, "নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার" শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আধুনিক পদ্ধতি নয়; বরং তা পূর্ণ একটি জীবনব্যবস্থা এবং নতুন এক ধর্ম। তিনি লেখেন:-

"এটি এমন একটি আন্তর্জাতিক শাসনব্যবস্থা; যাকে একটি মাত্র আন্তর্জাতিক সরকার শাসন করছে। এটি অনির্বাচিত স্বয়ংসম্পূর্ণ কিছু ব্যক্তিদের আয়ত্বে রয়েছে। সম্ভবত মধ্যযুগীয় জীবনব্যবস্থার আকারে নিজের চাহিদামত বিষয়গুলো নির্বাচিত করছে। নতুন এ আন্তর্জাতিক সিষ্টেমে বিশ্বজুড়ে বসবাসকারীদের সংখ্যা সীমিত থাকবে এবং প্রত্যেক বংশেই সন্তান-সংখ্যার ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হবে। কোন অঞ্চলে বেশি থাকলে যুদ্ধ এবং মহামারী ছড়িয়ে সেখানকার জনসংখ্যা কন্ট্রোল করা হবে। শুধুমাত্র ঐ পরিমাণ বাকী থাকবে, যে পরিমাণ থাকলে ওখানকার সরকার তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে কন্ট্রোল করতে সক্ষম হয়।

কোন মধ্যম স্তর বাকী থাকবেনা। শুধু বিচারক থাকবে এবং প্রজা থাকবে। সমস্ত বিচারকার্য সারা পৃথিবীজুড়ে একই নিয়মে পরিচালিত হবে। এগুলো বাস্তবায়নে একপক্ষীয় সরকারী পুলিশ এবং জাতিসংঘ সেনাবাহিনী পৃথিবীর সর্বস্থানে বিরাজমান থাকবে। তখন পৃথিবীর কোন রাষ্ট্র প্রদেশ ভিত্তিক বিভক্ত থাকবেনা।

সকল কার্যক্রম এক সরকারের সংবিধানমতে পরিচালিত হবে। যে সকল লোক এক সরকারী নিয়মের অনুসারী হয়ে যাবে, তাকে জীবন ধারনের সকল আসবাবপত্র সহজে দিয়ে দেয়া হবে। আর যারা এর বিরুদ্ধাচারণ করবে, তারা ক্ষুধার জ্বালায় মরে যাবে অথবা তাদেরকে দেশদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে দেয়া হবে। যে কেউ চাইলেই তাদেরকে হত্যা করে ফেলতে পারবে। কোনরূপ অস্ত্র-সস্ত্র, হাতিয়ার বা কোন ঝুকিপূর্ণ বস্তু সাথে রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।

শুধুমাত্র একটিই ধর্ম পালন করার অনুমতি বাকী থাকবে। আর সেটা হবে আন্তর্জাতিক আধুনিক আকৃতিতে; যার সূচনা ১৯২০ থেকে শুরু হয়েছিল। শয়তানী, ইবলিসী এবং জাদুবিদ্যাকে সরকারী অধিকার বলে মনে করা হবে। এটা করা হবে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য, যেখানে কাউকে ব্যক্তিগত কোন স্বাধীনতা প্রদান করা হবেনা। এমনকি গণতান্ত্রিক বা রাজতন্ত্রিক বা মানবাধিকারের কোন অনুমতি সেখানে দেয়া হবেনা। প্রত্যেক ব্যক্তির (চায় পুরুষ হোক বা মহিলা) অন্তরে এ বিশ্বাস গেথে দেয়া হবে যে, সে এক সরকারের সৃষ্ট ব্যক্তি। তার উপর একটি পরিচয়পত্র (নাম্বার) লাগিয়ে দেয়া হবে। এই পরিচয় নাম্বারটি ব্রাসেলস-বেলজিয়ামের নেটো কম্পিউটারে সেভ থাকবে। সর্বদায় সে আন্তর্জাতিক সরকারী এজেন্সির তদারকিতে থাকবে।

বিবাহ করাকে অসাংবিধানিক রীতি বলে আখ্যায়িত করা হবে। তখন আজকালের মত বংশীয় যিন্দেগী অবশিষ্ট থাকবেনা- বাচ্চাদেরকে শিশুকালেই পিতা-মাতা থেকে পৃথক করে দেয়া হবে (বাচ্চাদেরকে প্লে-গ্রুপে ভর্তি করা এর সূচনা)। সরকারী তদারকিতে ওয়ার্ডসে তাদের লালন পালন করা হবে। নারীদেরকে স্বাধীন নাইটক্লাবে আসা-যাওয়া করতে বাধ্য করা হবে। যুবক-যুবতীদের সম্পূর্ণ যৌন স্বাধীনতা দেয়া হবে (আমেরিকায় অনুর্ধ্ব-১৯ বৎসরের অবিবাহিত নারীরা প্রতি বৎসর দশ লাখ হারামী সন্তান জন্ম দেয়)। নারীদেরকে নিজে নিজে গর্ভপাত ঘটানোর পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হবে এবং দুই সন্তান হওয়ার পর নারীরা এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করবে। প্রতিটি নারীর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সরকারের কম্পিউটারে বিস্তারিত তথ্য বিদ্যমান থাকবে (নাদেরা সিষ্টেম এসে দাজ্জালের এ কাজগুলিকে আরো সহজ করে দিয়েছে)। দুটি সন্তান হওয়ার পরও যদি কোন নারী গর্ভবতী হয়ে যায়, তবে তাকে জোরপূর্বক গর্ভপাত করানোর জন্য ক্লিনিকে নিয়ে চিরদিনের জন্য বাঞ্জা (গর্ভধারণের অযোগ্য) করে দেয়া হবে।

যুবক যুবতীদের যৌন মেলামেশা ব্যাপক করার জন্য ম্যাগাজিন এবং ন্যাকেড ফিল্ম তৈরী করা হবে। প্রত্যেক সিনেমায় আবশ্যিকভাবে একাংশ ওপেন ন্যাকেড সীন রাখা বাধ্যতামূলক করা হবে। মানসিক শক্তি নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাদী ব্যাপক করে তার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হবে। মানসিক শক্তি কন্ট্রোল করার জন্য এ জিনিসগুলো খাদ্য ও পানীয়র মাঝে লোকদের অজ্ঞানে মিশ্রণ করা হবে (মিনারেল ওয়াটার, পেপসি, কোক ইত্যাদিতে)। সকল শিল্পানী বিষয়সমূহ রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয়া হবে। শুধুমাত্র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বদের আন্তর্জাতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবে। বয়োবৃদ্ধ এবং স্থায়ী রোগীদের জন্য বিষের টিকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হবে। পৃথিবী থেকে অধিকাংশ বৃদ্ধ, কর্মহীন ব্যক্তি এবং খাদ্যের শত্রুদেরকে নিঃশেষ করে দেয়া হবে (যেমন- বৃদ্ধ পিতা-মাতা)। (সূত্র- ফ্রেমেসনারী এবং দাজ্জাল-কামরান রা'দ)

গ্রন্থে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, এর সবই আপনি বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন। যেমন- মহিলাদেরকে স্বাধীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের অপমান করা হচ্ছে। গর্ভপাত ব্যাপকাকার করা হচ্ছে। সকল রিপোর্ট কম্পিউটার রেকর্ডে বিদ্যমান রয়েছে। বয়স্ক পিতা-মাতাকে ঘর থেকে বের করে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে একাকী মৃত্যুর প্রহর গুনতে বাধ্য করা হচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীকে একটি আন্তর্জাতিক গ্রাম বানানোর প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, এর মূল উদ্দেশ্যও তাই যে, সকল নেতৃত্ব একটি মাত্র বিশ্বশক্তির হাতে থাকুক। যাতে বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কম্পিউটার সিষ্টেম চালু করে সকলের উপর সার্বিক নজরদারী করা সহজ হয়। "নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার"এর পর ইহুদী মাল্টি

ন্যাশনাল কোম্পানীও বড় বড় বানিজ্যিক সংস্থা এবং প্রসিদ্ধ কোম্পানীগুলো একে একে কিনতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে ১৯৯৯ সালের পর থেকে অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হয়। উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে আপনি আন্দাজ করতে পারেন যে, নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার হচ্ছে একটি নতুন ধর্ম, যাকে দাজ্জালের অনুসারীরা সারাবিশ্বে পরিচালিত করতে চায়।

১৯৯১ সালের পর থেকে পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রে আপনি পরিবর্তন লক্ষ করতে পারবেন। এরপর ১৯৯৯ হচ্ছে এমন একটি সাল; যার পর থেকে এ কার্যক্রমগুলি আরো দ্রুততার সাথে পরিবর্তন হতে দেখা গেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়- ১৯৯১ সালের পর থেকে দাজ্জাল নিজে তার ইহুদী এজেন্টদের হেদায়েত দিয়ে যাচ্ছে। আর ঐ বৎসরই দাজ্জাল তার এজেন্টদেরকে স্বীয় আত্মপ্রকাশের (অর্থাৎ খোদায়ী দাবীকরণের) সময়কাল ২০০৬-২০০৭ বলেছিল। ফ্রেমেসন এবং মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীগুলোর এ্যাডগুলিতে ৬৬৬ এবং ৭৭৭ এর গাণিতিক বিবরণ খুব বেশি বেশি পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় গবেষকদের দাবী- ৬৬৬ দ্বারা ৬/৬/২০০৬ ইং এবং ৭৭৭ দ্বারা ৭/৭/২০০৭ ইং তারিখ উদ্দেশ্য। গবেষকদের বক্তব্য- ফ্রেমেসন এ তারিখগুলোকে তাদের খোদার আগমনের তারিখ হিসেবে প্রকাশ করছিল।

এ ধারনাগুলো ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের; যারা তাদের নিজেদের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা এবং অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিল। সুতরাং পূরণ হওয়া না হওয়া তো জরুরী নয়। যতদূর অনুভব করা যায় যে, ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত, অতপর ১৯৯৯ সাল থেকে পরবর্তী বৎসরসমূহে পৃথিবী কেমন যেন পরিবর্তিত পরিবর্তিত মনে হচ্ছে। ব্যাপারটি একজন সাধারণ মানুষও টের পেয়ে থাকবেন। কেউ কেউ কথায় কথায় তা প্রকাশও করে- "বর্তমান দুনিয়া অনেক চেঞ্চ হয়ে গেছে", "আগের দুনিয়া এখন আর নেই" ইত্যাদি ইত্যাদি। বরং উপরোক্ত ধারাবাহিকতায় আরো একটি বৎসর অর্থাৎ ২০০৭ সালকে আপনি যুক্ত করতে পারেন। ২০০৭ সালের পর থেকে হক্ব ও বাতিলের মধ্যকার যুদ্ধ এক নতুন মোড় নিয়েছে। গবেষকদের ব্যাখ্যাগুলো যদি সঠিক মনে হয়, তবে মনে মনে প্রশ্ন জাগে যে, তাহলে দাজ্জাল নির্ধারিত বৎসরগুলোতে কেন বের হলনা ???!!!

এর সঠিক জবাব হচ্ছে যে- কানা দাজ্জাল ঐ সময়ই বের হতে পারবে, যখন আল্লাহ পাক তা চাইবেন। কানা দাজ্জালের এই ক্ষমতা নেই যে, স্বীয় ক্ষমতায় সে বের হয়ে যাবে। তবে এতটুকু ব্যাপার অবশ্যই বুঝে আসে যে, বাস্তবেই যদি দাজ্জাল নিজে সকল প্রকার রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সিষ্টেমকে মনিটরিং করে থাকে এবং এর কন্ট্রোলও তার হাতে থাকে, তবে অবশ্যই তার আত্মপ্রকাশের বৎসরটি অনুসারীদের কাছে বলে থাকবে। সুতরাং হতে পারে ১৯৯১ সালের পর থেকে সে তার আত্মপ্রকাশকে সর্বশেষ প্রস্তুতি হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু এই মিথ্যা খোদা কেন প্রকাশ হয়নি ??!! তার সামনে বাধা হয়ে থাকা বাহ্যিক উপকরণটি কি??!! অথচ "শয়তানী মডার্নাইযেশান" এর অনুসারীরা তাকে স্বাগতম জানানোর জন্য গায়ের চাদর পর্যন্ত বিছিয়ে রেখেছিল। এই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমাদের জানতে হবে যে, দাজ্জাল তার আত্মপ্রকাশের পূর্বে দুনিয়াকে কোন অবস্থায় দেখতে চায়!!!

দাজ্জাল কেমন দুনিয়া চায়...

মুহাম্মদ মুস্তফা সা. এর উম্মতের বিরুদ্ধে দাজ্জাল হচ্ছে ইবলিস শয়তানের সর্বশেষ ভরসা। ইবলিস তার মাধ্যমে দ্বীনে মুহাম্মদীকে মিটিয়ে বিশ্বময় ইবলীসি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যেহেতু দাজ্জাল নিরাশ্রয় শক্তিসত্তেও সন্দেহ এবং শংকার দুলাচলে দুদোল্যমান; তাই সে তার আত্মপ্রকাশের পূর্বে এমন সকল শক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়ে চায়, যারা পরবর্তীতে তার পথে কাঁটা হয়ে দাড়াতে পারে। সমগ্র পৃথিবীর খনিজ সম্পদ, খাদ্যসম্পদ, পানীয়সম্পদ এবং সেনাশক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে সে তার কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সেনাবাহিনীর দিক দিয়ে কোনরাষ্ট্রই তার প্রতিপক্ষ হবেনা। সকল দেশের সরকারই তার তৈরীকৃত "নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার" সিষ্টেমকে সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করে থাকবে। সমস্ত সরকারই তার কল্পিত বানিজ্যিক পদ্ধতি

এবং তার নিজস্ব সংস্থা বিশ্বব্যাংক এবং বিশ্ব বানিজ্যিক সংস্থার সাথে সম্পূর্ণরূপে লেনদেন করে থাকবে। আক্বীদাগত দিক থেকে সারাবিশ্ব তার গণতান্ত্রিক সরকারী পদ্ধতির উপর পূর্ণ আস্থাশীল থাকবে। বিশেষত মুসলমানগণ তাদের অন্তর থেকে ইসলামী খেলাফতের আকাংখা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবে। তারপরও যদি মুষ্টিমেয় কিছু লোকের অন্তরে এর আকাংখা থাকে, তবে তারা তা বাস্তবায়নের অক্ষম থাকবে।

পশ্চিমা বিশ্ব হচ্ছে দাজ্জালের জন্য নিজের বাড়ীর মত। ইবলিসী শাসনব্যবস্থা যাই হোক- (Socialism)বা (Capitalism)হোক। বিশ্ব একপ্রান্তশীল হোক বা ভিন্নপ্রান্তশীল। তাতে কিছুই যায় আসেনা। মোটকথা- সিষ্টেম তার দেয়া হওয়া চাই। দাজ্জালের মূল এন্টি হচ্ছে- ইসলামী জীবনব্যবস্থা এবং জিহাদী শক্তি। ১৯৯১ সালের পর পৃথিবীর বুকে এমন একটি বিপ্লবী ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, যার উপস্থিতিতে দাজ্জাল কখনই পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করার দুঃসাহস দেখাবেনা। দুনিয়ার যে কোন প্রান্তরে ইসলামী জীবনব্যবস্থার কথা হয়, তার মাধ্যমে ইবলিস এবং দাজ্জালের আত্মা ফেটে পড়ার উপক্রম হয়। পক্ষান্তরে যদি কোথাও ইসলামী শাসনব্যবস্থা বাস্তবায়িত হয়ে যায়, তবে তো তাদের সকল আশা-আকাংখা, কার্যক্রম এবং সার্বিক প্রচেষ্টা বাণ্ডাল হয়ে যাবে।

১৯৯৬ সালে তালেবানরা রক্তের বন্যা ঝরিয়ে জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহর মাধ্যমে আল্লাহর যমিনে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তালেবানদের ইসলামী শাসনব্যবস্থা বিশ্বজুড়ে দাজ্জালের সিষ্টেম পূজাকারীদের জন্য মৃত্যুর পয়গাম ছিল। দাজ্জাল জানত- যে, ইসলামী ব্যনিজ্যিক ব্যবস্থার উপকারিতা সুদের জঘন্য কারবারীতে নিমজ্জিত ব্যক্তিরা যদি দেখে ফেলে, তাহলে তারাও নিজেদের এলাকায় ইসলামী সিষ্টেম চালু করার আন্দোলন শুরু করে বসবে। স্বাধীনতা এবং সমাধিকারের কথা বলে নারীজাতিকে লাঞ্চিত অপদস্থ করা হয়েছিল অতপর তালেবানরা নারীদেরকে সম্মানের পালংকে বসিয়েছিল। এমনকি ব্রিটিশ নারীরাও তা স্বতস্ফূর্তভাবে মেনে নিয়েছিল এবং তালেবানদের আচরণ দেখে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইবলিস শয়তান এবং দাজ্জালের সাজানো ষ্টেজগুলি তা দেখে কাঁপতে শুরু করেছিল। শুরুতে ইবলিসের আশা ছিল যে, অন্যান্য মুসলিম সরকারদের মত তাদেরকেও স্বীয় তেলেস্মাতির বোতলে আবদ্ধ করে ফেলবে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে দাজ্জাল তার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে দিয়ে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মোহাম্মাদ উমর (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন)কে বশ করার চেষ্টা করেছিল। সার্বিক সহযোগীতার লোভ, যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তানকে নতুন করে নির্মান এবং সরকারী ভবনসমূহের পূণর্নির্মানের জন্য অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিল। জাতিসংঘের দূতগণ একের পর এক শহীদদের ভূমিতে অপমান, লাঞ্চিত ও বিতাড়িত হয়ে কুকুরের মত ঘুরাঘুরি করছিল- ঠিকযেমনভাবে মুসলিম রাষ্ট্রের সরকারী কর্মকর্তাগণ ইউরোপ-আমেরিকায় গিয়ে করে থাকে। পশ্চিমাবিশ্বের পুরুষজাতি যে নারীদেরকে কখনো সম্মানের চোখে দেখেনি, তালেবান তাদেরকে আপন বোনের মত মনে করে পবিত্র হিজাবের দুপাট্টা দিয়ে স্বীয় পবিত্র ভূমিতে নামিয়েছিল। জাতিসংঘের কতিপয় অহংকারী নেতৃবর্গ সেখানেও তাদের নারীদেরকে উলঙ্গ রাখার জন্য বাধ্য করলে তালেবানরা তাদের ভাই হিসেবে এ অপমান মুখ বুঝে সহ্য করেছিল।

আলোচনা-পর্যালোচনার পর দাজ্জালী শক্তিরা নিজেদের উত্তর সংঘের মাধ্যমে কাবুলের উপর চড়াও হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখানেও তাদের সকল তদবীর ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল এবং ব্যর্থ হয়েই তারা ওখান থেকে প্রস্থান করেছিল।

দাজ্জালী শক্তির তদবীর সমূহ ১৯৯৮ সালে এসে একত্রিত হয়। তারপরও তাদের প্রচেষ্টা একে একে ব্যর্থ হতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে ইসলামী শাসনব্যবস্থার সুফলসমূহ আস্তে আস্তে পৃথিবীবাসীর সামনে প্রকাশ হতে শুরু করে। উলামায়ে কেরাম কিতাবের পাতায় বন্দি থাকা ইসলামী শাসনব্যবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসছিল। পৃথিবীর বড় বড় ব্যবসায়ীবৃন্দ ইসলামী জীবনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার জন্য আফগানিস্তানের পথে পাড়ি জমাচ্ছিল। দ্বীনে মুহাম্মাদীর উম্মতগণ দলে দলে হক্কের রাস্তায় চলার জন্য আফগানের মাটিতে হিজরত করছিল। প্রকৃত বাস্তবতা ধীরে ধীরে মানুষের অনুধাবন হচ্ছিল। আর এদিকে ইবলিস শয়তান নিরাশমনে তার সর্বশেষ চক্রান্তটি ১৯৯৯ সালে সম্পন্ন করে এবং

পৃথিবীর জাগায় জাগায় তার অনুসারীদের পূণরায় ফিট করতে শুরু করে। তন্মধ্যে তার সর্বপ্রথম পদক্ষেপ ছিল পারভেজ মুশাররফের হাতে পাকিস্তানের নেতৃত্ব তুলে দেয়া। তালেবানকে খতম করে তার শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি সে ১৯৯৮ সালেই সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু তার আসল চেষ্টা ছিল- প্রথমে আরব মুজাহিদীনকে আফগান ভূখন্ড থেকে কৌশলে বহিস্কার করা। তা না হলে তার দ্বিতীয় পরিকল্পনাটিও প্রথমটির মত আরব মুজাহিদীনের বীরত্বগাথা অপারেশান আর তালেবানদের সর্বাত্মক সহযোগীতার মাধ্যমে পূণরায় বাণ্ডাল হয়ে যাবে। ১১ সেপ্টেম্বরে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে হামলা মূলত দাজ্জালের সকল স্বপ্নকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন' তার (Victory without War)গ্রন্থে উল্লেখ করেন- "১৯৯৯ সালের মধ্যে আমেরিকা সারাবিশ্বের শাসক হবে। এ মহা বিজয় কোন যুদ্ধ ছাড়াই তাদের অর্জিত হবে। এরপর নেতৃত্বের বিষয়টি "মাছীহ" (দাজ্জাল) নিজে এসে সামলিয়ে নেবেন। মনে হয়- উপরোক্ত সাল পর্যন্ত মাছীহের জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন ছিল। মার্কিনীদের দায়িত্ব শুধু ব্যবস্থাপনাগুলো সম্পন্ন করা। এরপরের নেতৃত্ব মাছীহ নিজেই চালাবেন। (ভিকটোরী উইদাউট ওয়ার)

আমেরিকা ও ইউরোপে অজস্র টিভি-চ্যানেল ও রেডিও ষ্টেশান এমন রয়েছে- যারা দিন-রাত মাছীহ (কানা দাজ্জালের) আগমণের ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো শুনিয়ে জনসাধারণকে মুসলমানদের বিরোদ্ধে যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করছে। এমনকি সকল মার্কিন প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত ব্যাপারটি নিয়ে খুবই আশাবাদী যে, তাদের সামনে প্রতিশ্রুত মাছীহ (কানা দাজ্জাল) আসবেন এবং ইসলাম ধর্মকে নিঃশেষ করে বিশ্বময় শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন।

উল্লেখিত বিষয়টি সামনে রেখে মার্কিন সেনা অফিসারগণও তাদের কার্যক্রমগুলো সাজাচ্ছেন। একবার আমেরিকা প্রবাসী একজন পাকিস্তানী মার্কিন সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে যায়। সমস্ত বিভাগে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হওয়ার পর যখন সে ইন্টারভিউয়ের জন্য যায়। তখন ইন্টারভিউ অফিসারগণ তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, ইমাম মাহদীর ব্যাপারে তোমার মতামত কি ? চিন্তা করেন- মার্কিন সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক একজন মুসলমানকে কি ধরনের প্রশ্ন করা হচ্ছে !! বর্তমান যুগে প্রায় সকল ধর্মাবলম্বীগণই কোন একজন মাছীহের আগমনের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে। পাশাপাশি ধর্মীয় গুরুগণও তাদের অনুসারীদেরকে ভয়ানক যুদ্ধসমূহের জন্য প্রস্তুত করছে। আর এদিকে মুসলমানদের অযোগ্য নেতৃবর্গ তাদেরকে যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে ঘরে সারাদিন টিভির সামনে বসে বসে সময় কাটানোর তালীম দিচ্ছে।

বাস্তবতা সকলের চোখের সামনে। কাফেরদের জোটবদ্ধ সেনাবাহিনী ইরাক ও আফগানিস্তানে মুসলামনদের উপর আগ্রাসী হয়েছে। বিপরীতে তালেবান এবং মুজাহিদীন মুসলমানদের পক্ষথেকে ইসলাম-প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করছে। দাজ্জালের বিশ্বময় শাসন ও খোদায়ী প্রতিষ্ঠার পথে এখন শুধু একটিই বাধা। জিহাদের এ শক্তিকে খতম করে দাজ্জালের জোটবদ্ধ সৈনিকদল দাজ্জালের জন্য নতুন ধর্মকে বিশ্বজুড়ে বাস্তবায়িত করে দেখাতে চায়।

নতুন এ ধর্মের জন্য কিভাবে রাস্তা প্রশস্ত করা হয়েছে! এবং দাজ্জালের আগমনের জন্য কিরূপ প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে! মনযোগ দিয়ে একটু চিন্তা করুন:-

"আমেরিকার চাওয়া-পাওয়া হচ্ছে- জাতিসংঘের তত্বাবধানে এমন বাহিনী গঠন করতে সাহায্য দেয়া হোক, যারা দ্রুত এ্যাকশান নিতে সক্ষম। এ বাহিনীর সংখ্যা প্রাথমিক পর্যায়ে বারটি দেশ কর্তৃক ষাট হাজার ঘোষনা করা হয়েছে।" (রচনা- নেগার জোসেফ নায়ে, সাবেক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী, নিউয়োর্ক টাইমস-২ ফেব্রুয়ারী-১৯৯২ ইং)

"বাস্তবেই যদি তারা বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে না লালবাহিনী লাগবে, না মার্কিন সেনাবাহিনীর দরকার পড়বে। বরং আমাদের নীল রঙ্গের হেলমেট পরিহিত একাধিক রাষ্ট্র কর্তৃক জোটবদ্ধ বাহিনীর শক্তি দরকার। তারাই একমাত্র বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।" (নিউয়োর্ক টাইমস-১১

ফেব্রুয়ারী-১৯৯২ ইং)

উল্লেখ্য যে, ইহুদীরা নীল রঙকে দাজ্জালের উর্ধ্বশাসনের প্রতীক মনে করে থাকে।

"ব্লেক ওয়াটার" বাহিনী...

এটি একটি প্রাইভেট সেনাদল। মার্কিন সরকার আফগানিস্তান ও ইরাক ছাড়াও পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রেই এর সফল অভিযান ও দক্ষতা প্রত্যক্ষ করেছে। ১৯৬৬ সালে মার্কিন এক শিল্পপতি এবং নেভি গ্রুপের সাবেক সেল 'আর্ক প্রিন্সের যৌথউদ্যোগে বাহিনীটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জনসাধারণের ধারনা- এ বাহিনীর মূল ডাইরেক্টর হচ্ছে ডিক চেনি এবং ডোনাল্ড রামসফেল্ড। আর্ক প্রিন্সের এ ব্যক্তিগত সেনাক্যাম্পটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাইভেট সেনাকেন্দ্র। স্থানটি আমেরিকা শাসিত "কেরোলিনা" অঞ্চলের ৭০০০ হেক্টর যমি নিয়ে বিস্তৃত বিশাল এলাকা। বর্তমানে ব্লেক ওয়াটারের ২৩০০ আর্মি সদস্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে দায়িত্ব পালন করছে। পক্ষান্তরে আরো বিশহাজার সদস্য তাদের হাতে এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। ব্লেক ওয়াটার বাহিনীর কাছে বিশটিরও অধিক রণতরী বিদ্যমান রয়েছে, যারমধ্যে "গানশপ হেলিকপ্টার" উল্লেখযোগ্য। "জন নিগ্রো পান্ডে এবং খলীল যাদের প্রাইভেট সিকিউরিটির দায়িত্বও ব্লেক ওয়াটার সদস্যরা পালন করে থাকে। এছাড়াও অধিকাংশ দূতাবাসের নিরাপত্তার বিষয়টিও এদের দায়িত্বে। ৩১ মার্চ ২০০৪ ইং তারিখের পূর্বে ব্লেক ওয়াটারকে সম্পূর্ণ গোপন মনে করা হত। এমনকি আমেরিকার উচ্চপদস্থ নেতৃবর্গের কাছেও এর কোন জ্ঞান ছিলনা যে, মার্কিন সরকার সন্ত্রাসের বিরোদ্ধে যুদ্ধের জন্য সকল দায়িত্ব ডলারের বিনিময়ে এক প্রাইভেট সেনাদলের কাছে হস্তান্তর করেছে। কিন্তু ৩১ মার্চ ২০০৪ ইং তারিখে ইরাকের ফাল্লুজা শহরের একটি ঘটনার মাধ্যমে এ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান হয়।

ব্লেক ওয়াটারের চার সদস্যকে ফাল্লুজাবাসী বোমা মেরে হত্যা করে ফেলে। এরপর এলাকাবাসী লাশগুলি নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় আনন্দ মিছিল শেষ করে ফুরাত নদীর একটি ব্রীজের উপর এগুলোকে ঝুলিয়ে রাখে। ব্লেক ওয়াটারের সদস্যগণ মার্কিন সরকারের কাছ থেকে পয়সার বিনিময়ে কোন অভিযানের কন্ট্রাক্ট নেয় এবং পরে তারা নিজেরা এখান থেকে ফায়দা লুটে। এর একটি পদ্ধতি এমন- পয়সার বিনিময়ে সৈনিককে আমেরিকায় ভর্তি করা হয়। অতপর যুদ্ধের এলাকাগুলোতে এদেরকে মার্কিন সেনাবাহিনীর সাথে

পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এদের সার্বিক নিয়ম-কানূন মার্কিন সেনবাহিনী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হয়। তারা এতই সতর্ক যে, মার্কিন সরকারকে পর্যন্ত তারা স্বীয় বাহিনীর নিহতের সংখ্যার ব্যাপারে জ্ঞাত করেনা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি- আমেরিকার বাইরের কোন রাষ্ট্র থেকে কোন সৈনিককে তারা পয়সার বিনিময়ে কিনে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যকে তার সামনে ব্যক্ত করে। যেমন- আফগানিস্তানে তারা আফগান ন্যাশনাল আর্মিকে পয়সার বিনিময়ে নিয়ে নিয়েছে। রোজ হিসেবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়া হয়। ব্লেক ওয়াটার পাকিস্তানে কয়েক বৎসর যাবত কাজ করছে এবং স্থানীয় পাকিস্তানীদেরকে ভাড়ার বিনিময়ে কিনে নিয়ে তাদের দিয়ে এলাকায় কাজ করাচ্ছে।

মিডিয়া... দাজ্জালের বড় হাতিয়ার...

عن حذيفة رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أتخوف عليكم أن تؤثروا ما تـرون علـى مـا تعلمـون ، وأن تضلوا وأنتم لا تشعرون. (ابن أبي شيبة:7\503) وفي إسناده من لم يسم.

"হযরত হুযায়ফা রা. বলেন- তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচে' বেশি যে জিনিসের ভয় করছি তা হচ্ছে যে, তোমাদের জানা থাকা সত্তেও তোমরা ঐ বস্তুকে প্রাধান্য দেবে যা তোমরা প্রত্যক্ষ করবে এবং তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এমতাবস্থায় যে তোমরা টেরও পাবেনা। (ইবনে আবী শাইবা- ৭/৫০৩)

১৮৯৭ সালে সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত শহর "ব্যাল"এ তিনশত ইহুদী (বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও গবেষক) হির্টযেলের নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে সারাবিশ্বের উপর কর্তৃত প্রতিষ্ঠা করতে একমত হয়। সিদ্ধান্তটি ঊনিশটি প্রোটোকোলের সমন্বয়ে পৃথিবীবাসীর সামনে আত্মপ্রকাশ করে। ওখানে যে সকল স্থান এবং বস্তুর উপর করায়ত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোর দেয়া হয়, মিডিয়ার মাধ্যমে সেগুলি নিম্নোক্ত ধাচে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়:-

"আমরা মিডিয়ার ঘাড়ে আরোহন করে তার লাগামকে সর্বদায় আমাদের শাসনে রাখবো। আমাদের শত্রুদের আয়ত্বে এমন কোন শক্তি বা সংবাদকে থাকতে দিবনা; যার মাধ্যমে তারা সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি শত্রুদেরকে আমরা এমন কোন অবস্থানে ছেড়ে দিবনা যে, আমাদের নিরীক্ষা ব্যতিতই তারা কোন তথ্য লোকদের কাছে পৌছাতে পারবে। আমরা এমন সংবিধান সৃষ্টি করব যে, কোন প্রকাশক বা প্রেসকর্তাদের জন্য আমাদের সম্যক অনুমতি ব্যতিত কোন তথ্য ছাপাতে অপারগ হয়ে যায়। আমাদের অধীনে এমন সব তথ্য ও সংবাদ থাকবে, যার মাধ্যমে আমরা শত্রুদের থেকে সর্বদায় নিরাপদ স্থানে অবস্থান করব। চায় শত্রুদের এ দলগুলি গণতান্ত্রিক পার্টি হোক কিংবা কোন সংগ্রামী দল হোক। এমনকি আমরা এমন সব সংবাদের বাহক হব, যার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর সব দেশের সকল স্তরের (সরকারী বেসরকারী) লোকদের আক্রমনের শিকার হবনা। আমর এমন সব সংবাদ মানুষের সামনে পেশ করব; যার মাধ্যমে জাতিগত, গোত্রীয় এবং সকল স্তরের সর্বসাধারণ তা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। আমরা এমন সব বৈজ্ঞানিক, এডিটর এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদেরকে আয়ত্বে রাখব, যারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য এগিয়ে থাকবে (আমেরিকা ও ভারতের প্রতিরক্ষায় বিবৃতি প্রদানকারীগণ আপনার চোখের সামনেই বিদ্যমান) এবং তারা ভয়ানক সব অপরাধের রেকর্ডধারী হবে। সংবাদ মাধ্যমগুলোকে আমরা এজেন্সিদের দ্বারা কন্ট্রোলে রাখব। যারফলে পৃথিবীবাসীকে আমরা যে রঙ দেখাতে চাইব, তাই পৃথিবীবাসী দেখতে পারবে।"

ইহুদীরা যে সকল প্ল্যান ওখানে করেছিল, তার সবগুলোই বাস্তবায়ন করে ছেড়েছে। পৃথিবীর কোন তথ্য বা ছোট্ট কোন সংবাদও ইহুদীদের অনুমতি ব্যতিত মিডিয়ায় প্রকাশ বা সংবাদের অংশ হতে পারেনা। বিশ্বময় সংবাদমাধ্যম, ইমেইল, টিভি চ্যানেল তাদেরই প্রতিপালিত এজেন্সিদের থেকে সংবাদ গ্রহণ করে থাকে। পৃথিবীর বিখ্যাত সংবাদ মাধ্যম রয়টার্স, এপি এবং এএফপি হচ্ছে ইহুদীদের মালিকানায়। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছে রয়টার্স। মূল প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে "জোলিস রয়টার্স"। ১৮১৬ সালে সে জার্মানীর এক ইহুদী

পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে। আপনি একটু ন্যায়সঙ্গত বিচার করুন- যে ইহুদীদের ব্যাপারে বিশ্বের দু'টি বড় ধর্ম (খৃষ্টধর্ম এবং ইসলাম) মিথ্যাচার, ধোকা, প্রবঞ্চনা, তুহমত এবং নবীদের মত পবিত্র ব্যক্তিদেরকে নির্মমভাবে হত্যার বিষয়ে একমত পোষন করেছে, আজ সারাবিশ্বের শিক্ষিত শ্রেনীর লোকেরা পর্যন্ত সেই ইহুদী কর্তৃক রয়টার্সের সংবাদকে ওহীতুল্য মনে করে থাকে। মিডিয়ার মাধ্যমে যেভাবে তথ্য প্রচার করা হয়, সারাবিশ্বের মানুষ বিনাদ্বিধায় তাই গ্রহণ করে নেয়।

ধর্মীয় লোকদের ব্যাপারে প্রোপাগান্ডা হোক বা মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার, ইহুদীদের বড়ত্ব বর্ণনা করা হোক বা মুসলামানদেরকে মুর্খ ও অপরিমার্জিত সাব্যস্ত করা হোক- শিক্ষিত মুসলমানগণ ঐ সংবাদগুলোকেই সত্য বলে মনে করে এবং ওটাই তাদের মতামত হয়ে যায়। বিবিসি-ও রয়টার্স থেকেই সংবাদ গ্রহণ করে থাকে। এই রয়টার্সই মুসলমানদেরকে ঈমান এবং বিশ্বাসের স্তর থেকে বের করে সন্দেহ ও দুদোল্যতার অভ্যাসী বানিয়েছে। ইসলাম ও মুসলিম সংগঠনগুলোর ব্যাপারে মনের ভেতরে সন্দেহের স্থান দেয়া বিবিসির পক্ষ থেকে বিশেষ এক তুহফা, যা শ্রবণকারীদেরকে কাছে প্রতিনিয়ত সরবরাহ করে থাকে।

সন্দেহের কিছু নমুনা...

"ইসলামাবাদে ব্লোম ব্লাষ্ট হয়েছে..."। এখন পর্যন্ত কোন সংগঠন এর দায় স্বীকার করে নেয়নি, তারপরও মিডিয়ায় প্রচার করে দেয়া হয় যে, "ইসলামপন্থীদের পক্ষ থেকে এটি ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে"। "সোয়াতে নিরাপত্তাচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যার মাধ্যমে সর্বসাধারণের মনে শান্তির অনুভূতি বিরাজ করছে। কিন্তু কতিপয় সরকারী ব্যক্তিবর্গ এটিকে সরকারের ব্যর্থতা বলে মত প্রকাশ করেছেন। সন্দেহ করা হচ্ছে- এর মাধ্যমে তালেবানদের শক্তি অর্জিত হবে এবং পাঞ্জাবে অবস্থিত চরমপন্থীরা-ও পরবর্তীতে এ ধরনের দাবী তুলতে পারে।"

"একজন মহিলার লাশ সড়কের কিনারা থেকে উদ্ধার হয়েছে। হত্যার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন হদিস পাওয়া যায়নি। সন্দেহ করা হচ্ছে- যারা মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য সবসময় নিষেধ করে থাকে, ঘটনাটি তাদের পক্ষ থেকে ঘটানো হয়েছে।"

"মনে করা হচ্ছে"-"সন্দেহ করা হচ্ছে"-"ধারণা করা হচ্ছে" কথা গুলো বলে তারা যার উপরই থুথু নিক্ষেপ করতে চাইছে, সহজেই নিক্ষেপ করে দিচ্ছে। আর যারা সংবাদ দেখে এগুলো শুনছে, তাদের মনও চাইছে যে, সংবাদটিকে অপরের কাছেও প্রচার করা হোক। তাই সে বন্ধুবান্ধবদের কাছে, সহকর্মীদের কাছে এবং লোকদের মাঝে এগুলো বলে বেড়াতে থাকে। অথচ উচিত ছিল- এগুলো নিয়ে আরো গবেষণা, নিরীক্ষা ও যাচাই অব্যাহত রাখা। কিন্তু তা না করে ঐ ইহুদী সংস্থার সংবাদ মাধ্যমগুলো থেকে যাই শুনে, সত্য হোক কিংবা মিথ্যা, মস্তিস্ক সেটাকেই সত্য বলে মেনে নেয় এবং সেটাই তার সারাদিনের মুখের খোরাক হয়ে যায়।

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার" ধ্বংস... বাস্তবতা কি ??

যে সকল লোক ১১ সেপ্টেম্বরের হামলাকে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র বলে বিশ্বাস করে থাকে, এরও মূল কারণ হচ্ছে- মিডিয়া। সংবাদ মাধ্যমগুলো বিশ্বের সকল অনিষ্টকর বিষয়, অশ্লীল কাজকর্ম, কাপুরুষতা এবং অপরাধ প্রচারের বিষয়টি পাকিস্তান এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর ঘাড়ে চাপিয়ে ইসলামপন্থীদেরকে খাদের কিনারায় নিক্ষেপ করেছে। পক্ষান্তরে সর্বপ্রকার কল্যাণকর বিষয়, বড়ত্ব এবং বাহাদুরী- পশ্চিমা বিশ্ব এবং হিন্দু-সমাজে বিদ্যমান বলে প্রচার করছে। মনে হয়, কোন মুসলমানের দুঃসাহসই নেই যে, এ জাতিয় কোন অপারেশান তারা চালাতে পারবে। চিন্তাটি আপনি মিডিয়ার রোগে আক্রান্ত সকল ব্যক্তিদের মুখে সচরাচর শুনে থাকবেন। যে সকল লোক ১১ সেপ্টেম্বরের হামলাকে মুসলমান মুজাহিদীনের হামলা বলে মেনে নেয়না, তাদের প্রকৃত অভ্যাসই হচ্ছে এটা- যে, তাদের ব্রেইনের ভেতরে এ চেতনা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কোন

মুসলমান এ ধরনের বিশাল আক্রমনের কোন যোগ্যতাই রাখেনা। এ সকল ব্যক্তিবর্গ দুনিয়াকে এখনও আশি বৎসরের দৈওয়ালী দুনিয়া মনে করে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই নেই যে, উম্মতে মুহাম্মদী এখনও জাগ্রত, বাজী এখন তাদের হাতে।

আরেকটি কারণ হচ্ছে- এসকল লোকেরা রণাঙ্গন থেকে বহুদূর। জিহাদের ময়দান থেকে তাদের কাছে কোন সংবাদ পৌছতে পারেনা। বরং তাদের জ্ঞানের সকল মাধ্যম হচ্ছে টিভি রিপোর্ট, পত্রপত্রিকা, রেডিও খবর ও সংবাদমাধ্যম। পাশাপাশি তাদের কাছে না ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার সম্পর্কে কোন তথ্য আছে, না পেন্টাগনের কোন গোপন খবর আছে। শুধু এতটুকুই জানে যে, এগুলো শুধু দু'টি বিল্ডিং ছিল। প্রকৃতপক্ষে এগুলি ছিল দু'টি বিশাল মূর্তি, যাকে পুরোবিশ্ব "রিযিকদাতা" মেনে পূজা করে আসছিল, এগুলি ছিল ইবলিসের কোটি বৎসরের মেহনতের ফসল, যাকে বিগত যুগে সে বাস্তবতায় রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কতিপয় আল্লাহর বান্দাগণ এগুলিকে মুহুর্তের মধ্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। তথ্যগুলি স্বয়ং ইহুদী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বরাতে পশ্চিমা মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়ানো হয়েছে। অতপর মুসলিম সংবাদকর্মীগণ একে গভীর পর্যায়ের গবেষণা মনে করে প্রচার করতে থাকে। পাশাপাশি জিহাদী দুশমনদের মনোবাসনার অনুকুলে থাকায় তারাও সংবাদটি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছে।

আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে প্রকাশ্য এ সাহায্যকে ইহুদী কর্তৃক খাদের কিনারায় নিক্ষেপের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য একে তো ছিল- মুসলমানদের সাহস যাতে বেড়ে না যায় যে, জিহাদী শক্তির মাধ্যমে আমেরিকাকে পরাজিত করা সম্ভব। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল- স্বয়ং ইহুদীদেরকে এ কথার ভরসা দেয়া যে, ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই। ইহুদীদেরকে যদি এ কথা না বলা হত- তবে বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে ইহুদীরা ইসরায়েলে গমন করতে অস্বীকার করে দিত। তারা বলতে পারত- যে, তোমরা নিজেরা স্বয়ং আমেরিকাতেই নিরাপদ নও, তাহলে আমাদেরকে কোন ভরসায় ইসরায়েল গমনে বাধ্য করছ ???!!!

আর এক্ষেত্রে যতগুলো প্রমাণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, সবগুলোই ইহুদীদের বানানো তথ্য ছিল, যা তারা সর্বদায় সত্যকে ঘোলাটে করার জন্য সৃষ্টি করে থাকে। তাদের সাব্যস্তকৃত প্রমানগুলো নিয়ে যদি চিন্তাশীল ব্যক্তি গবেষণা করে, তবে সকল প্রমাণাদী একটি অপরটির বিপরীত দেখতে পাবে। সকল প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব ও সমাধান হাতে আছে, কিন্তু বিস্তারিতভাবে পেশ করার সময় হাতে নেই।

মুসলমান... মিডিয়ার দৃষ্টিতে...

আমাদের মিডিয়াগুলো পশ্চিমাবিশ্বের সাথে সম্পর্কিত সংবাদগুলো খুবই মার্জিত আন্দাজে মানুষের সামনে প্রকাশ করে থাকে। তাদের ওখানে দৈনন্দিন যতই অশালীন ও অমানবীয় ঘটনা ঘটে থাকুক, তাদের সংবাগুলোকে এমনভাবে প্রকাশ করা হয় যে, শ্রবণকারীদের কাছে তারা আদর্শ বলে মনে হতে থাকে। পক্ষান্তরে মুসলিমদের ব্যাপারে তাদের ধারণা সম্পূর্ণই নেতিবাচক। মুসলিম সম্পর্কিত সংবাদগুলো শুনলে মনে হয় যে, মুসলমান সমাজ হচ্ছে অপরিমার্জিত, চরমপন্থী, হত্যাযজ্ঞ এবং অশালীনতার কেন্দ্রস্থল।

পাকিস্তানের সকল টিভি-চ্যানেল এবং পত্র-পত্রিকাগুলো আপনি হাতিয়ে দেখুন- মনে হবে যে, এ সমাজে কল্যাণের কোন চিহ্নই বাকী নেই। এ সমাজের লোকেরা শুধুমাত্র অনিষ্টতার দিকেই সবসময় দৌড়তে থাকে। পক্ষান্তরে হিন্দুস্তানের ব্যাপারে পত্র-পত্রিকার সংবাদগুলো এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, হিন্দু-সমাজ মুসলমানদের তুলনায় অনেক ভদ্র, পরিমার্জনশীল এবং সম্মানের অধিকারী। ইন্ডিয়া'র ব্যাপারে যতসব গুণগাণ আপনি শুনে থাকবেন, সবই হচ্ছে মিডিয়ার প্রকাশিত সাফাই। অন্যথায় পাকিস্তান এবং ভারতের দুই সমাজের তুলনা করলে আপনি এমনই পার্থক্য দেখতে পাবেন, যেমন জাহিলিয়্যাত ও নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যুগের মধ্যে পেয়েছেন।

ইন্ডিয়ার সমাজের চারিত্রিক অবনতি এতটাই নিম্নমুখী যে, ঐ পর্যন্ত পৌছতে পাকিস্তানের কয়েকজন

পারভেজ মুশাররফ দরকার লাগবে। পাকিস্তানের মুসলমানগণ (সরকারী স্তর বাদে) যে মহান চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী, তা বহির্বিশ্ব থেকে আসা একজন মুসলমান (মুনাফিক নয়) খুব ভাল করেই লক্ষ করতে পারে। কোন একজন ব্যক্তি বা সমাজকে এ পরিচয়ের মাধ্যমেই চেনা যায়- যে, তার ভেতরে অন্যের ব্যাপারে ত্যাগ স্বীকারের আগ্রহ কতটুকু আছে, বিপদের সময় তার ভাইকে সাহায্য করার জন্য সে কতটুকু প্রস্তুত। পাকিস্তানের মধ্যেই এ গুনগুলো বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। যে সকল বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক ও কলামিষ্টকে আপনি ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখবেন, তারা তো হচ্ছে ঐ সকল ব্যক্তি- যারা এক বোতল ভারতীয় মদ্য পানের আশায় জাতিগত অহংকারকে বিক্রি করে দিতে দ্বিধাবোধ করেনা। যারা কিছুদিন ভারতে থাকার পর "র"য়ের মেজবানদের মেজবানীতে এতটাই আবেগাপ্লুত যে, নিজেকেই সে মুসলিম হিসেবে ধীরে ধীরে খারাপ ভাবতে থাকে।

দৃষ্টিভঙ্গির এ পরিবর্তনসমূহ একমাত্র মিডিয়ার মাধ্যমেই করা হয়েছে। অন্যথায় ভারতের ব্যাপারে মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান খুবই প্রসিদ্ধ, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখেনা।

দেমাগ পবিত্রকরণ... নাকি ব্রেইন ওয়াশিং...

ব্রেইন ওয়াশিংয়ের উপর লেখা গ্রন্থগুলির মধ্যে "গুস্তাওলী বান" এর রচনা "সাইকোলোজী গেদারিং" প্রসিদ্ধ একটি গ্রন্থ। জনসাধারণের উপর মানসিক গবেষণা করতে গিয়ে তিনি বলেন- "মানুষ যতই মার্জিত, ভদ্র এবং শিক্ষিত হোক না কেন, যদি সে কোন গ্রুপের সাথে বসবাস করে, তাহলে সেও ঐ গ্রুপের মানসিক রূপ এবং তার আচরণের অনুসারী হয়ে যায়।"

টেলিভিশনের কুপ্রতিক্রিয়ার উপর গবেষণা করতে গিয়ে ব্রেইন ওয়াশিং বিষয়ে সুদক্ষ "থিউড রাইড ওয়ার্ড" বলেন- টেলিভিশানের ছবির মাধ্যমে মানুষের দিল, দেমাগ ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করার এক শক্তিশালী হাতিয়ার আমাদের হাতে এসে গেছে, যার কল্পনাও আমরা কোনদিন করতে পারিনি।

টেলিভিশন আপনার সামনে এমন জিনিস পেশ করে যে, -আপনি চান বা না চান- আপনার মন জোরপূর্বকভাবে তা পছন্দ করে ফেলে। সে বিষয়টিকে আপনার সামনে এমনভাবে পেশ করবে যে, এটাকে গ্রহণ করা ছাড়া আপনার আর কোন গত্যন্তর নেই।

ব্রেইন ওয়াশিং বিষয়ে অপর এক সুদক্ষ ব্যক্তি "ফেড্রিক আইমার" টেলিভিশনের ছবির গভীর প্রতিক্রিয়াগুলো গবেষণা করতে গিয়ে লেখেন- টেলিভিশন এত পরিমাণ প্রতিক্রিয়াশীল এবং জাদুময়ী যে, দর্শকের সকল মনযোগ তার দিকে টেনে নিয়ে যায়। টেলিভিশন চোখ এবং ব্রেইনকে অস্বাভাবিক পর্যায়ে কাবু করে ফেলে। এভাবে সে চোখ, শব্দ, ছবি এবং পূর্বের জ্ঞাত বিষয়াবলীর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের কাজটি খুব দ্রুতগতিতে করতে পারে। এহেন পরিস্থিতিতে ব্রেইন (যার কাজ হচ্ছে- ঘটনাগুলো নিয়ে গবেষণা করা এবং সংবাদ ও ছবিগুলো ধারাবাহিকভাবে দেখে এথেকে ফলাফল বের করা) এজন্যই তার কাজগুলি পূর্ণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে- কারণ, দৃশ্য একের পর এক চেঞ্জ হতে থাকে। আর এ কারণেই ব্রেইন দ্রুত পরিবর্তনশীল দৃশ্য ও সীনগুলি নিয়ে গবেষণার ফলাফলটি কোন এক দিকে নিয়ে যেতে অপরাগ হয়ে পড়ে। যার ফলে যাই

সে বলে, তাই সে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে। অধিকাংশ টিভি দর্শকই ম্যাগনেটিক দুর্গতির শিকার হয়ে থাকে।

থিউড রাইড ওয়ার্ড" এ-ও পর্যন্ত বলেছেন যে, মিডিয়াকে জোরপূর্বকভাবে মানুষের বোধশক্তি হরনের কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে। আরেকটি ব্যাপার মিডিয়া জগতে প্রসিদ্ধ যে, মিডিয়া হচ্ছে জনসাধারণের সিদ্ধান্ত (Public Opinion) কে সবার সামনে পেশ করে থাকে, মিডিয়া হচ্ছে- সর্বসাধারণের মুখপাত্র, জনগণের কন্ঠের বাহক। এগুলোও প্রকাশ্য মিথ্যা বক্তব্য। বরং পকৃত বাস্তবতা হচ্ছে- মিডিয়া জনসাধারণের সিদ্ধান্তকে তাদের চাহিদামত তৈরী করে সবার সামনে পেশ করে এবং এটাকেই তারা জনগণের সিদ্ধান্ত বলে প্রচার করে।

"হল বেকার" লেখেন- "আপনি যদি চান যে, আমেরিকায় কোন বিশেষ ধারনা বা মতামতকে চালু করবেন, তবে আপনাকে যা করতে হবে- জনগণের রায়ের আশ্রয় নিয়ে বক্তব্যটিকে আপনি সর্বসাধারণের সিদ্ধান্ত বলে চালিয়ে দিন এবং পরে এটাকে টিভিচ্যানেলগুলোতে বা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রচার করে দিন।”

টেলিভিশন দর্শকদের নিয়ে জাতিসংঘের সংস্থা "ইউনিস্কো" একবার একটি রিপোর্ট তৈরী করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল- বিশ্বের শতকরা প্রায় ৮৫% লোক টেলিভিশনকে কেন্দ্র করে খানাপিনা, নিদ্রা, লেখাপড়ার সময়, এবং কাজের প্রোগ্রাম নির্ধারন করে থাকে। তাদের সিদ্ধান্তশক্তির মধ্যে টেলিভিশন মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনভাবে তারা কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। দর্শক নিজের অজান্তেই টেলিভিশন এবং অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রোগ্রাম দেখে এর দিকে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ব্রেইনকে বৈদ্যুতিক আলো (Electronic Waves)এর মাধ্যমে কন্ট্রোল করা হয়। যেমন আপনি জানেন যে, মিউজিকের বিচ্ছোরণের মাধ্যমেও মানুষের ব্রেইনে অগণিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যার প্রতিটি আলো এবং প্রতিটি শব্দের ধরণ ভিন্ন হয়ে থাকে। ইহুদী জাদুগররা এ আলোর বিচ্ছোরণ-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে অনেক গবেষণা ও জ্ঞান অর্জন করেছে। তারা ভাল করেই জানে যে, কোন আলোর মাধ্যমে কিরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত আপনি মিউজিক শ্রবণকারীদের অবস্থা পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে নিতে পারেন। সুতরাং সাইন্সি দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথা মেনে নেয়া যায় যে, ঘরে রক্ষিত টেলিভিশনের সেটগুলিকে এ ধরনের অশুভ আলো বিকিরণের জন্যই রাখা হয়েছে। আর এ কারণেই টেলিভিশন দর্শনকারী নারী-পুরুষদের অধিকাংশকেই মানসিক রোগ, মানসিক টেনশন এবং দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

মিউজিকের শব্দগুলো মানবান্তর মৃত্যুর কারণ। আর এ কথাটিকে শুধুমাত্র জীবিত অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে। নবী করীম সা. একবার এক রাস্তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন কোন এক জায়গা থেকে মিউজিকের আওয়াজ আসলে তৎক্ষনাৎ তিনি কানে আঙ্গুল দিয়ে দেন। এভাবে কানে আঙ্গুল দেয়া অবস্থায় চলতে চলতে ঐ স্থান থেকে দূরে চলে যান।

বর্তমান যুগে মিউজিকের সাথে সাথে টিভি থেকে বের হওয়া আলোর ফুয়ারাগুলিও মানুষের ঘরবাড়ী ধ্বংসের এক বার্তা। টেলিভিশন থেকে সংবাদ এবং তথ্যাদি শ্রবণকারীগণ যখন বর্তমান পরিস্থিতি বিশেষত ইসলাম এবং কুফরের মধ্যকার চলমান যুদ্ধ (যার নাম দেয়া হয়েছে সন্ত্রাস নির্মূলের যুদ্ধ) নিয়ে আলোচনায় বসে, তখন তাদের মতামত শুনে আফসোস হয় যে, বাস্তব পরিস্থিতির জ্ঞান থেকে তারা এমনই দূরে যেমন যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে।

টেলিভিশনের আরো একটি বড় প্রতিক্রিয়া যা আপনি সচরাচর দেখতে পাবেন যে, সার্বক্ষনিক টিভি দর্শকরা সাধারণের মত জীবনযাপন থেকে বহু দূরে সরে যায়। শেষে নিরাশ হয়ে বসে পড়ে। আপনি এমন একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলে দেখুন -যে টেলিভিশনের তথ্যাদি নিয়ে অনেক জ্ঞান রাখে- আপনি দেখবেন- সে আমেরিকা-ইরাক যুদ্ধ, আমেরিকা-আফগানিস্তান যুদ্ধ, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ পরিণতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে লম্বা লেকচার পেশ করবে। কিন্তু আপনি যদি তার কাছে এগুলির সমাধান জানতে চান বা নিজে তাতে শরীক

হওয়ার আহবান জানান, তখন অতি তুচ্ছ সব বাহানা পেশ করে করে ঘার ফিরিয়ে আপনার থেকে দূরে সরে যাবে। উপরে বলা হয়েছে যে, টেলিভিশনের প্রতিটি আলোর মাধ্যমেই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যখন কোন মানুষ টেলিভিশন অন করে, তখন এর জ্যোতিগুলো তার অজান্তেই ব্রেইনের উপর কন্ট্রোলিং ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। তাই যা কিছু দেখানো হয়, সবকিছুর দৃশ্য তার অন্তরে স্বীয় মতামতাকারে বসে যায়।

টেলিভিশনের মধ্যে যা কিছু ভেসে থাকে, তা মানুষের চোখ প্রত্যক্ষ করে থাকে। কিন্তু স্ক্রীনেই সে সময়ে এমনও অনেক কিছু হয়, যা আমাদের চোখে দেখতে পায়না, তবে আমাদের অন্তর এগুলিকে ঠিকই ভেতরে টেনে নেয়। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই ঐ বার্তা, যা প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারী দক্ষব্যক্তিবর্গ দর্শকদের ব্রেইনে বসিয়ে দিয়ে চায়। আপনি যদি কথাটি সাইন্টিফিক দৃষ্টিকোন থেকে বুঝতে চান, তবে মনে করুন- প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ঐ সকল দৃশ্য যা আপনি টিভি বা সিনেমায় প্রত্যক্ষ করেন, তা প্রতি সেকেন্ডে ৪৫ ফ্রেমস বা ফটোকে অন্তর্ভূক্ত করে। অর্থাৎ ৪৫টি অপরিবর্তনশীল ফটো এক সেকেন্ডের একটি ফিল্ম তৈরী করে থাকে। আর ঐ অপরিবর্তনশীল ফটো যদি এক সেকেন্ডে একবার দেখানো হয়, তবে তা ঐ এক সেকেন্ডের ৪৫ ভাগের একভাগ হয়, যা আমাদের চক্ষু দর্শন করতে অক্ষম, তবে মানুষের বোধশক্তি ঠিকই তা ধারণ করে ফেলে এবং অন্তরে তা বসিয়ে নেয়।

এভাবেই মানুষ মানসিক দিক থেকে ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে আর মনে মনে নিজেকে স্বাধীন ভাবতে থাকে। যে সিদ্ধান্তই সে পছন্দে/অপছন্দে নিচ্ছে, স্বীয় স্বাধীনতার মাধ্যমেই নিচ্ছে বলে ধারনা করে। কিন্তু বিষয়টি ভুল। টেলিভিশনের অন্যান্য প্রতিক্রিয়া যদি আপনি প্রত্যক্ষ করতে চান, তবে নির্বাচনের পূর্বে টিভিতে চলা সংবাদ আর বিশ্লেষণগুলো ভাল করে দেখনু- আন্তর্জাতিক গোপন শক্তি যাকেই বাংলাদেশের ক্ষমতায় দেখতে চায়, সকল টিভি-চ্যানেলগুলি তার জন্যই মানুষের ব্রেইন প্রস্তুত করতে থাকে। কিছু কিছু মানুষ তা বুঝতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই তা বাস্তব এবং ন্যায়বলে অন্তরে বসাতে থাকে।

খানাপিনার দ্রব্যাদিতে মিডিয়া খুব ভাল করেই মানুষের অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। তা এতই মারাত্মক আকার ধারণ করেছে যে, ক্ষতিকর দিকগুলো জানা সত্তেও খানাপিনায় মানুষ ঐ জিনিসগুলিই ব্যবহার করছে, যেগুলিকে মিডিয়ার মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে।

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করুন :-

খাদ্যস্থলী এবং হজমশক্তি নষ্ট করার জন্য মানুষকে ষরিষার তৈল ছেটানো ক্যামিকেল দ্বারা তৈরী ঘি এবং ডালডা, যৌন শক্তি দুর্বল করার জন্য আয়োডিনযুক্ত লবণ, যৌন অক্ষমতা ছড়ানোর জন্য ঠান্ডা আইসক্রিম-চকোলেট, ফুসফুস নষ্ট করার জন্য ইহুদী কোম্পানীর তৈরী ডিব্বায় জমাট খাদ্য, চুল নষ্ট করার জন্য ক্যামিকেলপূর্ণ শেম্পো, শরীর মোটা এবং সর্বরোগের কেন্দ্র বানানোর জন্য ফার্মের ডিম এবং মুরগী ইত্যাদি অগণিত জিনিষপত্র এই টেলিভিশনের মাধ্যমে মানুষের নিত্যদিনের ব্যবহৃত বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ক্ষতির দিকগুলো মানুষের জানা সত্তেও ছাড়তে পারছেনা। বোধশক্তি লোপ পাওয়ার জন্য পোলিও ফোটা অপেক্ষা বড় কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবেনা।

আপনি যে কোন টেলিভশনধারী পরিবারকে দেখবেন- তাদের পারিবারিক জীবন (Life Style)টিভি অনুসৃত হয়। ঘরের সার্বিক সেটিং, দরজার পর্দা, পেইন্টিং এমনকি টেবিলে রাখা ফুলদানিটি পর্যন্ত টিভি অনুসৃত হয়। তেমনি বিভিন্নরকম কার্টুন, দরজায় পর্দার সাথে লাগানো ঘন্টি ইত্যাদি বহু জাদুময় নিদর্শন মানুষ শুধুমাত্র টিভিতে দেখে দেখে ঘরে স্থাপন করেছে। যারফলে ঘরের শান্তি এবং বরকত বিনষ্ট হয়েছে। মানবতার শত্রু ইহুদী সম্প্রদায় শুধুমাত্র কতিপয় চেলা'দের দিয়ে ইসলামী বিশ্বকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। তাই মুসলমানদের মনমানসিকতাও তাদের মত হয়ে গেছে।

মিডিয়া কর্তৃক চাঁপাবাজীর মাধ্যমে সফলতারই সাথে স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। চাপাগুলো জনগণের মধ্য থেকে উঠানো হয়। তাদের উদ্দেশ্য হয়- ভদ্রতা এবং সামাজিক স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত খুটিগুলো ভেঙ্গে দেয়া, তাদের মাঝে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন করা। জনসাধারণের মধ্যে যখন হতাশা এবং আন্দোলনের ভাব দেখা যায়, তখন কতিপয় চাপাবাজকে মিডিয়ার সামনে প্রকাশ করে তাদের ঠান্ডা করে দেয়া হয়। চাঁপাবাজীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হচ্ছে যে, এটি আগুনের মত অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

কন্ঠের জাদু...

সংবাদ প্রচারকারী চ্যানেলগুলো সংবাদ পাঠের জন্য এমন কন্ঠধারী (পুরুষ-মহিলা)কে নির্বাচন করবে, যাদের আওয়াজে জাদুর পরশ বিদ্যমান। শুনামাত্রই তা অন্তরের গহীনে বাসা বেধে ফেলে। পরের দিন কন্ঠগুলি পূণরায় না শুনলে মনে শান্তি আসেনা। পাশাপাশি সংবাদ পাঠকদের সাবলীল উপস্থাপনা, ভাবভঙ্গি, সাহিত্যসম্বলিত শব্দচয়নও জনমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কন্ঠের এ জাদুগুলি আপনি প্রতিটি সংবাদ শ্রবণকারীদের মধ্যে দেখতে পাবেন। যেমন- সংবাদ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং শুনার পর কোন একটি সিদ্ধান্তে পৌছার যোগ্যতা অর্জন করা, বিশ্বাসের স্তর থেকে সন্দেহ এবং ঘোলাটের স্তরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি...।

মিডিয়ার মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন...

ইহুদীরা মুসলমানদেরকে যে দৃষ্টিভঙ্গির দিকেই নিয়ে যেতে চায়, সারাবিশ্ব ওদিকেই দৌড়ে যেতে শুরু করে। সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ কোন প্রকার লাভ-লোকসান বিবেচনা ছাড়াই হলিউড-বলিউড নায়িকাদের মায়াবী চুলের বন্ধনে বন্দি হয়ে আছে। সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বানিয়ে মানুষের সামনে পেশ করা হচ্ছে। দাজ্জালী শক্তির বিরোদ্ধে যুদ্ধকে একতরফা সন্ত্রাসদমন যুদ্ধের নাম দিয়ে মানুষের ব্রেইনে বসিয়ে দেয়া হচ্ছে।

ইনশাআল্লাহ! দাজ্জালী শক্তিসমূহের বিরোদ্ধে বিশ্বজুড়ে মুজাহিদীন তৎপর রয়েছেন। বীরত্ব, বাহাদূরী, ধৈর্য এবং আত্মোৎসর্গের এমন এমন ইতিহাস রচনা করে যাচ্ছেন যে, উম্মতে মুসলিমার জন্য তা গৌরবের বিষয় ছিল। কিন্তু এই মিডিয়া মানুষকে প্রবল গুমরাহীতে আবদ্ধ করে রেখেছে। একমাত্র আল্লাহ তা'লা যাকে চান, সেই একমাত্র এথেকে মুক্ত হতে পারছে। কুফর এবং ইসলামের মধ্যকার এ যুদ্ধে মানুষেরা ঐ মতামতটিকেই বিশ্বাস করে নিচ্ছে, যা দাজ্জাল এবং তার অনুসারীরা মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গও মিডিয়ার এ বিষাক্ত ছোবল থেকে মুক্ত নয়। যেমনটি আমরা উপরোক্ত হাদিসেই পড়ে এসেছি যে, হযরত হুযায়ফা রা. বলেছেন- তোমাদের জানা থাকা সত্তেও তোমরা (জ্ঞানের উপর) ঐ বস্তুকে প্রাধান্য দেবে, যা তোমরা প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। এভাবে তোমরা আস্তে আস্তে গুমরাহ হয়ে যাবে, এমনকি তোমরা টেরও পাবেনা।

বর্তমান সময়ের ঘটনাগুলিকে মিডিয়া যেভাবে পেশ করছে, তা যদি সামনে রাখা হয়- অতপর ইমাম মাহদী আ.এর আবির্ভাবের সময় উলামায়ে দ্বীন এবং মুজাহিদীন কর্তৃক উনার হাতে বায়আত গ্রহণ করার পরিস্থিতিকে-ও সামনে রাখেন, তবে আন্দাজ করা মুশকিল হয়না যে, মিডিয়া ইমাম মাহদীকে মানুষের সামনে কিভাবে পেশ করবে!! পাশাপাশি মিডিয়াভক্ত লোকেরা ঘটনাটিকে কিভাবে গ্রহণ করে নেবে!!! এর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত আপনি লাল মসজিদের সংঘটিত ঘটনার সময় মিডিয়াতে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। ঘটনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি মিডিয়ার তৎপরতা দেখুন অতপর গাজী আব্দুর রশীদ শহীদ রহ. এর শাহাদত বরণ পর্যন্ত জনসাধারণের রায় শুনুন। বিশেষত মাওলানা আব্দুল আজীজ সাহেবের গ্রেফতারের পরের দুই/তিনদিনের পরিস্থিতির কথা স্মরণ করুন। দাড়ীওয়ালা লোকদের দেখলেই মানুষের মুখ থেকে ঘৃণা

ঝড়ে পড়ত, বিষাক্ত সব কথা তাদের শুনা লাগত। আপনি একটু চিন্তা করুন- জনসাধারণের দৃষ্টিভক্তিকে কে এমন আমূল পরিবর্তন করেছে ?? পরিস্থিতি পশ্চিমা বিশ্বের ইংলিশ মিডিয়া নয়; বরং পাকিস্তানের উর্দূ মিডিয়াই তৈরী করেছে। ধরে নিন- জনগণ তো জনগণই!! কিন্তু শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা পর্যন্ত বিষয়টিকে মিডিয়ার চোখে দেখেছে। মাত্র একজন ব্যক্তির বিরোদ্ধে যুগের ফেরাউন পারভেজ মুশাররফের চেলাদের থেকে শুরু করে দেশের অলিতে-গলিতে একই কন্ঠ, একই দৃষ্টিভঙ্গি, একই মতামত এবং একই দাবী উচ্চারিত হচ্ছিল।

যন্ত্রণাদায়ক ঐ ঘটনার দিকে আমি যেতে চাইনা। শুধু এটুকু বলতে চাই যে, এটা তো ছিল শুধু মসজিদ কেন্দ্রিক ঘটনা। শুধুমাত্র পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়। এখন চিন্তা করুন- ইমাম মাহদী আ. এর আবির্ভাব হয়ে গেছে। উনি হারাম শরীফের প্রাঙ্গনে বসে সমগ্র ইসলামী বিশ্বকে জিহাদের আহবান করছেন। হারামের সমস্ত হাজীগণ উনার হাতে বায়আত সম্পন্ন করেছেন। এমন এক বায়আত; যার ব্যাপারে কাফেরদের পর্যন্ত জানা আছে যে, সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। না ইসরায়েল বাঁচবে..., না আমেরিকা..., আর না আরবের প্রতাপশালী বাদশাদের কোন অস্তিত্ব থাকবে..., না অনারবদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নিস্তার পাবে...। শুধুই আল্লাহর কালিমা..., আল্লাহর দ্বীন, আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন এবং রাসূলে আরাবী সা. এর আনীত একমাত্র জীবনবিধানই অবশিষ্ট থাকবে। এহেন পরিস্থিতে মিডিয়া ইমাম মাহদী আ.কে কোন রূপে সারাবিশ্বের সামনে পেশ করবে ??!! চোখবন্ধ করে জামিয়া হাফসা রা. মহিলা মাদ্রাসার ছাত্রীগণ এবং গাজী শহীদ রহ. এর ব্যাপারে কলংকজনভাবে ব্যবহৃত মিডিয়ার মুখকে আরো একশগুণ বাড়িয়ে দিন!! জ্বি হ্যাঁ... একশগুণ বাড়িয়ে চিন্তা করুন!!! কেননা ব্যাপারটিও তখন এতটুকুই বড় আকারের হবে। তাহলে হয়ত পরিস্থিতি নিম্নোক্ত পর্যায়ের হতে পারে.... :-

মক্কার মিনাপ্রান্তরে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়েছে...। ওখানে ভয়ানক হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে...। হাঙ্গামার কারণ এখন পর্যন্ত অজানা...। কিন্তু... ধারণা করা হচ্ছে যে, এর পেছনে ঐ সকল ব্যক্তিরাই জড়িত, যারা ইতপূর্বে নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরিয়ে আসছে... এবং ধর্মীয় স্থানগুলোতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আসছে...। মিনাপ্রান্তরে অসংখ্য হাজীদেরকে হত্যা করে ফেলা হয়েছে...। লাশগুলো রক্তের বন্যায় ভাসছে...। উপস্থিত সন্ত্রাসীরা আল্লাহর পবিত্র ঘর কা'বা শরীফ দখল করে নিয়েছে... এবং কা'বা শরীফের আশপাশ হাজীদেরকে বন্দি করে ফেলেছে...। সন্ত্রাসীরা এ হাজীদেরকে জান বাঁচানোর জন্য ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করছে...। বন্দীদের মধ্যে ছোট ছোট শিশু এবং অজস্র নারী বিদ্যমান...। চারপাশ থেকে চিৎকার ও কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে...। সাহায্যের জন্য শিশুরা চিল্লাচিল্লি করে আহবান করছে...। স্থানীয় সংবাদকর্মীদের বরাতে জানা গেছে যে, ঐ সকল সন্ত্রাসীদের মধ্যে মার্কিনবিরোধী সন্ত্রাসীগোষ্ঠীও বিদ্যমান... যাদেরকে খুজে বের করার জন্য পূর্বে থেকেই অপারেশন জারী ছিল... সন্ত্রাসীদের ধর্ম বলতে কিছু নেই...। এইমাত্র আমাদের হাতে একটি সংবাদ এসে পৌছেছে যে, হারাম শরীফকে এদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য জর্ডান ও ইসরায়েলের দিক থেকে একটি বিশাল জোটবদ্ধ ব্যাটালিয়ান (সেনাবাহিনী) যাত্রা শুরু করেছে...। (তবে জোটবদ্ধ এ সেনাদলের পরিণাম কি হয়েছে, তা গোপন করে ফেলা হবে)

ইমাম মাহদীর দলকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত "সুফয়ানী"র সৈন্যদল বায়দা প্রান্তরে মাটির নিচে ধ্বসে যাওয়ার যে কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সে পরিস্থিতি নিয়ে মিডিয়ার বানানো মিথ্যা, বানোয়াট, ধোকা এবং জাদুময়ী অপপ্রচারের আন্দাজা আপনি করতে পারেন। জনসাধারণ যখন টিভি স্ক্রীনে মিনা প্রান্তরে রক্তে ভাসতে থাকা লাশগুলির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে থাকবে। একই দৃশ্য বারবার বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করে মানুষের ব্রেইনে তা বসিয়ে দেয়া হবে। বিভীষিকাময় ঐ ঘৃণ্য বিষয়টি স্মরণ করুন- যা মাওলানা আব্দুল আজীজের গ্রেফতারীর পর মানুষের ব্রেইনে বসিয়ে দেয়া হয়িছিল। হারাম শরীফ আয়ত্বকারী ইমাম মাহদীর ব্যাপারে মিডিয়া দর্শকদের কি অবস্থান হবে!! যা দেখতে থাকবে... তাকে জানা বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়ে ফেলবে। মিডিয়ার চালে চলমান এমন জনসাধারণ তখন ইমাম মাহদীর কথা মানা তো দূরের কথা, -আল্লাহ হেফাজত করুন- মানুষের মুখ থেকে তখন কিরকম সব প্রতিক্রিয়া বের হতে থাকবে... এর আন্দাজ করা

কঠিন নয়। পক্ষান্তরে ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ, যারা সত্যকে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র কাউকে ভয় করেনা, কারো সাথে আপোষ করেনা, যাদের অন্তরগুলি হক্ব গ্রহণে সদা উন্মুক্ত- তারা যদি পাহাড়ের গর্তেও অবস্থান করে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের জ্ঞান তাদের ঠিকই হয়ে যাবে।

মিডিয়ার অপপ্রচার : সমস্যার সমাধান...

সমাজে মিডিয়ার গুরুত্ব এবং তার প্রতিক্রিয়াসমূহের ব্যাপারে আপনি অবগত হয়েছেন। এখন আপনার মনে এ জাতিয় প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, "তাহলে আমাদের এখন কি করা উচিৎ ?? তাহলে কি নিজেদেরকে পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে নেব ?? নাকি এহেন পরিস্থিতে আমাদের নিজেদেরই কোন টিভিচ্যানেল খোলে দেয়া উচিত ??"

মিডিয়ার ব্যাপারে আমাদের দু'ধরনের পলিসি তৈরী করা দরকার। এক- প্রতীরক্ষামূলক। দুই- আক্রমনমূলক।

প্রতীরক্ষামূলক পলিসি হচ্ছে- জনসাধারণকে ধীরে ধীরে মিডিয়ার প্রকৃত চেহারা সম্পর্কে অবহিত করা। কেননা, লোকেরা যখন হক আর বাতিল নিয়ে কথোপকথন করে, তখন তাদের সকল তথ্যই মিডিয়া নির্ভরশীল হয়। আর ঐ মস্তিস্ক নিয়েই সে হকের বিরুদ্ধে বলে যেতে থাকে। আপনি যখন (উপরে বর্ণিত) বিভিন্ন প্রমানাদী এবং যুক্তির ভিত্তিতে তাদের বুঝাবেন, সন্দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত মিডিয়ার স্তম্ভগুলো তখন এমনিতেই ভেঙ্গে যেতে থাকবে। এরপর প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের অবহিত করুন। এর মাধ্যমে এই উপকার হবে যে, দাজ্জালী শক্তিসমূহের প্রোপাগান্ডা কমতে থাকবে এবং জনসাধারণও এর বিষাক্ত ছোবল থেকে নিরাপদে থাকবে। এরপর মিডিয়ার অপপ্রচারগুলো আপনি নিঃশেষ করতে থাকুন। কাজটি কোন পয়সা খরচ করা ছাড়াই আপনি করতে পারেন- সীনা-বসীনা। আল্লাহর উপর ভরসা করে সীনা-বসীনা বন্ধুবান্ধবদের মাঝে আপনার দাওয়াতী আমল শুরু করে দিন।

সীনা-বসীনা দাওয়াতের বরকত এবং এর উপকারিতা দেখতে হলে আপনি "তাবলীগ জামাত"কে আদর্শ মানতে পারেন। দ্বীনের কথাসমূহ শ্রোতাদের অন্তরে কিভাবে বসাতে হয়, দ্বীনের বিরুদ্ধে সৃষ্ট অপপ্রচারগুলো কিভাবে ভেঙ্গে দিতে হয়, এ জাতিয় ব্যাপারগুলো প্র্যাকটিক্যালভাবে আপনি "তাবলীগ জামাতের কাছ থেকে শিখতে পারেন। বিরুদ্ধবাদীদের প্রোপাগান্ডাকে উত্তম উপায়ে খতম করে ফেলা তাবলীগ জামাতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট। তাবলীগ জামাত ছাড়া মুসলমানদের অন্য কোন জামাত এধরনের দ্রুতগতিতে বিরোধীদের অপপ্রচারকে মিটিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে বলে আমার জানা নেই। বরং অন্যান্য জামাতগুলোর অবস্থা এই যে, শত্রুদের পক্ষ থেকে আসা কোন অপপ্রচারকে দলের নেতৃস্থানীয় কর্তারাই আগে ছড়িয়ে থাকে। এমনকি জিহাদের ময়দানে যুদ্ধরত মুজাহিদদেরও একই অবস্থা। এই অপপ্রচারগুলো শুনার পর অন্যের কাছে বর্ণনা করাই সবচে' বড় ভুল। এভাবে প্রচার করে আপনি শত্রুদের উদ্দেশ্যকে আরো পূর্ণ করে যাচ্ছেন। পক্ষান্তরে তাবলীগ জামাতের একটি মৌলিক নিয়ম হচ্ছে- এধরনের কোন অপপ্রচারকে তৎক্ষনাৎ খতম করে দেয়া, সামনে কারো কাছে বর্ণনা না করা বা বর্ণনা করতে না দেয়া। এটাই অপপ্রচার নির্মূলের মহৌষধ। আপনাকে আরকিছু করার দরকার নেই, এমনিতেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ..।

এটাই কুরআনের শিক্ষা, যা আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে "ইফক"এর ঘটনার সময় শিখিয়েছিলেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা রা. এর ব্যাপারে মুনাফিকীন অপপ্রচার চালিয়েছিল। কতিপয় সরলমনা মুসলমান তা শুনে অন্যদের কাছেও বর্ণনা করে বসেছিল। উম্মুল মুমেনীনের সততা ও পবিত্রতার ঘোষনা আল্লাহ পাক স্বয়ং বর্ণনা করেছেন এবং কেয়ামত পর্যন্তের জন্য আগত সকল মুসলমানকে শিখিয়েছেন যে, শত্রুদের অপপ্রচারকে কিভাবে খতম করতে হয়।

(১) لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ، وقالوا هذا إفك مبين.

অর্থাৎ এমনটি কেন হলনা যে, ঐ তুহমতটি যখন তোমরা শুনেছিলে, তখন তোমাদের ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার মহিলাগণ নিজেদের ব্যাপারে উত্তম ধারনা করতে এবং এ কথা বলে দিতে যে, এটা হচ্ছে প্রকাশ্য তুহমত।

আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন মুসলমানদেরকে প্রথমে শিখাচ্ছেন যে, মুসলমানদের ব্যাপারে সর্বদা সুধারানা পোষন করা উচিত; (অর্থাৎ কোন প্রকার সন্দেহ এবং দুর্বলতা মনে স্থান দেয়াই উচিত নয়, যেমনটি মিডিয়া করে থাকে)।

(২) ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ، سبحانك هذا بهتان عظيم.

অর্থাৎ তোমরা এমনটি কেন করনি যে, যখন তোমরা তুহমতটি শুনেছিলে, তখন বলে দিতে যে, এ ব্যাপারে কোন কথা বলার অধিকার আমাদের নেই! বলে দিতে যে, ছুবহানাল্লাহ! (পবিত্র ঐ সত্তা) এটা তো অনেক বড় তুহমত!

এটাই অপপ্রচার ধ্বংসের মূল রহস্য। আল্লাহ আমাদের আমল করার তাওফীক দান করুন!!!

আক্রমণমূলক দাওয়াত...

আক্রমণমূলক দাওয়াত হচ্ছে- রণাঙ্গন থেকে আসা সংবাদ এবং হক-বাতিলের মধ্যকার অন্যান্য বিষয়াবলীর বাস্তবতা সম্পর্কে লোকদেরকে অবহিত করা। বিশেষত কলামিষ্ট এবং টিভি দেখে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের। পাশাপাশি যে সকল অমানবিক কর্মকান্ডের কথা বলে ইহুদী মিডিয়ার পক্ষ থেকে মুজাহিদীনের প্রতি থুথু নিক্ষেপ করা হয়- আপনি ঐ সকল ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ বা প্রতিরক্ষামূলক কোন জবাব দেবেননা। যেমন- তারা বলে থাকে যে, "শহরের নিরপরাধ লোকদের হত্যা করা আবার কোন ধরনের মানবতা ?? ইসলাম কি এধরনের কর্মকান্ডের অনুমতি দেয় ?? এসবের উত্তরে আপনি ইসলামের সাফাই গাওয়া শুরু করবেননা। বরং আপনি তাকে উল্টা প্রশ্ন করুন যে, শুধু মার্কিনীরাই নিরপরাধ!! ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, ইরাক ও আফগানিস্তানে যাদেরকে জীবীত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, তারা কি নিরপরাধ ছিলনা ??!! মার্কিনীদের টেক্সে লালিত সৈনিকেরা ইরাকের ফাল্লুজা, কান্দুয, এবং শাবারগানে যাদের উপর তান্ডবলীলা চালিয়েছে, তারা কি নিরপরাধ ছিলনা ??!!! এভাবে আপনি বলে যেতে থাকুন...। এরপরও যদি সে আপনার কাছে কোন প্রশ্ন করে, তবে আপনিও উল্টা প্রশ্ন করতে থাকুন।

কুরআনে কারীমও দাওয়াতের পর্যায় আমাদেরকে এভাবেই শিখিয়েছে। যখনই কাফেররা কোন বিশেষ বিধানকে কেন্দ্র করে মুসলমানদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাতে চেয়েছে, কুরআনে কারীমও কোন প্রকার সাফাই গাওয়ার পরিবর্তে তাদেরকে আক্রমণমূলক জবাব দিয়েছে। ইহুদীরা যখনই ইসলাম বা মুসলমানদের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন আরোপ করেছে, তখনই কুরআনে কারীম তাদের প্রকৃত চেহারার বর্ণনা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

বর্তমান সময়ের মুসলিম জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ইহুদীদের প্রশ্নগুলি শুনে প্রতিরক্ষা বা অপারগতাপ্রকাশমূলক পন্থা অবলম্বন করে ফেলে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়-(নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তা'লা জিহাদের বিধান নাযিল করে মুসলমানদেরকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন। তাই প্রতিরক্ষা করতে করতেই তারা সময় পার করে দেয়। ফলে প্রকৃত বিধানের দিকে আসারই কোন সুযোগ হয়না। সুতরাং আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে যে, সর্বসাধারণ যেন প্রকৃত বিধান এবং সমস্যার মূল কারণটি জানতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ নিজেদের টিভিচ্যানেল থাকা দরকার কিনা ?? এব্যাপারে অধিকাংশ লোকই চায় যে, তাদের নিজস্ব একটি টিভি চ্যানেল থাকা চাই। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তো এক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামই

বলতে পারবেন। অধম ছাত্রের এ যোগ্যতা নেই যে, এব্যাপারে কোন কিছু বলে দেবে। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, বর্তমানে অধিকাংশ লোকেরই টিভিচ্যানেল পরিচালনা সিষ্টেম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান নেই। আপনি যদি মনে করেন যে, নিজস্ব টিভিচ্যানেল খুলে দিয়ে আপনি কুফর ও ইসলামের এ যুদ্ধে মানুষকে বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করবেন, তাহলে আপনার ধারনাটি ভুল। হক এবং বাতিলের বিষয়ে আপনাকে তাই দেখাতে হবে, যা বাতিল চাইবে। যেমন ধরুন- আফগানিস্তানের উপর মার্কিন আগ্রাসনকে কূটনৈতিক যুদ্ধ বলে আপনি আমেরিকার সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু হাদিসে নববীর আলোকে এদেরকে দাজ্জালের সৈন্য সাব্যস্ত করার কোন অধিকার আপনাকে দেয়া হবেনা। বিশ্বের যে কোন সরকারের উপর যত খুশি সম্ভব সমালোচনার তুফান চালাতে পারবেন, কিন্তু অনিষ্টতার মূল ইবলিসের সিষ্টেম নিয়ে কোন প্রকার সমালোচনা সহ্য করা হবেনা। বরং গণতন্ত্রের ঐ মূর্তিটাকে আপনার ঠিকই পূজা করতে হবে। আপনি যে মিডিয়াকে স্বাধীন কন্ঠের বাহক মনে করছেন, তারা মূলত ইহুদী এজেন্টদের মজবুত শিকলে বাধা এমন সব সংগঠন, যারা তাই প্রকাশ করতে সক্ষম হবে, যা দাজ্জালী শক্তি চাইবে। যদি কখনো কোন সাংবাদিক, কলামিষ্ট, পৃষ্ঠপোষক বা টিভির এ্যংকর পার্সন তাদের মর্জির বিরুদ্ধে যাওয়ার মত ভুল করে বসে, তাহলে পরিণামে এর চড়ামূল্য প্রদান করতে হবে। ঘটনার ধরণ হিসেবে পরিণাম ভোগ করতে হবে। চাকরী হতে সাসপেন্ড থেকে শুরু করে জীবনের আরাম আয়েশ থেকে পর্যন্ত হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। বদমায়েশীর এ রাস্তায় বাহ্যিকভাবেও তারা সদাতৎপর। এমনকি প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়েও যদি কেউ প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার প্রচেষ্টা করে, তবে প্রোগ্রাম চলাকালীন সময়েই মূল সেন্টার থেকে চ্যানেলের লাইন কেটে দেয়া হয়।

আপনার যদি কোন টিভিচ্যানেল নাও থাকে, তবুও ময়দান ছেড়ে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। হাতে হাতে পৌছে দেয়া, কম্পিউটার টু কম্পিউটার, ম্যান টু ম্যান, এধরনের সুবিধাগুলিকেও আমরা ব্যবহার করতে পারি। এ ব্যাপারে আমরা আবূ মুসআব যারকাভী শহীদ রহ. এর কার্যক্রমগুলি থেকে উপকৃত হতে পারি। যারকাভী শহীদ রহ. শুধুমাত্র ময়দানেই আমেরিকাকে পরাজিত করেছিলেননা। বরং তাদের মিডিয়া স্থানসমূহ, মিডিয়া ব্যক্তিবর্গের উপরও এমন অপারেশন চালিয়েছেন, যদ্দরুন ইউরোপিয়ান সেনাবাহিনীর পাশাপাশি ব্রিটেন এবং আমেরিকাও ইরাক থেকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষনা প্রদানে বাধ্য হয়েছিল।

আমাদের ঐ ব্যাপারেই চিন্তা করা উচিত, যা আমাদের সাধ্যের ভেতরে আছে। সাধ্যের বাইরের বস্তু নিয়ে চিন্তা করে সময় নষ্ট করার কোন ফায়দা নেই। আপনি জিহাদের ময়দানের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করুন, না পারলে কমছেকম ময়দান থেকে আসা সংবাদগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়ে এর বিরোদ্ধে সৃষ্ট অপপ্রচারগুলিকে দমন করেন এবং লোকদেরকে প্রকৃত বাস্তবতার জ্ঞান দেন। এক্ষেত্রে নিজের বন্ধুবান্ধবকেও সাথে নিন। ইমেইল, চিঠি, লিফলেট, ম্যাসেজ ইত্যাদি সকল প্রকার যোগাযোগ মাধ্যম দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজে লেগে পড়ুন এবং বেশি বেশি মেহনত করতে থাকুন। আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন অবশ্যই আপনার মেহনতে বরকত দান করবেন। তবে শর্ত হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার নিয়তে আল্লাহর দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে...। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন!! আমীন।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, দাজ্জালের সহযোগী

বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কি ? ইহুদীদের ব্যবহৃত আইএমএফের দ্বিতীয় নাম হচ্ছে বিশ্বব্যাংক। এর হর্তকর্তা সকলেই ইহুদী।

শয়তানদের কেন্দ্র... বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W.T.O)

এটা হচ্ছে ঐ শয়তানী কেন্দ্র, যেখানে মানবতার সকল খুটি ভেঙ্গে একমাত্র ইবলিসকে সন্তুষ্ট করার সকল চুক্তি সম্পাদন করে রাখা হয়েছে। এতে অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্যই পা থেকে মাথা পর্যন্ত শয়তানী গুণে গুণান্বিত। যাদের ধর্মই হচ্ছে হেসে খেলে সরলতার সাথে বেড়ে উঠা জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ব্যাধির মাধ্যমে আক্রান্ত করে ফেলা, পরে এসকল রোগীর উপর নিত্যনতুন গবেষণা আর চক্রান্ত চালিয়ে যাওয়া।

বায়োলোজিক অস্ত্রের ব্যাপারে গবেষণার ক্ষেত্রে সংস্থাটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। অতপর এ অস্ত্রগুলো পরীক্ষার জন্যও তাদের কাছে প্রশস্ত ময়দান মজুদ রয়েছে। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উপর তারা এ পরীক্ষা চালিয়ে থাকে। বিশেষত দুর্ভিক্ষ জনিত এলাকার রোগীরা এদের সহজ শিকারে পরিণত হয়, এমন অনেক ঘটনাই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্যক্ষ করা গেছে। কিন্তু যে পদক্ষেপগুলো তাদের থেকে গোপনে সম্পাদিত হয়, তা আরো বেশি ভয়ানক। কারণ, এ শয়তানেরা ডাক্তারের বেশ ধরে শরণার্থীদের কাছে যেয়ে থাকে। অতপর মহামারী বা দুর্ভিক্ষ কবলিত এলাকাগুলোতে তাদেরকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকেনা। তাই যে ঔষধপত্র রোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়, তা যেমনই হোক, সেবন করতেই হবে। এভাবেই হিংস্র ডাক্তারগণ সহজেই তাদের জীবাণু মেশানো ঔষধগুলোর পরীক্ষা সেরে ফেলতে পারে।

রাসায়নিক জীবাণু সমৃদ্ধ রুটি মানুষের মাঝে বিতরণ করার ঘটনাও রেকর্ডে বিদ্যমান। পোলিওর ফোটার আকৃতিতে ভয়ানক পর্যায়ের জীবাণু অস্ত্র বর্তমান সময়ে অত্যন্ত সফলতার সাথেই বিশ্বের প্রতিটি দারিদ্র অঞ্চলের শিশুদেরকে পান করানো হচ্ছে। এই পোলিও'র ফোটা থেকেই মারাত্মক ধরনের রোগ এমনকি এইডস পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে।

এইডস (H.I.V)ভাইরাসের ব্যাপারে তো এখন একথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, এসকল হিংস্র ডাক্তারগণই ল্যাবরেটরীর ভেতরে ভাইরাসটি সৃষ্টি করে সারাবিশ্বে তা ছড়িয়ে দিয়েছে। পদক্ষেপটি যথারীতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O)র লিখিত অনুমতির মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবেই সংস্থাটি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন অমানুষিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে থাকে। এগুলো করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চুরি করা হয় বা বিভিন্ন হাসপাতালে মানুষের দেহ থেকে ডাকাতি করা হয়।

এমনই মানবাঙ্গ চুরির সময় ব্রিটেনের একটি হাসাপাতাল থেকে এক ডাক্তারকে গ্রেফতার করা হয়, বিশ বৎসর যাবত সে এভাবে একের পর এক মানুষের দেহ থেকে অঙ্গ চুরি করে যাচ্ছিল। অপর এক হাসপাতালে শিশুদের মস্তিস্ক বের করে নিয়ে প্রাইভেট সংস্থাগুলোর কাছে তা বিক্রি করে দেয়া হত।

শিশুদেরকে জবাই করার ঘটনা আপনি বিশ্বজুড়ে শুনতে পাবেন। কিন্তু এতটুকু জেনে রাখুন যে, যেসকল অপরাধীকে এসব ঘটনার দায়ে গ্রেফতার করা হয়, তারা আসলে মূল অপরাধী নয়; বরং পুলিশকে পর্যন্ত মিডিয়ার "চারা" বানিয়ে জনগণের সামনে পেশ করা হয়। মূল শয়তানদের দিকে কোন তদন্ত বা কোন টিভি সাংবাদিক কর্তৃক আঙ্গুল উঠানোর ন্যুনতম দুঃসাহসটি করার অনুমতি নেই।

বংশীয় ধারাবাহিকতা বন্ধ করার ষড়যন্ত্র...

দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া মুসলিম জনসংখ্যা অবশ্যই দাজ্জালের অনুসারীদের জন্য টেনশনের কারণ। বহুদিন ধরেই ইহুদী বৈজ্ঞানিক, আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ, মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীসমূহ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, পেন্টাগন অধিপতি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শয়তান ডাক্তারগণ মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাসের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তৎপর রয়েছে। এতদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ১০ ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে মিসরে সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে "ন্যাশনাল সিকিউরিটি ষ্টাডি মেমোরিন্ডম-২০০" শিরোনামে দুইশত পৃষ্ঠার একটি ক্লাসিফাইড রিপোর্ট পেশ করা হয়। যা বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠী কন্ট্রোলিং বিষয়ে সন্নিবেশিত ছিল। রিপোর্টটির মূল আলোচনা ছিল- "বিশ্বজুড়ে বিশেষত পূর্ব-বিশ্বের দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আমেরিকার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাড়াতে পারে। তাই এ হুমকির বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা দরকার। পাশাপাশি এতদাঞ্চলের বাড়তে যাওয়া জনগোষ্ঠীকে ক্রমান্বয়ে কন্ট্রোল করা দরকার। যুদ্ধ বা রাসায়নিক জীবাণু ব্যবহার করে এদের কন্ট্রোল করা যেতে পারে।" প্রোগ্রামটিকে (NSSM-200)নামে চিহ্নিত করা হয়।

পরবর্তীতে প্রোগ্রামটিকে এমনভাবে বাস্তবে রূপ দেয়া হয় যে, মুসলিম বিশ্বের কোন ঘর এবং কোন সদস্যই এর কুপ্রতিক্রিয়া থেকে নিরাপদ থাকতে পারেনি। প্রোগ্রামটি বাস্তবায়নে উল্লেখ্যযোগ্য ভুমিকা রেখেছে ইহুদী মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীসমূহ। তারা খাদ্য ও পানীয় বস্তুগুলোতে এমন সব ক্যামিকেল মিশ্রণ করে দিয়েছে, যেগুলি জনগোষ্ঠী কন্ট্রোলের কাজকে আরো সহজ করে দিয়েছে। যেমন- আয়োডিনযুক্ত লবণ, বেনাস্পাতী ঘি, কোকিং অয়েল ইত্যাদি; যা মানুষের জন্য এমন ধ্বংসাত্মক পরিনামের কারণ যে, এগুলির বর্তমানে দ্বিতীয় কোন পদক্ষেপ নেয়ার দরকারই পড়বেনা। কিন্তু দাজ্জালের অনুসারীরা শুধু এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং শিশুদের জন্য ডিব্বা/প্যাকেটে থাকা দুধ থেকে শুরু করে পেপসি, কোকাকোলা এবং অন্যান্য সকল পানীয় বস্তুর মাধ্যমে সুস্থ্য সবল ব্যক্তিদেরকেও হাসপাতালের বিছানার সাথে সেট করে দিয়েছে। বাচ্চাদের চকোলেট, আইসক্রিম- এরকম প্রায় ছয় হাজার বিষাক্ত ক্যামিক্যাল মিশ্রিত খাদ্য ও পানীয় বাজারে বিক্রি হচ্ছে। যার ফলাফল আপনি মুসলিম দেশগুলোর হাসপাতালের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন। শুধুমাত্র কোল্ড ড্রিংকস ব্যবহারের ফলে ডায়াবেটিস ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পেপসি (papsi) এর অর্থ জানেন...?? এটা হচ্ছে একটি সংক্ষিপ্ত শব্দ, বিস্তারিতটি হচ্ছে- Pay a Pound for Save Israel (অর্থাৎ ইসরায়েলকে বাঁচানোর জন্য একটি টাকা খরচ করুন)।

আপনি যদি দাজ্জাল এবং তার শয়তান ইহুদীদের সম্পর্কে পূর্বে থেকে কিছু জেনে থাকেন, পাশাপাশি এও জানেন যে, পৃথিবীর জনসংখ্যা বিশেষত মুসলিম জনসংখ্যা হ্রাস করা তাদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ! তাহলে কঠিন বাস্তব একথাটিও আপনি জেনে রাখুন যে, তারা আপনার হাত ব্যবহার করেই আপনার বর্তমান বংশকে এমন বিষ পান করাচ্ছে, যার কুপ্রতিক্রিয়াসমূহ কয়েক বৎসরের ভেতরেই প্রকাশ হতে শুরু করবে। এটা হচ্ছে পোলিওর ফোটা...। এটা এমন একটি ফোটা; যার প্রকৃত বাস্তবতা না জানে সরবরাহের দায়িত্বে থাকা লোকজন, আর না জানে বাচ্চাদের সরলমনা পিতা-মাতা।

পোলিও এর ফোটা... এইডসে আক্রান্ত হওয়ার কারণ !

বিষয়টি সম্পর্কে যারা অবহিত নয়, তাদের জন্য এ গবেষণা রিপোর্টটি দৈনিক "উম্মত করাচী" পক্ষ থেকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে প্রকাশ করা হচ্ছে। রিপোর্টটি সাইন্সি গবেষণা ও সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকদের মতামত অবলম্বনে নেয়া হয়েছে। তাই এর বিপরীতে কোন অজানা জ্ঞানী ব্যক্তির ফতোয়া বা কোন রাজনৈতিক নেতা কর্তৃক দেয়ালের পোষ্টার গ্রহণযোগ্য নয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের এই আন্তর্জাতিক সমস্যার কারণে শুধুমাত্র আফ্রিকার দারিদ্রপিড়ীত ও মুর্খ জনগোষ্ঠী কিংবা পাকিস্তানের ইসলামপন্থী মানুষই শিকার হয়নি; বরং বিশ্বজুড়ে বড় বড় জ্ঞানিব্যক্তিবর্গ, সুদক্ষ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ এবং বিশ্ব জনগোষ্ঠী রক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীলগণ প্রথম দিন থেকেই পোলিওকে মানবতার বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করে আসছেন। অথচ এসকল সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মতামতকে উপেক্ষা করে মিডিয়া যথারীতি জনগণের সামনে হরহামেশা প্রচার করে যাচ্ছে।

বিশ্ব আফ্রিকার কয়েকটি বড় জনগোষ্ঠীকে এর কবলে পড়ে ধ্বংস হতে দেখেছে। রুচিশীল গবেষকদের দাবী- আফ্রিকার ঐ সকল গনগোষ্ঠীর ৫০%-ই নিঃশেষ হয়ে গেছে। অন্যান্য গবেষকদের মতে- প্রায় ৭০%-ই ধ্বংস হয়ে গেছে। যাঈর, উগান্ডা, এবং দক্ষিন সূদানের জনগোষ্ঠী এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- এ পরিস্থিতিগুলো কি শুধুই ঘটনাক্রমে ঘটে গেছে ??

১৯৬৭ সালে সবুজ বানর লালন পালনের দায়িত্বে নিয়োজিত সাতজন গবেষক অজানা ও রহস্যময় হাইমোরজেক ফিউরে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এ গবেষকগণ জার্মানীর বিখ্যাত শহর "মারবারক"এ গবেষণার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এর ঠিক দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে রহস্যময় এই হাইমোরজেক ফিউরে আক্রান্ত হয়েই দশ হাজার মানুষের প্রাণহানী ঘটে। এ সবই কি ঘটনাক্রমে ঘটে গেছে ??!! অতপর ১৯৭৬ সালে হাইমোরজেক ফিউরেরেই আরেকটি ভাইরাস দক্ষিন সূদান পরে যাঈর এলাকায় মানুষের লাশের স্তুপ বানিয়ে দেয়। এর কিছুকাল পূর্বেই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গোটলিপ স্বীয় অপরাধ স্বীকার করতে গিয়ে বলেছিল যে, ১৯৬০ সালের মাঝামাঝিতে সে যাঈরের কঙ্গো সাগরের পানিতে বিশাল পরিমাণে ভাইরাস মিশিয়েছিল। তার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী- কঙ্গো সাগরের পানি ব্যবহারকারী মানুষদেরকে ভাইরাসে আক্রান্ত করার জন্যই সে এমনটি করেছিল। পরে শাস্তি হিসেবে ডাক্তার গোটলিপকে ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটের সভাপতি বানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

১৯৮৯ সালে দক্ষিণ সূদানে ৬০০০০ (ষাট হাজার) মানুষ এইডস সদৃশ এক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। পরে রোগটির নাম দেয়া হয়- The Killer বা হত্যাকারী ব্যাধি। কালবৈশাখির ন্যায় গ্রামের পর গ্রাম- বংশের পর বংশকে সে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। এই ব্যাধির নিদর্শন ঠিক এইডসের মতই ছিল। এর মাধ্যমে মানুষের আইমিউন Immune সিষ্টেম ধ্বংস হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় একটি ইনফেকশান দেহে প্রবেশ করে প্রাণকে কেড়ে নেয়।

মধ্য আফ্রিকা অঞ্চল থেকে নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত পুরো এলাকা খনিজ সম্পদে ভরপুর। ঐ সকল এলাকাতে আশ্চর্য ও অস্বাভাবিক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়া এবং পরে তা সম্পূর্ণ ধ্বংসের কবলে পড়ে যাওয়া, ফলশ্রুতিতে হাজারো, লাখো মানুষের প্রাণহানি ঘটা, এ সবই কি ঘটনাক্রম ??!! শুরুতে এইডস ব্যাধিকে অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাধি বলে নাম দেয়া হয়। এইডস ভাইরাস আসলেই কি প্রকৃতিগত ভাইরাস, যা আফ্রিকী সবুজ বানর কর্তৃক এক মহিলাকে কামড় দেয়ার ফলে ছড়িয়ে পড়েছিল ??

১৯৮৩ সালে ডাক্তার স্ক্রেট "লস এ্যাঞ্জেলসে 'গেসটার ভাইনটিযোলোজী' নিয়ে গবেষণা করতেন। তিনি একজন সুদক্ষ প্যাথোলোজিষ্ট এবং ফার্মাগোলোজীতে পিএইচডি করা প্রসিদ্ধ একজন গবেষক। তিনি এবং তার ভাই "অটরী টেড সিকিউরিটি প্যাসিফিক ব্যাংক অফ ক্যালিফোর্নিয়া"র 'হেলথ মেইনটেইন্স অরগানাইজেশানে'র জন্য কিছু ব্যবস্থাপনা প্রস্তুত করছিলেন। এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের উপর গবেষণা করে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যাচাই করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৮৩ সালে এইডসের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্যাদি ডাক্তারদের জানা ছিলনা। এই দুই ভাইয়ের কাছে একটি অপশনেই বাকী রয়েছিল যে, তারা উভয়েই যেন শুধুমাত্র এই নতুন ভাইরাসের ডাক্তারী লেট্রেচারীর উপর গবেষণা করে। গবেষণার সূত্রপাত ঘটেছিল এক বিস্ময়কর রহস্যের মধ্য দিয়ে। বিশ্বাস করাটাই তাদের জন্য কাল্পনিক মনে হচ্ছিল। এই দুই ভাইয়ের জানা ছিলনা যে, গবেষণাটি তাদের জীবনের ধারাই পরিবর্তন করে দেবে। তাদেরকে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এমন এক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, যার সমাপ্তি ঘটবে "স্ক্রেটার মেমোরিন্ডম" আবিস্কারের মধ্য দিয়ে। "দ্যা স্ক্রেটার মেমোরিন্ডম" ভিডিও টেপরেকর্ডটি যুগের সবচে' মতানৈক্যের বিষয় বলে সাব্যস্ত হয়। এই ভিডিও টেপরেকর্ডের সাথে এমন একটি স্মরণীয় ব্যবস্থাও অস্তিত্ব লাভ করে, যাকে "দ্যা বায়ো এ্যাটাক এলার্ট" বলে নাম দেয়া হয়।

মেডিক্যাল লেট্রিচার ষ্টাডিকালীন সময়েই দুই ভাইয়ের কাছে এ বাস্তবতা ধরা পড়ে যে, এইডস ভাইরাস সম্পর্কে আসলে আরো কয়েক বৎসর পূর্বেই পরিচয় ঘটেছিল। এরপর "ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশান (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা)র বৈজ্ঞানিকদের পক্ষ থেকে তাদের কাছে একটি লিখিত দরখাস্ত পেশ করা হয়, দরখাস্তে বৈজ্ঞানিকগণ সংস্থার পক্ষ থেকে এইডস-জাতিয় ভাইরাস আবিস্কার এবং মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়া বিস্তার নোট করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা চাওয়া হয়। পরবর্তীতে ডাক্তার স্ক্রেট এমন হাজারো প্রমাণাদী পেশ করেছিলেন, যার মাধ্যমে একথাই সাব্যস্ত করেছিলেন যে, এইডস ভাইরাস হচ্ছে মূলত মানুষেরই আবিস্কৃত এক ভাইরাস (সবুজ বানর থেকে সৃষ্ট ভাইরাস নয়)।

ভিডিও টেপরেকর্ডটি বিশেষত ডাক্তারদের জন্য খুবি গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে ডাক্তার স্ক্রেট একের পর এক প্রমাণাদী আবিস্কার করছিলেন, যার মাধ্যমে সাব্যস্ত হচ্ছিল যে, এইডস মানুষেরই আবিস্কৃত এক ভাইরাস। অপরদিকে বিশ্বজুড়ে সরকারী কর্মকর্তা, ডাক্তার এবং মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণকে একথা শুনানো হচ্ছিল যে, আফ্রিকার একটি বন্য সবুজ বানর ওখানকার স্থানীয় এক মহিলাকে কামড় দিলে মহিলাটি এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যায়। পরে মহিলা থেকে আস্তে আস্তে ছড়াতে ছড়াতে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ডাক্তার স্ক্রেটের গবেষণায় আরো ধরা পড়ে যে, এইডস ভাইরাসটি ল্যাবরোটরীর মধ্যে শুধু আবিস্কারই হয়েছিলনা; বরং ভাইরাসটিকে ব্যবহার পর্যন্ত করা হয়েছিল এবং আবিস্কারকগণ জানত যে, ভাইরাসটি মানবসন্তানদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। পরবর্তীতে ডাক্তার স্ক্রেট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রদেশভিত্তিক মার্কিন সকল গভর্ণর, সিনেটর, প্রসিদ্ধ ডাক্তার এবং মেডিক্যাল সংস্থাগুলোর বরাবরে এ বিষয়ে বহু চিঠি প্রেরণ করলেও তারা বিষয়টিকে কোন পাত্তা দেয়নি। এতসব চিঠিপত্রের মধ্য থেকে শুধু মার্কিন গভর্ণরদের পক্ষ থেকে তিনটি চিঠির উত্তর ডাক্তার স্ক্রেটের হস্তগত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ এ রিপোর্টটি ১৯৮৭ সালের ১১ মে লন্ডনের উল্লেখযোগ্য দৈনিক পত্রিকা "দি টাইমসের ফ্রন্ট পেজে লিপিবদ্ধ করা হয়। যার শিরোনাম ছিল- "সুস্থতার জন্য ব্যবহৃত টিকার মাধ্যমে এইডস ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে" (Smallpox Vaccine Triggered AIDS Virus)। পেরিস রাইট (Pearce Wright)এর এ রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক কনসালটেন্ট বিভিন্ন সংগঠনকে রিপোর্ট প্রদান করে

যে, জিম্বাবুয়ে, যাঈর এবং ব্রাজিলে এ ভেক্সিনেশান এবং এইডস ভাইরাস ছড়ানোর ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। গবেষণার পর সন্দেহগুলো সঠিক সঠিক প্রমাণিত হয়। কনসালটেন্ট বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কাছে রিপোর্টটি পেশ করলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তা প্রকাশ করেনি। (সূত্র- www.health.org.nz/aids.html)

প্যারিস রাইটের পক্ষ থেকে পরবর্তীতে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় যে, তাহলে ব্রাজিল কেন ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে সবচে' বেশি এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত হল ?? হাইতি থেকে আমেরিকা পর্যন্ত এইডসের রোড কিভাবে সৃষ্টি হল ?? ব্রাজিলই ছিল দক্ষিণ আমেরিকার একমাত্র দেশ; যে ভেক্সিনেশান পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করেছিল এবং পরবর্তীতে তারাই এইডস ভাইরাসে সবচে' বেশি আক্রান্ত হয়েছিল। এ সবই কি ঘটনাক্রমে ঘটে গেছে ??!! আফ্রিকার যাঈর দেশে ৩৩ মিলিয়ন পোলিও টিকা বিতরণ করা হয়েছিল, জিম্বাবুয়েতে ১৯ মিলিয়ন, তানজানিয়ায় ১৪ মিলিয়ন। হাইতির একলক্ষ চল্লিশ হাজার বাসিন্দা মধ্যআফ্রিকায় বসবাসরত ছিল, এদের সবাইকেই টিকা খাইয়ে তাদের ঘরবাড়ী লুট করে নেয়া হয়।

রাইটের মতে- একই মাসে জেনেভায় এক মিটিংয়ের পর ৫০ জন বিশেষজ্ঞ ঘোষনা করেছিল যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ৭৫% মানুষ পরবর্তীতে পাঁচ বছরের মধ্যে এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে পড়বে (অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার একতৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী)। এ সবই কি ঘটনাক্রমে হয়ে গেছে ??!! পরবর্তীতে ল্যাবরেটরীতে গবেষণারত মার্কিন ডাক্তারদের কাছে এবিষয়ে আরো অনেক তথ্য উন্মোচিত হয়, কিন্তু সবাই মার্কিন সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারী হওয়ায় মুখে তালা দিয়ে রাখে। ।

১৯৬৯ সালে মার্কিন চিকিৎসাবিষয়ক ম্যাগাজিন "জেনারেল মেডিক্যাল নিউজ"এ ইউনিভার্সিটি অফ সেডর্ন ক্যালিফোর্নিয়ার ডাক্তার "ভেলার ডেলমার মেলজিট"এর রিপোর্ট ফ্রন্ট পেজ-এ ছাপানো হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী- ৩৮ জন মানুষের উপর পরীক্ষা চালানোর পর সাব্যস্ত হয়েছে যে, এজাতিয় ভেক্সিন ক্যান্সার (টিউমার) সৃষ্টির কারণ। এই ৩৮ জন কখনোই ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলনা, কিন্তু যখনই এ ধরনের ভ্যাক্সিন তাদের খাওয়ানো হয়, তখনই তাদের শরীরে ক্যান্সারের প্রাথমিক নিদর্শন প্রকাশ হতে শুরু করে।

১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে মার্কিন সেনা এ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি (ARPA)এর ডাইরেক্টর "ডক্টর মেক আর্থার" কংগ্রেসের সামনে বিবৃতি প্রদান করেন- এ এজেন্টগুলো AIDS তথা (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ছিল। ARPA কর্তৃক এইডস নামক জনসেবামূলক এ এজেন্ট তৈরী করার জন্য দশলাখ ডলার চাওয়া হয়। এটি এইডস ভাইরাস জনসমক্ষে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্বের ঘটনা। কংগ্রেসের সামনে ডক্টর একথাটিও পর্যন্ত বলেছিলেন যে, ইস্যুটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমধর্মী, যদ্দরুন অনেকেই এর বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। কেননা, তাদের মনে- বিষয়টি পৃথিবীর বড় বড় জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেয়ার ষড়যন্ত্র ছিল।

১৯৬১ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত যখন পেন্টাগনে এ বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা চলছিল, তখন রবার্ট মেক নামারা" সেক্রেটারী অফ ডিফেন্সের দায়িত্বে ছিল। ১৯৬৯ সালে ক্লার্ক কেলিফোর্ড নামক অপর ব্যক্তি তার স্থলাভিষিক্ত হয়। ১৯৭০ সালের ২ অক্টোবর (যখন ডাক্তার মেক আর্থার কর্তৃক কংগ্রেসের সামনে বিবৃতির ১৫ মাস অতিবাহিত হয়েছিল এবং রবার্ট মেক নামারা বিশ্বব্যাংকের সভাপতি ছিল) রবার্ট ম্যাক তত্তাবধায়ক নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ঘোষনা করেছিল- "নিশ্চিতভাবে তো এখন পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছেনা, তবে পৃথিবীর অধিবাসী ১০ লক্ষ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাওয়া থেকে শুধুমাত্র দু'টি পন্থাই বাঁচাতে পারে : এক- বিশ্বজুড়ে জন্মের হারকে দ্রুতগতিতে নিচে নামানো হোক। দুই- মৃত্যুর উপকরণগুলি বিশ্বজুড়ে বেশিকরে ছড়িয়ে দেয়া হোক। এছাড়া তৃতীয় আর কোন রাস্তা নেই।

দীর্ঘ এ আলোচনার মাধ্যমে তিনটি পয়েন্ট আমাদের সামনে এসেছে। প্রথমে এগুলো নোট করে নিন :-

(১) প্রথমবার যখন কংগ্রেসের সামনে ডক্টর মেক আর্থার জনসেবমূলক এজেন্টদের প্রসঙ্গ উঠান, তখন রবার্ট ম্যাক সেক্রেটারী অফ ডিফেন্সের দায়িত্বে ছিল অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তি।

(২) জনসেবমূলক ঐ এজেন্টগুলো তৈরীর ব্যাপারে ১৫ মাস অতিবাহিত হয়েছিল, তখন রবার্ট ম্যাক বিশ্বব্যাংকের সভাপতি ছিল। বিশ্বব্যাংকই হচ্ছে একমাত্র সংস্থা; যে বিশ্বের সকল অর্থনৈতিক লেনদেন অর্থাৎ পৃথিবীর ইকোনোমি সিষ্টেমকে কন্ট্রোল করে থাকে।

(৩) রবার্ট ম্যাক দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া জনবসতিকে ভবিষ্যতের জন্য সবচে' বড় হুমকি বলে আখ্যায়িত করে। এগুলো কন্ট্রোল করার জন্য মাত্র দুটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছে :- জন্মের হার কমানো এবং মৃত্যুর হার বাড়িয়ে দেয়া।

Promise and Power হচ্ছে রবার্ট ম্যাকের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত। ডিবোরা শ্যাপেল (Deborah Shapley)এর লেখা এ গ্রন্থটি "লিটল ব্রাউন বুষ্টানে ১৯৯৩ সালে ছাপানো হয়। গ্রন্থটিতে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দিন-দিন বৃদ্ধি পাওয়া জনগোষ্ঠী কন্ট্রোলের ব্যাপারে রবার্ট ম্যাকের পলিসিগুলো তুলে ধরা হয়। যেখানেই জনসংখ্যা অধিক হারে বেড়ে যাওয়ার বিষয় উঠেছে, সেখানেই রবার্ট ম্যাক পৃথিবীর অধিবাসী হ্রাস করার অত্যাধিক প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। গ্রন্থটির কিছু চুম্বক অংশ লক্ষ করুন... :-

১৯৬৬ সালে রবার্ট ম্যাক পৃথিবীবাসীকে এই বলে সতর্ক করে যে, পৃথিবীর অধিবাসী GNP (Gross National Product)এর বিপরীতে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর তাই বিশ্বব্যাংককে এ বিষয়ে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ১৯৬৯ সালে ইউনিভার্সিটি অফ নটরডেমের গভর্ণরদের সামনে ভাষন প্রদানকালে রবার্ট বলেন- জনবসতির বিস্ফোরণ এটম বোমা বিস্ফোরণের চাইতেও ভয়ানক ব্যাপার (পৃষ্ঠা-৪৮০)। রবার্ট তার বক্তব্যকে এভাবে সামনে বাড়ায়- যে সকল বাচ্চারা মরে যাচ্ছে, তারা জীবিত অশিক্ষিত ও দুর্বলপ্রকৃতির বাচ্চাদের থেকে বেশি সৌভাগ্যশীল।" রবার্ট ম্যাকের বায়োগ্রাফিতে শ্যাপলে আরো বলেন- পৃথিবীতে বিশ্বব্যাংকের বরাত দিয়ে রবার্ট ম্যাকের এ দর্শনগুলো সম্পূর্ণ নতুন ইস্যু ছিল। বিশ্বব্যাংকের উচ্চস্তরের নেতৃবৃন্দও এনিয়ে বিস্ময়ে ছিলেন যে, নবাগত এ সভাপতি এরকম মতাদর্শ কোত্থেকে আবিস্কার করল!! আর হঠাৎ করে এতসব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামনে বোমা বিস্ফোরণের প্রসঙ্গের সাথে কেন এর তুলনা করল!!

১৯৭৩ সালে রবার্ট ম্যাক বিশ্বব্যাংককে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করে যে, বিশ্বব্যাংক যেন বিশ্বের বৃদ্ধি পাওয়া জনগোষ্ঠীর বিষয়টি খাদ্যাভাব এবং দারিদ্রতার সাথে সম্পৃক্ত করতে সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করে (পৃষ্ঠা-৫১০)।

১৯৭৩ সালে নাইরোবী (কেনিয়া)তে বিশ্বব্যাংকের বাৎসরিক গভর্নিং বৈঠকে রবার্ট ম্যাক একটি থিসিস (Quantitative Goals For Population)পেশ করে। অতপর নাইরোবী এবং রবার্ট ম্যাকের জনগোষ্ঠী কন্ট্রোলের পাঁচ বৎসর পূর্তি হয়ে গেল। ঘটনার সাদৃশ্যতা লক্ষ করুন- পরবর্তীতে নাইরোবী এবং কেনিয়া এইডস ভাইরাসের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে স্বীকৃত হয়। কেনিয়া এবং উগান্ডা হচ্ছে ঐ সকল পূর্ব-আফ্রিকান দেশ, যেখানে এইডস মহামারীর রূপ ধারণ করে আছে। বর্তমান সময়ে ওখানকার প্রায় ৫০%এরও বেশি জনগোষ্ঠী এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত।

(১) ১৯৭৪ সালে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়- Who Murdered Africa? (কে হত্যা করল আফ্রিকাকে ?) ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্পবেল ডগলাসের (এমডি) এ রিপোর্টটি পশ্চিমাবিশ্বে রীতিমত হৈচৈ ফেলে দেয়। ডক্টর উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার ঐ রিপোর্টে লেখেন- HIV (এইডস ভাইরাস)টি গবেষণার শেষ পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে তৈরী করা হয়। (ডগলাস এক্ষেত্রে Genetically Engineered ভাষা ব্যবহার করেছেন) যে, প্রথমে এব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, অতপর তা প্রস্তুত করার আবেদন জানানো হয়, পরিশেষে তা তৈরীও হয়ে যায়। ডগলাস আরো বলেন- এইডস ভাইরাস তৈরীর বিষয়টি কোন দুর্ঘটনা ছিলনা যে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক গবেষণার এক পর্যায়ে তা আবিস্কার হয়ে গেছে; বরং এটি অত্যন্ত গভীরভাবে গবেষণার পর তৈরীকৃত হত্যাকারী এক ভাইরাস ছিল। আর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এরই সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে। ১৯৭০ দশকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর পর থেকে আফ্রিকায়

এইডস ছড়ানো শুরু করে। এটি কোন অঘটন ছিলনা; বরং জেনেশুনেই তা করা হয়েছিল।"

পাঠকদের জন্য "ইলেন কেন্টল"এর গ্রন্থ Aids and Doctors of Death: An Inquiry Info the origin of Aids Epidemic অধ্যয়ন অনেক উপকারে আসবে। ক্যান্সার রিসার্চের বরাত দিয়ে নিউয়োর্ক সিটি, লস এ্যাঞ্জেলস এবং সান ফ্রান্সিসকো শহরের দৈহিক সঙ্গমে অভ্যস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে হেপিটাইটিস বি ভেক্সিনের মাধ্যমে এইডস ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। আফ্রিকার অধিবাসীদের মাঝে ভেক্সিনের মাধ্যমে কিভাবে এইডস ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল ?? বিষয়টি বিস্তারিত প্রমাণাদি সহকারে ফাইলে বিদ্যমান রয়েছে। শুধু এতটুকুই নয়; বরং ইলেন কেন্টল স্বীয় গ্রন্থে এ পুরো ষড়যন্ত্রটি বাস্তবায়নের জন্য সরকার কর্তৃক সার্বিক সহযোগীতার বিষয়টিও প্রমাণ করেছেন। ডক্টর পিটার ডিউযবার্গ হচ্ছেন "ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া"র ব্রেকেলে বায়োক্যামিষ্ট্রি এবং মালিকিভিয়ারবিয়োলোজীর প্রফেসর, বিশ্বনন্দিত রাইটার এবং ভায়ারলোজিষ্ট। তারই এক বন্ধু ওয়াল্টারগাল ব্রিট' (নোবেল পুরস্কার বিজয়ী) উভয় বৈজ্ঞানিক মিলে এইডসের প্রকৃত রূপ জনসমক্ষে প্রকাশ করলে তাদের সাথে ঘৃণ্য আচরণ করা হয়, তাদের লাঞ্ছিত-অপদস্থ করে গবেষণার জন্য প্রদানকৃত ফান্ড বন্ধ করে দেয়া হয়।

রাসূলে কারীম সা. বলেন- রোগব্যাধি অবশ্যই ছড়িয়ে পড়বে। এমনকি মানুষ একে মহামারী মনে করবে (দ্রুত ছড়ানোর কারণে)। (597:ص3:مصنف عبد الرزاق،ج)

১৯৭২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আফ্রিকায় ভেক্সিনেশানের কার্যক্রম শুরু করে এবং লাখো মানুষের দেহে HIV ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়। রথ শিল্ডের আইডিয়াও ছিল এরকম। পোলিও ফোটার ব্যাপারে যদি গভীরভাবে লক্ষ করা যায়- দাজ্জালী সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করা হচ্ছে। এটা আবার কেমন সহমর্মিতা- খেতে না চাইলে পুলিশের আশ্রয় নিয়ে জোর করে হলেও খাওয়ানো হয় আবার ডিজিটাল সিষ্টেম থেকে ডাটা অর্জন করে প্রতিটি শিশু সম্পর্কে তথ্য রাখা হয়।

আল্লাহ দোহাই লাগে- আপনার ছোট্ট শিশুটিকে পোলিও টিকা থেকে দূরে রাখুন। আপনার প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর দুশমনেরা নবীর উম্মতকে ধ্বংস করে দিতে চায়। ফ্যাক্টরীগুলোতে তালা ঝুলিয়ে তাদেরকে খাদ্যাভাবে মেরে ফেলতে চায়। আপনি যেই হোন... তাদের জন্য আপনি একজন মুসলমান। রাসূলে আরাবী সা. এর উম্মতের একজন সদস্য। তাই আপনি তাদের দুশমন। আপনি যদি উম্মতে মুহাম্মদী হয়ে গর্ববোধ (আলহামদুলিল্লাহ) করেন, তাহলে দুশমন। সুতরাং... রাসূরে আরাবী সা.এর দুশমনকে আপনিও দুশমন বলে চিহ্নিত করুন এবং দ্বীনের সকল স্তরে সাহায্য অব্যাহত রেখে দুশমন-নির্মূল অপারেশানে অংশগ্রহণ করুন। তাদের বিরোদ্ধে অবস্থানকারীদের কাতারে দাড়িয়ে যান এবং দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহর দোহাই লাগে... আপনার সন্তানকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার।

জল নিয়ে...বিশ্বযুদ্ধ

জলবিষয়ক যুদ্ধের ব্যাপারে লেখক "তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জাল"গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে সবকিছু উল্লেখ করেছে। পাকিস্তানের সমুদ্রগুলো শুকানোর জন্য ভারত সরকার "জাহলাম-নীলাম" সমুদ্রের উপর ৬২ টি ছোট ছোট বাঁধ নির্মাণ করেছে। আর সীন্ধ সমুদ্রে স্থাপন করেছে ১৩টি বাঁধ। এদিকে ইরাক এবং সিরিয়ার পানি তুরস্কের মাধ্যমে বন্ধ করা দেয়া হয়েছে। ফিলিস্তীন এবং জর্ডানের পানি ইসরায়েল কর্তৃক বন্ধ হয়ে আছে। ওদিকে মিসরের নীলনদকে শুকানোর জন্য তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পানিবিষয়ক এ যুদ্ধে বিশ্বব্যাংক পুরো ইসলামী বিশ্বের বিরোদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাংকই তুরস্ক, ইসরায়েল এবং ভারতকে নদীর উপর বাঁধ স্থাপনের জন্য সার্বিক খরচাদী প্রদান করে আসছে।

দাজ্জালের এ বিশ্বব্যাংক ভবিষ্যতে কিভাবে পানির উপর সম্পূর্ণ কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করে ফেলবে, তার একঝলক নমুনা নিম্নোক্ত রিপোর্টে দেখে নিন :-

পানিশূন্যতার দৃষ্টান্ত বলিভিয়ায়...

পানিশূন্যতার বিষয়ে সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাংকের পক্ষ একটি পলিসি প্রচার করা হয়- যাতে পানির পুরোপুরি মূল্য তারা উসূল করতে সক্ষম হয়। পলিসিটি শুনার পর তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিদের মাঝে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। কারণ, তাদের শহুরে জনগণ বিনা পয়সায় উৎপাদিত পানির মূল্য দিতে রাজী হবেনা। এর দুই বৎসর পূর্বে বিশ্বব্যাংক (যার দায়িত্বশীলগণ বলিভিয়ার (দক্ষিণ আমেরিকা) সরকারী বৈঠকে অংশগ্রহণ করেছিল) বলিভিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর "জাপামা"তে পানি সরবরাহ কাজে ২৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিতে অস্বীকৃত জানিয়েছিল। তারা শর্ত করেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত (বলিভিয়ার) সরকার পানি প্রস্তুতকরণকে ফ্রি-মালিকানাধীন না করবে এবং সরবরাহের জন্য কর্মচারীদেরকে টেক্স প্রদান না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ঋণ দিতে রাজী নয়। এবিষয়ে সম্পাদিত চুক্তিতে তুচ্ছ এক বিষয়কে গভীরভাবে নিয়ে পানি সরবরাহের দায়িত্ব এমন এক সংস্থাকে দেয়া হয়েছে, যার সভাপতিত্ব ছিল এক ইঞ্জিনিয়াং কোম্পানীর হাতে। উক্ত কোম্পানী চীনে তিনটি বড় বড় বাঁধ স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ দুর্নামের স্বাক্ষর রেখেছিল। পরবর্তীতে ঐ তিনটি বাঁধের কারণে ১.৩ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীকে স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে এখন পর্যন্ত কোম্পানী কার্যক্রম শুরু করেনি- পানির দাম দ্বিগুন বাড়িয়ে দেয়। বলিভিয়ার অধিকাংশ জনগণের জন্য তা খাদ্যের থেকেও দামী হয়ে যায়। বিশেষত যারা স্বল্পআয়ের লোক কিংবা বেকার ছিল, তাদের জন্য বিষয়টি অসহ্যকর ছিল। পানির বিল-ই তাদের মাসিক সাংসারিক খরচের অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। এরপর কাটা গায়ে নূন ছিটা" হিসেবে বিশ্বব্যাংক বিনামূল্যে পানি সরবরাহকরণ সংস্থাগুলোকে তাদের নিজ নিজ অবস্থান ঠিক করার জন্য এবং এগুলোকে মার্কিন ডলারের বিনিময়ে উসূল করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে দেয়। পাশাপাশি এ-ও ঘোষনা করে দেয় যে, পানি সরবরাহের দায়িত্বে থাকা গরীব লোকদেরকে এথেকে কোন ঋণ দেয়া হবেনা। তাছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে অর্জিত পানি -চায় তা ব্যক্তিগত কূপ থেকেই তুলা হোক- ব্যবহার করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে দেয়া হয়। এমনকি কৃষক এবং জমিদারদের স্বীয় জমিতে পানি দেয়ার ক্ষেত্রে বৃষ্টির পানি একত্রিত করার জন্যও চড়ামূল্যে অনুমতিনামা ক্রয় করতে হতো।

সুতরাং মুসলমানদের উচিৎ- মিনারেল ওয়াটার ব্যবহার ছেড়ে নিজেদের পানি ভান্ডারগুলো সংরক্ষণ করার দিকে মনযোগী হওয়া। কেননা, আপনি ইতিমধ্যেই জেনে এসেছেন যে, কিভাবে এসকল বিষয়ের মধ্যে বিষাক্ত সব জীবাণূ মেশানো হচ্ছে।

কৃষকদের দুশমন...দাজ্জাল

দাজ্জালের প্রচেষ্টা হচ্ছে যে, তার আত্মপ্রকাশের পূর্বেই খানাপিনার বিষয়ে সারাবিশ্ব তার মুকাপেক্ষি হয়ে পড়ুক। আর তাই দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী খাদ্য প্রস্তুতকরণে তাদের কার্যক্রম চালু রয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদী খাদ্যের তালিকায়- নেসলের মত ইহুদী কোম্পানী দিন-রাত মেহনত করে চলেছে। এদিকে আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক মিলে কৃষিজমির ব্যাপারে সরকারের কাছে এমন সব পলিসি সরবরাহ করছে, যার বাস্তবায়নে কৃষকদের মেহনত ভেস্তে যাবে। ফসলাদী ধ্বংসের জন্য সরকারী তদারকিতেই বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে :-

(১) উর্বর জমিগুলোর উপর হাউজিং স্কীম শুরু করা হয়েছে। ফলে কয়েক বৎসরের ভেতরেই পরিণাম প্রকাশ হতে শুরু করবে। সুতরাং আপনার জমিকে নষ্ট করার জন্য কখনো এরকম কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অনুমতি দেবেননা।

(২) ষাড়ের মূল্যবৃদ্ধি, মূলসময়ে বীজ বাজারে না থাকা, ফসলের যথাযোগ্য মূল্য না পাওয়া এসকল

ব্যাপারসমূহ দিনদিন কৃষকদের জন্য দুর্বলতার কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে। এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে- দাজ্জালের সংস্থাগুলো কর্তৃক অর্পিত নিয়মকানূন থেকে নিজেকে মুক্ত করে মনমত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। ষাড়, বীজ এবং অন্যান্য বস্তুতে আপনি নিজেই দায়িত্বশীল হোন।

(৩) জীবানু বহনকারী ঔষধের মাধ্যমে ফসলকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয় যে, কৃষক একে প্রকৃতিগত সমস্যা মনে করতে থাকে। অথচ এসকল জীবাণু বহনকারী ঔষধ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গবেষণাগারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

(৪) ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের পানি আটকে দেয়া হয়েছে। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের কাপ্তাই, টিপাইমুখ ও ফারাক্কা বাঁধের বিষয়টি এরই সাথে সম্পৃক্ত। আপনি পড়ে অবাক হবেন যে, আমি "আটকে দেয়া"র শব্দ কেন ব্যবহার করলাম! এটাই প্রকৃত বাস্তবতা! বিশ্বব্যাংকের আদেশে ভারত এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোনপ্রকার বাধা আরোপ করেনি। অথচ বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এর জন্য যদি ভারতের সাথে যুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ত, তবে যুদ্ধ পর্যন্ত করার দরকার ছিল। কেননা পানিবিহীন মানুষ কিভাবে জীবপযাপন করবে!! কিন্তু এমনটি না করে পাক-সরকারের পক্ষ থেকে শুধু মুখে কিছু কথা বলে দিয়ে ভারতকে সকল পানি বন্ধ করার জন্য সময় দিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুতরাং ওহে মুসলমান কৃষক ভাইয়েরা! আপনারা যদি কৃষি জমি এবং ফসল বাঁচাতে চান, তাহলে আপনাদেরকে কে দোস্ত আর কে দুশমন, তা পৃথক করতে হবে। কে আপনার দুশমন, সে কি চায় এবং তার উদ্দেশ্যই বা কি ??!!!

কৃষক ভাইদের উচিত- টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারকৃত বীজ, ষাড় এবং বিভিন্ন প্রকার ঔষধের ক্ষেত্রে ভাল করে যাচাই করে নেয়া। ফসলের ব্যাপারে মনমোগ্ধকর প্রোগ্রাম এবং বিজ্ঞাপন থেকে সতর্ক থাকবেন।

দ্বিতীয় কথা- ফসলের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় কোন পদ্ধতি অবলম্বন থেকে দূরে থাকুন। অন্যথায় আপনার জমি অচিরেই অনুর্বর জমিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। দেশি ষাড় ব্যবহার শুরু করেন এবং খাদ্যদ্রব্যের বস্তু যত বেশি সম্ভব; নিজের ক্ষেতে চাষ করা শুরু করুন। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে চেষ্টা চালিয়ে যান, দেখবেন- অল্পতেই আল্লাহ তা'লা আপনার ফসলে বরকত দান করবেন- যার ফলাফল কিছুদিন পর নিজেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আপনার জমি, ফসল এবং আপনার সন্তানের দুশমনেরা আফগানিস্তানের মাটিতে এসেছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইকারীগণ আপনার হয়ে এবং আপনার সন্তানদের হয়ে লড়াই করে যাচ্ছে। এই দাজ্জালী সিস্টেম থেকে একটিই মাত্র বাঁচার উপায়- দাজ্জালের এ পদ্ধতিকে এমন অবস্থানে পৌছে দেয়া, যাতে করে তার অনুসারীরা ওয়াশিংটনে বসে বসে আপনার জমির ব্যাপারে ফায়সালা না করতে পারে। দাজ্জালের এ শক্তিকে পরাজিত না করা পর্যন্ত আপনি কিছুই করতে পারবেননা। যতখুশি মিছিল-মিটিং করুন, পুরাতন সরকার বদলিয়ে নতুন সরকার আমদানী করুন বা আত্মহত্যার পথ বেছে নিন... কোন লাভ নেই!!!

মুসলমান ব্যবসায়ীদের দুশমন...কানা দাজ্জাল

ব্যবসায়ীগণ নিজেদের ব্যাপারে একটি কথা মনে করে থাকেন যে, তারা খুবই বুদ্ধিমান এবং আমদানী রপ্তানী প্রক্রিয়ায় তারা বেশি জ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়- ব্যবসায়ীদের চোখের সামনে তাদের কারবারী লুট করার প্রক্রিয়া তৈরী হচ্ছে, অথচ তারা এখনো নিশ্চুপ হয়ে তা প্রত্যক্ষ করছে। অতপর নদীর পানি যখন মাথার উপরে উঠে শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তখন দুয়েকজন শহুরে ব্যবসায়ী জাগ্রত হল।

ডাব্লিউ-টি-ও" কি ? বর্তমান যুগের ব্যবসায়ী ছাড়া এসম্পর্কে আর কে বেশি জানবে !! দাজ্জালের এ বানিজ্যিক সংস্থাটি মাত্র কয়েক বৎসরের ভেতরেই মুসলমানদের ব্যবসা এবং কারবারীতে কুঠারাগাত করেছে। দেশের প্রতিটি অঞ্চল ঘুরে দেখে আসুন- দাজ্জালের এ সংস্থাটি মুসলমানদের মিল, কারখানা এবং বড় বড় ফ্যাক্টরীগুলোতে মাথায় বন্দুকের নল রেখে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে।

পরিশেষে এমনটি কেন হল ?? শুধুমাত্র মুসলমান হওয়াটা কি তাদের অপরাধ ছিল ?? মুহাম্মদ সা. এর উম্মতের একজন সদস্য হওয়ার শাস্তি ?? কেননা, দাজ্জাল কখনোই চায়না যে, তার দুশমনের হাতে জীবনধারনের মত কোন উপকরণ অবশিষ্ট থাকুক।

ব্যাবসা-কারবারীদের জন্য এ ভয়ানক ব্যাপারটি ১৯৯২ তেই বুঝে নেয়া দরকার ছিল- যখন GATT চুক্তি সম্পাদন করে দাজ্জালী শক্তি বিশ্বের বানিজ্যিক ব্যবস্থা কন্ট্রোলকরন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করেছিল। দাজ্জালী শক্তির বিরুদ্ধে সজাগ হওয়ার দ্বিতীয় সময় ছিল- যখন ডব্লিও-টি-ও(বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা) র শিকলে বাধা অবস্থায় আপনাকে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এর থেকেও বড় যে ভুলটি ব্যবসায়ীদের ব্যাপারে হয়েছে- ইসলাম ও পাকিস্তানের গাদ্দার পারভেজ মুশাররফ যখন ভারত থেকে লেন (দেন নয়; শুধু লেন) শুরু করে, এবং ধীরে ধীরে বাজারের মধ্যে ভারতীয় পন্য ছেয়ে যেতে শুরু করে।

আপনি নিজেই ঐ সিষ্টেমকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করুন- আপনার চিন্তার গন্ডি সরকারী স্তর পর্যন্ত যেয়ে থেমে যাবে। কিন্তু মনে হয়- সরকারী অপারগতার বিষয়টি আপনার জানা নেই অথবা বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার মূল উদ্দেশ্যটি আপনার কাছে গোপনীয়।

আপনি জানেন যে, বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা না কোন মৌলিক দলিলের উপর ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছে, না ব্যবসায়ীদের উপকারের জন্য; বরং এটা সরাসরী বদমায়েশী ছাড়া কিছু নয়। এর নিরেট উদ্দেশ্য হচ্ছে- ইহুদী ও হিন্দু জাতি ব্যতিত পৃথিবীর সকল জনগোষ্ঠীকে তাদের রিযিকের মুকাপেক্ষী বানানো। তাদের সংবিধান হচ্ছে- জোর যার মুল্লুক তার (Might is Right)

সুতরাং ঐ লাঠি ভেঙ্গে দেয়া ছাড়া আপনি আপনার কারবারীকে বাঁচাতে পারবেননা। আর এই লাঠিকে ভাঙ্গার জন্যই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন এদেরকে টেনে আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ! আপনার ভাইয়েরা তাদেরকে প্রতিদিনই দুর্বল করে যাচ্ছে। আপনিও যদি তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান, তবে কাজটি আরো দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। ভয়ের কোন কারণ নেই!! আপনি নিজেই এমন স্তরে পৌছেছেন যে, আত্মহত্যা (ব্যবসা গুটিয়ে ফেলা)র নিদর্শনাবলী আপনার সামনে প্রকাশ হতে শুরু করেছে। আপনার ইচ্ছা, চাহিদা এবং পেরেশানীগুলোর অনুভূতি আমাদের অন্তরে আছে। পাশাপাশি যতটুকু কষ্ট আপনার হচ্ছে, এতটুকু আমাদের-ও হচ্ছে যে, আপনার কারবারী বন্ধ হওয়ার ফলে হাজারো উম্মতে মুহাম্মাদীর ঘরের চুলার আগুন নিভে যাবে। আপনি দ্বীনের মুজাহিদীনকে যতই ভুল বুঝে থাকুন কিংবা দাজ্জালী মিডিয়ার মাধ্যমে মুজাহিদীন সম্পর্কে আপনার কাছে যতই বদনাম পৌছুক, কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে যে, উম্মতের একজন সদস্যের দুঃখ কষ্টও তাদের কাছে নিজেদের পরিবারের দুঃখ কষ্টের মত।

আপনারা ব্যবসায়ী মানুষ! কোন কাজের ক্ষেত্রে লাভ-লোকসানের গন্ডি আগেই পরখ করে নেন। আফগানিস্তানে আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াইকারী মুজাহিদদেরকে আপনি সঙ্গ দিলে আপনার কোনই ক্ষতি হবেনা; বরং দীর্ঘমেয়াদী লাভের গ্যারান্টি রয়েছে। আর আপনি তো দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম কি করে গ্রহণ করতে হয়, তা ভাল করেই জানেন।

আমাদের উদ্দেশ্য আপনার পয়সার দিকে নয় যে, আপনি মুজাহিদদেরকে ফান্ড দেবেন। বরং পাকিস্তানের মুজাহিদদের জন্য চারিত্রিক নিরাপত্তা দরকার। কেননা, পারভেজের যুগে আমেরিকা এবং ভারতীয় চররা এখানে খুবই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাশাপাশি ইসলাম ও মুসলমান লবিগুলো চরমভাবে দুর্বল হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি যদি শুধুমাত্র সংখ্যা বাড়ানোর নিয়তেও তাদের কাতারে দাড়িয়ে যান, কোন বৈঠকে বসে লোকদেরকে এসম্পর্কে সতর্ক করেন বা আমেরিকা ও ভারত সম্পর্কে মানুষের সামনে বাস্তব তথ্য তুলে ধরেন, তবে আল্লাহর বিশেষ রহমতে আপনি এই আশা করতে পারবেন যে, কাল কেয়ামতের দিন ঐ সকল লোকদের কাতারেই আপনাকে উঠানো হবে, যাদেরকে আপনি দুনিয়াতে ভালবাসতেন।

যৌথ কারেন্সি...

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ভবিষ্যতের জন্য যেসকল কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে- বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক যৌথ কারেন্সিতে অংশগ্রহণ করা এভাবে চলতে চলতে সর্বশেষে একটিই মাত্র কারেন্সি বাকী থাকবে, আর তা হবে দাজ্জালের আত্মপ্রকাশকালীন সময়ে। ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন, ইউরো আদান-প্রদান এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর যৌথ কারেন্সিতে পারস্পরিক একমত হওয়ার বিষয়টি দাজ্জালী কার্যক্রমেরই অংশবিশেষ। দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাপারে কানা দাজ্জালের স্বপ্ন হচ্ছে- এখানকার ছোট ছোট দেশগুলোকে হজম করে ব্রাহ্মণদের ফেডারেশানের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া। পাকিস্তানে ইসলামপ্রিয় মানুষেরা এখনও বিদ্যমান আছে, দেহে এক ফোটা রক্ত থাকতে এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবেনা। পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের ইসলামী শক্তিসমূহ দাজ্জাল ও ইবলিসের সকল খেল-তামাশাকে চৌচির করে দিচ্ছে। বহু পরিশ্রম করে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু কিছু "দিওয়ানা" ব্যক্তিবর্গ না জানি কোত্থেকে বের হয়ে মুহূর্তের মধ্যেই সবকিছু মিছমার করে দিয়ে যায়। কারেন্সির প্রসঙ্গ যেহেতু উঠেছে, তবে শুনে রাখুন- পীরতুল্য এ কারেন্সি (টাকা)র উপর ভরসা করবেননা। এটা শুধুই রং-বেরংয়ের কাগজের টুকরা। এর পরিবর্তে আপনার তত্ত্বাবধানে স্বর্ণ-রূপা মজুদ রাখুন এবং বর্তমান প্রচলিত ব্যাংকগুলো থেকে যথাসাধ্য নিজেকে দূরে রাখতে পারেন।

যোগাযোগ ব্যবস্থা...

দাজ্জাল স্বীয় আত্মপ্রকাশের পূর্বেই বিশ্বব্যাপি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিজের কন্ট্রোলে নিতে আসতে চায়। বর্তমান বিশ্বকে Global Village বানানোর যে প্রচেষ্টা করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে এটাও দাজ্জালী কার্যক্রমের অংশবিশেষ। এভাবেই সে পুরো বিশ্বকে তার খোদায়ীর অধিনে দেখতে চায়। মোবাইল, ইন্টারনেট, ট্রেকিং সিষ্টেম, জিপিএস, স্যাটেলাইট ফোন, ইলেকট্রনিক চিপ লাগনো ক্রেডিট কার্ড, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (R.F)যুক্ত আইডি কার্ড ও ডিজিটাল পাসপোর্ট, চিপ লাগানো গাড়ী, সড়কগুলিতে অত্যাধুনিক রাডার সিষ্টেম বসানো (যাতে আসা-যাওয়া সহজ হয় এবং প্রতিটি গাড়ীই তার দৃষ্টিসীমার ভেতরে থাকে) ইত্যাদি সকল কার্যক্রম একই ধারাবাহিকতার বিভিন্ন রূপ। বিশ্বব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদি ঋণগুলোর অধিকাংশই এ উন্নয়নমূলক কাজগুলিতে ব্যয় হয়ে থাকে।

কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট...

কম্পিউটারে করা প্রতিটি কাজই ধরাছোয়ার বাইরে। আর তাই এর পেটে আপনি যা কিছুই ভরে রেখেছেন, কমছেকম তার প্রিন্টআউট বের করে নিজের সংগ্রহে রাখুন। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞদের কাছে অনুরোধ- Windows শব্দের প্রকৃত বাস্তবতা জানার চেষ্টার করুন। এটি কার জানালা!! ভেতরে কি !! এবং কোথায় গিয়ে খোলে !! একে ব্যবহার করে আপনি সারাবিশ্বকে দেখছেন ?? নাকি "অন্য কেউ" এর মাধ্যমে সারাবিশ্বকে প্রত্যক্ষ করছে। অনলাইন ব্যাংকিং, অনলাইন একাউন্ট থেকে নিজেকে দূরে রাখেন।

নারীজাতির জন্য দাজ্জালের জাল...

সামাজিকতার ভিত্তি ঘরবাড়ী কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। আর ঘরের যাবতীয় কার্যাবলী নারীদের আঁচলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঘরোয়া পরিবেশ যদি খারাপ হয়ে যায়, তবে দ্রুত সামাজিকতার অবনতি ঘটতে থাকতে। পক্ষান্তরে ঘরোয়া পরিবেশ যদি শক্ত ও শিষ্টাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে সামাজিকতাও সুস্থ্য ও সঠিক পথে থাকে। এভাবেই একটি সমাজ ধীরে ধীরে চারিত্রিক উন্নতির উচ্চস্তরে পৌছতে সক্ষম হয়। আল্লাহ পাক

রাব্বুল আলামীন হক ও বাতিলের এ যুদ্ধে মুসলমান পুরুষদের উপর যেমন দায়িত্ব অর্পন করেছেন, তেমন বিরাট এক দায়িত্ব মুসলিম মহিলাদের উপরও ঢেলে দিয়েছেন। নবী করীম সা. বলেন-

ألا كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته

(জেনে রাখো! তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে)। হাদিসটি বুখারী শরীফ থেকে নেয়া। হাদিসের অবশিষ্টাংশ-

والرجل راع في أهله ، ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ، ومسؤولة عن رعيتها.

(পুরুষগণ স্বীয় পরিবারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, এবং তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মহিলাগণ স্বামীর ঘরের ভেতর দায়িত্বশীল, এবং তাকেও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে)

রাসূলে কারীম সা. راعي শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ- দেখাশুনা করা, ঘুরেঘুরে পর্যবেক্ষন করা, চরানো। বকরী চরানোর কাজে অত্যন্ত বিচক্ষণতা, মনযোগ ও কষ্টের প্রয়োজন পড়ে। চরাতে চান, ফলে কষ্ট করতে হবে। কিন্তু কোন কারণে যদি রাগান্বিত হয়ে বকরীগুলোর উপর কঠোরতা শুরু করে দেন, তবে পরবর্তীতে লোকসান আপনারই।

তেমনি প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ/নারীকে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত মনযোগ, বিচক্ষণতা এবং কষ্টসহকারে পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে পুরুষ যদি তার দায়িত্বে বিন্দুমাত্রও অলসতা বা অমনযোগীতা প্রকাশ করে, তবে এর ক্ষতি তাকেই বহন করতে হবে এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের কাছেও এর জবাবদিহিতা করতে হবে।

দাজ্জাল মুসলিম নারীদের জন্য ভয়ানক জাল তৈরী করেছে এবং এ জালে শিকারীকে ফাসানোর উদ্দেশ্যে চমৎকার সব ধ্বনি দিয়ে তা সাজিয়ে রেখেছে। দাজ্জাল ভাল করেই জানে যে, মুসলিম নারীজাতি যদি এ জালে ফেসে যায়, তবে মুসলিম পুরুষজাতিকে পরাজিত করা তার জন্য কঠিন কিছু হবেনা। কেননা, মুসলিম নারীগণ ইসলামকে রক্ষার জন্য যুগে যুগে বড়ত্ব ও বাহাদুরীর স্বাক্ষর রেখেছে। যেখানেই ইসলামের উন্নতি সাধনে পুরুষগণ প্রতিযোগীতামূলকভাবে অংশগ্রহণ করেছে, সেখানে নারীগণও কোন অংশে পিছিয়ে রয়নি। এমনটি কখনো হয়নি যে, পুরুষগণ রণাঙ্গন বিজয় করে ফেলেছে সাথে সাথে নারীদের পক্ষ থেকে কোন সহযোগীতা সেখানে পরিলক্ষিত হয়নি। বরং একসময় তো এমনটি হয়েছে যে, মুসলিম পুরুষদের সেনাদল একের পর এক পরাজয় বরণ করতে লাগল এবং শত্রুরা মুসলমানদেরকে ধারাবাহিকভাবে পরাভূত করছিল। মুসলিম দেশগুলোকে একের পর এক কাফেররা বিজয় করছিল। এমনকি শেষপর্যন্ত সেখানে না মসজিদ বাকী ছিল; না মাদ্রাসা- কাফেররা সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছিল। মাদ্রাসাগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। উলামাদেরকে জীবিত দাফন করে দেয়া হয়েছিল। মসজিদগুলোকে মদের আড্ডাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল। ইসলামী নামকরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। প্রত্যেক মুসলমানকে জোরপূর্বকভাবে মুরতাদ করে দেয়া হয়েছিল। ফলে পুরুষদের সাহস ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু এমন কঠিন ও নাজুক পরিস্থিতিতেও মুসলিম মহিলাগণ সাহস না হারিয়ে স্বীয় প্রতিশ্রুতিকে শক্তকরে আকড়ে ধরে আল্লাহর তরফ থেকে দেয়া দায়িত্বসমূহকে পালন করেছিল। তারাই ঘরের আঙ্গিনায় বসে বসে নিভু নিভু করতে থাকা ইসলামের আলোকে জালিয়ে রেখেছিল। সন্তানদের সীনায় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'এর কালেমা জীবিত রেখেছিল এবং শিখিয়েছিল যে, তারা মুসলিম জাতি।

দাজ্জালী শক্তি মুসলিম মহিলাদেরকে এ ভয়ানক জালে ফাসানোর জন্য একটি বাণী আবিস্কার করেছে যে, মহিলাগণ যদি ঘর থেকে বের না হয়, তবে সামাজিক উন্নতি সম্ভব নয়। মনবৃত্তির পূজারী পুরুষগণ প্রত্যেক যুগেই নারীদেরকে কলংকিত করে আসছে। নারীরা যতই তাদের বাণী, কার্যক্রম এবং ষড়যন্ত্রের ফাদেঁ পা রাখবে, ততই তাদের দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট ও অপমানের সম্মুখীন হতে হবে। এ ব্যাপারে তো কুরআন হাদিসে এতকিছু বর্ণিত রয়েছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার নেই।

কিন্তু মডার্ন (দাজ্জালী) সংস্কৃতির জাদু যেহেতু মহামারীর আকার ধারণ করেছে, সেহেতু সমাজের মা ও বোনদের জন্য (যারা পশ্চিমাবিশ্বের দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবীদের বাণীগুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন) দার্শনিক এবং সাহিত্যিক খলীল জিবরানের নিম্নোক্ত বাক্যগুলো পেশ করা হল :-

Modern Woman,

Modern Civilization has made woman a little wiser, but it has increased her suffering because of man's covetousness. The woman of yesterday was a happy wife but the woman of today is a miserable mistress. In the past she walked blindly in the light, but now she walks, open-eyed in the dark. she was beautiful in her ignorance virtuous in her simplicity, and strong in her weakness. Today she has become ugly in her, ingenuity, superficial and heartless in her knowlegde. (A Third Treasury of Khalil Gibran. P:144)

অনুবাদ- মডার্ন নারী :

মডার্ন সংস্কৃতি এসে নারীজাতিকে কিছুটা চালাক বানিয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরুষদের যৌনচাহিদার দরুন নারীদের এ সংস্কৃতিতে আরো কিছু লাঞ্ছনা যোগ হয়েছে। গতকাল নারীজাতি ছিল সুখীপরিবারের এক অহংকার। কিন্তু আজকের মডার্ন নারীজাতি ঘৃণায় ভরা এক অবৈধ যৌনসঙ্গিনী। গতকালের নারীগণ চোখ বন্ধ করে আলোতে চলাফেরা করত। কিন্তু আজকের নারীরা চোখ খোলে চলাফেরা করে ঠিকই, কিন্তু অন্ধকারে। গতকালের নারীসমাজ অতি গোপনে নিজের সৌন্দর্য, সদাচরণ এবং সতিত্বের পবিত্রতা রক্ষার দরুণ সম্মানের পাত্রী ছিল। কিন্তু আজকালের নারীসমাজ শিক্ষিত হয়েও অন্ধ, বেখবর, এবং নিষ্ঠুর হয়ে গেছে।

নোট: mistress শব্দের ব্যাখ্যা ইনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইনকারটা ডিকশনারীতে নিম্নোক্ত শব্দাবলীর দ্বারা করা হয়েছে :-

Extramarital lover of man a woman with whom a man has a usually long-term extramarital sexual relationship, often one in which he provides financial suppport. (Microsoft® Encarta® 2009)

হে প্রিয় মা ও বোনেরা! আপনাদের এবং আপনাদের সন্তানদের ধ্বংসের জন্য দাজ্জালী শক্তি কি কি কার্যক্রম শুরু করেছে, এগুলো একটু লক্ষ করুন :-

১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিউয়োর্কে বাচ্চাদের অধিকার বিষয়ক একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে প্রায় সত্তরটি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। একষট্টিটি দেশের প্রতিনিধিগণ বাচ্চাদের সম্পর্কে প্রস্তাবকৃত সংবিধানগুলো বাস্তবায়নের জন্য স্বাক্ষর প্রদান করেন।

সংবিধানের ৫৪ নং অধিকারে বাচ্চাদের কোলে নেয়া, তাদের লালন পালন করে বড় করা, বাচ্চাদের সাথে পিতা-মাতার ব্যবহার, মায়ের সুস্থ্যতা, বাচ্চাদের স্বাধীনতা এবং চারিত্রিক ও ধর্মীয় দিক থেকে বাচ্চাদের অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর এক নং অনুচ্ছেদে পিতা-মাতাকে সন্তানের প্রতি কোনরূপ ধর্মীয় বিষয় গ্রহণের জন্য বাধ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। পরিস্কারভাবে অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- পিতা-মাতার উচিত- তার সন্তানকে ধর্মীয়, চারিত্রিক এবং আভ্যন্তরীন বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা। সন্তানকে ভেবেচিন্তে যে কোন পথ বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া। ইচ্ছামত যে ধর্মকে তার ভাল লাগবে, তাকেই সে বেছে নেবে।

৩১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- বাচ্চাদের সর্ববিষয়ের বইপুস্তক, পত্রপত্রিকা, ম্যাগাজিন অধ্যয়ন করার স্বাধীনতা থাকা চাই। এমনকি সে যদি উলঙ্গ ও অশ্লীল বা যৌনবিষয়ক ম্যাগাজিন ক্রয় করতে চায়, বা শয়তানের পূজা করতে চায়, তবে এটাও তার মৌলিক অধিকার। পিতা-মাতাকে বাচ্চার ব্যক্তিগত বিষয়ে

কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা চাই। পাশাপাশি অশ্লিলতার এ কাজগুলো যদি সে মুখের দ্বারা বা লেখালেখির দ্বারা প্রচার করতে চায় বা টিভি/ইন্টারনেটের মাধ্যমে বন্ধুবান্ধবদের সাথে শেয়ার করতে চায়, তাহলে এসব কাজেও তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত।

২৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- স্বাধীন নিরাপদ যৌনসম্পর্ক, এতদ্বিষয় তথ্যাবলী, যোগাযোগ মাধ্যম এবং যৌনশিক্ষা সহজকরণ...এ বিষয়গুলো প্রতিটি উন্নয়নশীল সমাজকে ফলো করতে হবে। নারীগণ তাদের গর্ভ রাখবে না নষ্ট করে দেবে, এটাও তাদের মৌলিক অধিকার। পাশাপাশি এমন (হারামী) সন্তান এবং অবিবাহিত নারীদের এমনই সামাজিক অধিকার প্রদান করতে হবে, যেমননাকি অন্যদের প্রদান করা হয়। উপরোক্ত বিষয়াবলীতে যদি পিতা-মাতা সন্তানের সাথে জবরদস্তিমূলক কোন আচরণ করে, তবে সন্তানের অভিযোগে পিতা-মাতাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। অসদাচরণের ক্ষেত্রে মারধর ছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষায় সন্তানকে বাধ্য করার বিষয়টি শামিল।

কোন মুসলমান মা কি কখনো কল্পনা করতে পারে যে, মা অসুস্থ হয়ে খাটে পড়ে আছে। "মা" এক গ্লাস পানি পান করতে চায়, পিপাসায় কাতরাচ্ছে...। কিন্তু বেচার "মা"কে এক গ্লাস পানি এনে দেয়ার মত কেউ নেই। এমনটি নয় যে, ঘরে কোন মানুষ নেই...। ঘরে তার যুবক ছেলে, যুবতী মেয়ে.. সবাই আছে...। কিন্তু তারা স্বাধীন জীবনযাপন করছে। স্বাধীন জীবন, যা মন চায়, করব। মন না চাইলে করবনা। আমাদের সবারই স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করার অধিকার রয়েছে। নিজেদের বেডরুমে...। তারা ব্যক্তিগত মনচাহি বিষয়ে মত্ত...। বন্ধুবান্ধবদের সাথে মদের পাত্র মুখে নিয়ে জীবনযাপন করে পাগল হয়ে আছে। আর এদিকে তার জন্মদাতা "মা" অসুস্থাবস্থায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে এক গ্লাস পানির জন্য হাহাকার করছে...। পাশের রুমেই তার সন্তান বন্ধুদের নিয়ে তামাশা করছে...কিন্তু আপন "মা"কে-ও এক গ্লাস পানি দেয়ার মত সময় তার হাতে নেই। আরে "মা"! অসুস্থাবস্থায় কাকে ডাকছেন....!!! কেউ নেই....!!!

কিন্তু ঐ "মা" কি কারো কাছে এ বিষয়ে কোন অভিযোগ করতে পারবেন ??!! সবার আগে নিজেকে আপনার প্রশ্ন করা উচিত যে, আপনি আপনার সন্তানকে আচার ব্যবহার শিক্ষাদানে কতটুকু সময় ব্যয় করেছেন ??!! সন্তান কি মায়ের শেখানো আচার ব্যবহার ও শিক্ষাদিক্ষা নিয়ে বড় হয়েছে ?? নাকি শৈশবকাল সে টেলিভিশনের স্ক্রীনের সামনে বসে কিংবা কম্পিউটারে গেম খেলে কাটিয়েছে ?? প্রত্যেক মায়েরই চিন্তা করা উচিত যে, সন্তানের সুশিক্ষায় তার হাত সবচে' বেশি ?? নাকি ঐ সকল অপরিচিত মহিলাদের, যারা টেলিভিশনের স্ক্রীনে এসে সবসময় বাচ্চাদেরকে পশুত্বের সবক শিখিয়ে তাদেরকে মুর্খতাযুগের দিকে নিয়ে যাচ্ছে!! পাশাপাশি এও চিন্তা করা দরকার- যে সময় ছোট্ট এ শিশুটি টেলিভিশনে দেখানো অশ্লীলতা এবং বেহায়াপনার ঢেউয়ের সাথে ঘুরপাক খাচ্ছিল, তখন ঐ "মা" কোথায় ছিল ??!!

তারা হচ্ছে ঐ সকল মা", যারা স্বীয় দায়িত্ব-অনুভূতির কথা ভুলে গিয়ে সন্তানদেরকে টেলিভিশনের পর্দায় থাকা মহিলাদের শিক্ষা-দিক্ষার উপর ছেড়ে দিয়েছে, যাদের শিক্ষাদিক্ষার সারকথা হল- জীবন হচ্ছে শুধুই মনোচাহিদা পূরণ করা, স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপ দেয়া, জীবনকে আধুনিকতার রঙে রাঙায়িত করার এবং যখন যা মন চায়, তাই করে দেখানোর নাম। আত্মীয়স্বজন, পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা, পিতা-মাতা, ভাই-বোন...এগুলো শুধুই পুরাতন মধ্যযুগীয় লোকদের মত সময় নষ্ট করার নাম। এটা হচ্ছে আধুনিকতার যুগ... নিজের স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার যুগ...।

এধারণাগুলো পড়ার পর নিশ্চিতভাবেই পূর্ব-বিশ্বের মায়েরা কেপেঁ উঠবেন। কিন্তু সারাবিশ্বের কাফের সম্প্রদায় আমাদের ঘরে এমনই পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। আমাদের ঘরের ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা যে, যেমনভাবে তাদের ঘরগুলোতে অশান্তির আগুন লেগেছে, তেমনি আমাদের ঘরগুলোতেও এ আগুন লেগে যাক।

বর্তমান সময়ে শয়তানী শক্তিসমূহের সার্বিক প্রচেষ্টা, দিন-রাত মেহনত এবং নিত্যনতুন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে একটি কথা অবশ্যই বুঝে আসে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের সবচে' বেশি জোর

দুটি বিষয়ে...। একটি বিষয়কে তো সারাবিশ্বের মুজাহিদীনে কেরাম সামলিয়ে নিয়েছেন। দ্বিতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে মুসলিম মহিলাগণ দায়িত্বশীল।

টার্গেটটি হচ্ছে মুসলমানদের ঘরকেন্দ্রিক। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, এবার কাফেররা তাদের সকল সৈন্যসামন্ত মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধে নামিয়েছে। তাদের সর্বপ্রথম লক্ষ হচ্ছে- মুসলমানদের সামাজিক পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়া, যেমনটি ইউরোপ-আমেরিকায় করা হয়েছে।

ইউরোপ-আমেরিকায় ঘর বলতে কোন জিনিষ নেই। "মা" কাকে বলে! বোনের কি অর্থ!! সন্তানের ভালবাসার স্বাদ কিভাবে অন্তরকে শান্ত করে!! কথাগুলো তাদের জন্য অপরিচিত হয়ে গেছে। পারস্পরিক স্নেহ-ভালবাসা, পাড়া প্রতিবেশির অধিকার... বিষয়গুলো তাদের সমাজ থেকে হারিয়ে গেছে। সমাজের সকল স্তরের মানুষ ব্যক্তিগত জীবনযাপন করছে।

সন্তানেরা মায়ের মমতা ভুলে গিয়ে বড় হয়েছে। কেননা, মায়ের হাতে সন্তানকে একটু ভালবাসা দেয়ার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। অথবা তার পশুত্বের চরিত্র এ মমতাকে আটকে রেখেছে। এমন মায়েরাই সন্তানদের ভালবাসা পাওয়ার আশায় অপেক্ষায় থাকে ?? নাকি বৃদ্ধাশ্রমে (বয়স্কদের জন্য তৈরীকৃত হোস্টেল, পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে সন্তানেরা তাদেরকে ঘর থেকে বের করে ঐ সকল হোস্টেলে অবশিষ্ট জীবন ব্যয় করার জন্য রেখে আসে) বসে বসে জীবনের চাকা এমনভাবে টানতে থাকে, যার কল্পনা করলে ব্রেইন আউট হওয়ার উপক্রম হয়।

সাবেক মার্কিন সরকারী উপদেষ্টা মিষ্টার বারজেন্সকি" জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক Out Of Central গ্রন্থে লেখেন- "ঐ সমাজ যেখানে সবকিছু স্বাধীনভাবে করার অনুমতি দেয়া হয় এবং সবকিছু অর্জন করতে দেয়া হয়, সেটা এমন সমাজ যার চারিত্রিক মাত্রা অস্বাভাবিক নিম্নমুখী হয়ে যায়। এমন সমাজের মানুষ তার মনোচাহিদা পূরণের জন্য সব সময় পাগলা কুকুরের মত উৎপেতে বসে থাকে এবং যে কোন মূল্যে তা পূরণ করে ছাড়ে।"

প্রসিদ্ধ চিন্তাবীদ "ডক্টর এলেক্স ক্যারল" তার বিশ্বনন্দিত Man The Unknown গ্রন্থে লেখেন- "আমরা পশ্চিমা বিশ্ব চারিত্রিক অবনতির দিক দিয়ে অত্যন্ত নিম্নস্তরে প্রবেশ করেছি। আমরাই সর্বনিকৃষ্ট ও ঘৃণিত সম্প্রদায়।"

ইউরোপ আমেরিকার এ সামাজিক অবস্থান, যা মানবতা ও সভ্যতাকে বহুপূর্বেই মাটিচাপা দিয়েছে, তা এক পশুত্বের সমাজে পরিণত হয়েছে। ইবলীস কর্তৃক মুর্খসভ্যতা তাদেরকে মানবতার স্তর থেকে নামিয়ে অবনতির গর্তসমূহে প্রবেশ করিয়েছে। এর থেকেও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে- তাদের এ সামাজিকতাকে তারা আধুনিক সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। অথচ এটা কোন নতুন সভ্যতা নয়; বরং এ সভ্যতার ইতিহাস ইবলীসের সকল অনিষ্টতা ও দুর্ভাগ্যতার ইতিহাসের মত প্রাচীন। পশ্চিমাদের বর্তমান সভ্যতা হাজারো বৎসরের পূরাতন অমানবীয়, দুর্গন্ধময় এবং শয়তানের পেট থেকে জন্ম নেয়া এক সভ্যাতা, মানব সভ্যতার সাথে যার কোনই সম্পর্ক নেই।

আপনি মানবেতিহাস লক্ষ করে দেখুন- লূত জাতির ইতিহাস পড়ুন। তাদেরও একই সভ্যতা ছিল। এ মুর্খ সভ্যতাই তাদেরকে পুরুষদের ব্যবহার করে নারীজাতি থেকে গাফেল বানিয়েছিল এবং মহিলাদের ছেড়ে পুরুষদের সাথে যৌনচাহিদা পূরণকে ফ্যাশন বানিয়েছিল। নারীজাতিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে অনিষ্টতায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। এমনই অনিষ্টতা, যা বর্তমান ইউরোপ আমেরিকান মহিলাদেরও পা থেকে নিয়ে মাথা পর্যন্ত ভরে আছে। পাশাপাশি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও এ অনিষ্টতা ছড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। লূত জাতি হাজার বৎসর পূর্বেই এর শাস্তি ভোগ করে গেছে। আল্লাহ তা'লার আদেশ অমান্যকারীদের কিরকম পরিস্থিতির শিকার হতে হয়, পর্যটকদের জন্য "মৃতসাগর" অদ্যাবধি তার সাক্ষী হয়ে আছে যে, এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক।

বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা এমনই এক মুর্খ সভ্যতা, যা কখনো গ্রীক সভ্যতার নামে ইবলিসের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে, আর কখনো এবাদত ও উপাসনার কথা বলে নারীজাতিকে কলঙ্কিত করেছে। কখনো রুমী সভ্যতার পোশাক পড়ে রুমের ষ্টেডিয়ামে মহিলাদেরকে উলঙ্গ নাচিয়ে তাদের মাথায় গৌরবের মুকুট রেখেছে। কখনো পারস্য সভ্যতার আকৃতিতে এসে বোনকে ভাইয়ের জন্য হালাল সাব্যস্ত করেছে। মুর্খ এ সভ্যতারক্ষীদের অহংকার রক্ষার্থে কখনো নিরপরাধ কন্যাসন্তানদেরকে মাটির নিচে জ্যান্ত কবর দেয়াকে ফ্যাশান এবং রেওয়াজ বানিয়েছে। আর কখনো নারীজাতিকে অপবিত্র ও অলক্ষী বলে তাদের থেকে দূরে থাকাকে এবাদত আখ্যা দিয়েছে। এটা হচ্ছে ঐ মুর্খ সভ্যতা, যা হিন্দুস্তানের মহিলাদেরকে সকল বিপদ ও অনিষ্টতার মূল বলে মৃত স্বামীর সাথে জীবিত জ্বালিয়ে দেয়াকে পূণ্যের কাজ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

এটা কোন আধুনিক সভ্যতা নয়। এটা কোন সুশীল সমাজের সভ্যতা নয়। বরং এটা হচ্ছে মুর্খতাযুগের মুর্খসভ্যতা, যা প্রত্যেক যুগেই নারীদেরকে সভ্যতার নামে ক্ষুদার্থ কুকুরদের সামনে লেলিয়ে দিয়েছে। এমন কুকুর, যে ক্ষুদার্থও হয়, বুড়াও হয়। যে বেশি নড়াচড়া না করেই পেট ভরে নিতে চায়। মুর্খ সভ্যতার এ কার্যক্রমগুলি নারীজাতির জন্য ঐ কুকুরের মত।

এ সভ্যতারক্ষীরা আজও মহিলাদের ব্যাপারে ঐ মনোবাসনাই পোষন করে, যা লূত জাতি থেকে শুরু করে ভারতের হিন্দু সমাজ এবং পশ্চিমাবিশ্বের খোলামনের সামাজিক লোকেরা পোষন করে থাকে। তাদের দাবী যে, মনোচাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সকল বাধা বিপত্তিকে নিঃশেষ করা হোক। পশ্চিমা বিশ্বের এ সভ্যতাকে আধুনিক সভ্যতা বলে আখ্যায়িতকারীগণ হয়ত- ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আর নাহয় তারা তুতা পাখির মত যে, মালিক যে শব্দই তার সামনে উচ্চারণ করে, তাই সে জপতে শুরু করে।

সুতরাং মুসলিম নারীদের এ কথা ভাল করেই বুঝে নেয়া উচিত যে, নারীজাতির স্বাধীনতা, উন্নতি, স্বচ্ছলতা এবং সমাধিকারের ধ্বনি দেয়া লোকজন তাদের শুভাকাঙ্খী নয়; বরং তারা হচ্ছে ঐ মুর্খ সভ্যতার রক্ষীবৃন্দ- যে মুর্খসভ্যতা প্রতিটি যুগেই নারীজাতিকে কলংকের আসনে বসিয়েছে।

আজকের মায়েরা যদি নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে অনুভূতিশীল না হোন, তাহলে এ সভ্যতা এবং এ পরিস্থিতি বেশি দূরে নয়; বরং তা আপনার ঘরের দরজাতেই খটখট করছে। বরং যদি বলি যে, ঘরের ভেতরে প্রবেশ করছে, তাহলেও ভুল হবেনা। ফ্যাশন, নারী স্বাধীনতা, পুরুষদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে চলার অঙ্গিকার, ঘরের চার দেয়াল থেকে বেরিয়ে দুনিয়ার হাঙ্গামায় পুরুষদের সাহচর্য প্রদান... ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ঐ সকল ইউরোপ-আমেরিকান সভ্যতায় নিমজ্জিত করার মত ব্যাপার, যার মধ্যে একজন মহিলা প্রবেশ করার পর চিরদিনের জন্য সে পুরুষদের খেলনা হয়ে যায়।

তোমাদের প্রকৃত শুভাকাঙ্খী এবং রক্ষী হচ্ছে ঐ সভ্যতা, যা প্রতিটি যুগেই ঐ মুর্খ সভ্যতারক্ষী হায়েনাদের কবল থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করেছে। তোমাদেরকে সম্মানের যথাযোগ্য আসনে সমাসীন করেছে। এ আসন তোমাদেরকে ঐ সৃষ্টিকর্তা দান করেছেন, যিনি তোমাদেরকে সম্মানের অধিকারী বলে পাঠিয়েছেন এবং মুর্খসভ্যতার অধিকারী কুকুরদের থেকে তোমাদেরকে রক্ষার জন্য কিছু মৌলিক নিয়মপদ্ধতি শিখিয়েছেন। এ সকল মৌলিক নিয়মকানূনই তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারে। সুতরাং কখনোই এগুলি পরিহার করা তোমাদের উচিত নয়। তোমাদেরকে এ সকল নিয়মকানূন থেকে হটানোর জন্য দুশমনেরা বলতে পারে যে, "এসকল নিয়মকানূন এখন পুরাতন হয়ে গেছে", "বর্তমান আধুনিকতার যুগে এগুলো অচল"... ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারা যাই বলুক; তাদের কথায় কান দেবেননা। বরং ইসলামী সভ্যতাকে নিজের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আবশ্যিক করে নিন। পাশাপাশি মুর্খসভ্যতার এ ছোবল থেকে নিজেকে এবং স্বীয় সন্তানদেরকে রক্ষা করুন। যাতে ঘরোয়া সুখ-শান্তি বজায় থাকে, পিতা-মাতা এবং সন্তানদের ভালবাসায় কারো নজর না পড়ে, ভাই-বোনের মাঝে আত্মীয়তার পবিত্র পবিত্র বন্ধন অটুট থাকে। আপনার দুশমনেরা আপনার বিরুদ্ধে উস্কানী দিচ্ছে, এই উস্কানীকে আপনাকেই দমন করতে হবে।

ইসলাম আপনার খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতাগুলিকে শিকলে বন্দি করে রাখেনা। আপনি আপনার যোগ্যতাগুলিকে ইসলাম এবং দ্বীনের খেদমতের জন্য উন্মুক্ত করে দিন। আপনি যদি মুসলমানদের সেবায় অংশগ্রহণ করতে চান, তবে একটু চিন্তা করে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করুন যে, সেবাগুলো বাস্তবায়নের জন্য কি আমাকে পশ্চিমা সভ্যতায় ডুবে যেতে হবে ??!! ইসলামী নিয়মকানূন মেনে আপনি কি এগুলো বাস্তবায়ন করতে সক্ষম নন ??!! এমনটি কি কখনো সম্ভব যে, পশ্চিমা সভ্যতা অনুসরণ করেই আপনি তাদের মুকাবেলা করবেন ??!! অথচ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন আপনাকে সম্মানের পাত্র বানিয়েছেন এবং আপনার জন্য ঐ পরিণাম বেছে নেননি, যা কাফেরদের জন্য বেছে নিয়েছেন।

আজও কত মুসলিম নারী ইসলামের সহযোগীতা ও উন্নতিতে স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করছে। আল্লাহ তা'লাও তাদের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত নিয়েছেন। সুতরাং মুহাম্মাদে আরাবী রাসূলে কারীম সা. এর একমাত্র আদর্শ অনুসরণ করলেই আমরা দুনিয়া-আখেরাতে সফল হতে পারব। এতে আমাদেরই মঙ্গল নিহীত রয়েছে। যেমন- আপনি যদি ডাক্তার হয়ে থাকেন, তাহলে সকাল-সন্ধা আপনার কাছে কত মহিলা চিকিৎসার জন্য এসে থাকে। তারা আপনার কথা মনযোগ দিয়ে শুনে থাকে। আপনি যদি তাদেরকে বর্তমান যুগের ফেতনা এবং দাজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে পাঁচ মিনিট করে বলেন, তাহলে হয়ত আল্লাহ তা'লা আপনার কথার প্রেক্ষিতে কত মা-বোনের জীবনধারা পরিবর্তন করে দেবেন। আপনি যদি শিক্ষক হয়ে থাকেন, তবে সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত আপনি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে থেকে তাদেরকে টিচিং দেন। এসকল ছাত্র-ছাত্রীরা আপনার উপর ভরসা করে আপনার কথাগুলোকে আদর্শের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করে। আপনি তাদেরকে বর্তমান সময়ের ব্যাপারে অবহিত করেন। কোনটা করলে লাভ আর কোনটায় ক্ষতি- তাদেরকে একটু বুঝান। তাদেরকে বলুন যে, আমেরিকা-ইউরোপ থেকে মহিলারা তাদের ঘরবাড়ী ছেড়ে এজন্য এসেছে যে, তারা তোমাদের ঘরবাড়ী, দ্বীন-আখেরাত ধ্বংস করতে চায়। আফগানিস্তানে মার্কিন সেনাদের সাথে যেসকল মহিলা এসেছে, তারা মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর দ্বীনকে মিটিয়ে সারা দুনিয়ায় শয়তানী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছে। কাফেরদের নারীরা তাদের মিথ্যাধর্মের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করছে..। তারা তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত-ইঞ্জীল (বিকৃত) পড়েই এখানে এসেছে। তাদের কিতাবের ভাষ্য অনুযায়ী- মুসলমানদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলেই বিশ্বজুড়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। এহেন পরিস্থিতিতেও কি মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর রূহানী মেয়েরা রাসূলের দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করবেনা ??!! তাই যদি হয়...তবে আয়েশা সিদ্দীকা রা. ও ফাতেমা যাহরা রা. এর স্থলাভিষিক্তদেরকেও নিজেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস হতে, সন্তানদের হত্যার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে এবং স্বীয় সমাজকে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার মত পরিস্থিতিও অবলোকন করতে হবে।

আমার বোনেরা! দুনিয়া তো চলতেই থাকবে। এ বিষয়গুলো মৃত্যুর পূর্বে আমাদের থেকে আলাদা হবেনা। সুতরাং আপনি নিজেই নিজেকে এসকল ঝামেলা থেকে মুক্ত করুন। দুনিয়াকে ছাড়ুন...ভাগ্যে যতটুকু লেখা আছে, ততটুকুই মিলবে। দুনিয়ার পেছনে চললে সে আপনাকে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত ও অপদস্থ করে ছাড়বে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে লাথি দেবে, দুনিয়া তার পায়ে এসে পড়বে। আপনি আপনার আখেরাত নিয়ে ফিকির করেন। অন্যদের দেখবেন না...কে কি করছে, কার কাছে কতটুকু আছে, কে কত তালা বাড়ী বানিয়েছে!! বরং দেখুন- আখেরাতের জন্য কে কি পরিমাণ প্রস্তুতি গ্রহণ করছে! কেননা সেটাই হচ্ছে চিরস্থায়ী ঘর। এটা আবার কেমন বুদ্ধিমানের কাজ যে, যেখানে থাকা হবেনা- সেখানে বিশাল বাড়ী বানিয়ে বসেছে। আর যেখানে তার চিরদিন থাকা লাগবে, তার জন্য কোন ফিকিরই করছেনা। দুনিয়ার জিন্দেগী একভাবে অতিবাহিত হলেই হল। কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি, যে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রস্তুতি নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকে।

সুতরাং আমরা যদি ভালকিছু করি, তবে তা আমাদেরই উপকারে আসবে। আর যদি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করি, তবে তা আল্লাহর দ্বীনকে সামান্যতম ক্ষতি করতে পারবেনা। কিন্তু এরফলে আল্লাহ তা'লা আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হবেন এবং -আল্লাহ না করেন- আমরা "কানা দাজ্জাল"কে খোদা বলে বিশ্বাসকারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবো। যাকে বর্তমান যুগে ফ্যাশন বলা হচ্ছে, এর সবই কানা

দাজ্জালের পেতে রাখা ফাঁদ। আপনার যদি জানা থাকে যে, ফ্যাশন কোথায় তৈরী হয়, কাপড়ের নতুন নতুন ডিজাইন কোথায় প্রস্তুত করা হয়, এরপরও আপনি নিজেকে মনচাহি জিন্দেগীর উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তাহলে আপনিই চিন্তা করুন যে, আপনার এ শিক্ষাদিক্ষা ও অনুভূতি কোন পর্যায়ের! যে, সে কোনটি লাভ আর কোনটি লোকসান, তা পৃথক করতে পারছেনা। পক্ষান্তরে আপনি যদি অন্যান্য মহিলাদের দেখাদেখি এমন পথ বেছে নিয়ে থাকেন, ফ্যাশন এবং আর্ট সম্পর্কে আপনার তেমন জ্ঞান নেই, তবে এমন নেক মহিলাদের কাছ থেকে আপনি তা জেনে নিন, যাদের কাছে এগুলোর বাস্তবতার জ্ঞান রয়েছে।

ফ্যাশনের যে সড়কে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং নিজের লক্ষকে মনচাহি জীবনযাপনের উপর ছেড়ে দিয়েছেন! স্মরণ রাখবেন যে, যে এপথটি সোজা কানা দাজ্জালের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এ সভ্যতার আইডল হচ্ছে ঐ মিথ্যা খোদা। পাশাপাশি এটাও মনে রাখবেন যে, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের কাছে এপথটি পছন্দনীয় নয়।

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. (صحيح مسلم: 5704)

অনুবাদ- হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবী করীম সা. এরশাদ করেন- ঐ সকল মহিলা, যারা কাপড় পরিধান করার পরও উলঙ্গ হয়, অপরকে নিজের প্রতি আকৃষ্টকারী এবং নিজেও ঝুকন্ত (কোমর দুলিয়ে বাঁকা অবস্থায়)। তাদের মাথা ঝুকে থাকা উটের কান্ধার মত দেখাবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা, এমনকি জান্নাতের সুগন্ধিও তারা পাবেনা। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ এত.. এত.. পরিমাণ দূর থেকেই অনুভব করা যায়।

আল্লাহ রক্ষা করুন- না কোন ভাল কাজ তাদের উপকারে আসবে, না দাজ্জালের পথে চলার কারণে কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে। বান্দা যা করছে, নিজের জন্যই করছে।

শহরের দেয়ালে দেয়ালে লাগানো সিনেমার পোষ্টার, হলিউড-বলিউডের কোন ফিল্মের এ্যাড বা কোন সিডি-ভিসিডির দোকানে গেলেই গত রং-বেরংয়ের, কত ঢংয়ের মহিলাদের ছবি দেখা যায়। কাপড় পড়ে আছে, তবুও উলঙ্গ। দেখা মাত্রই যুবকেরা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ছবিতে মেয়েরাও মেকআপ করে নিজেদেরকে এমনভাবে প্রকাশ করেছে যে, ঘাড়ের দিকে হাত নিয়ে মাথা একদিকে আর কোমর আরেক দিকে..। নিজেরাও ঝুকে আছে এবং দর্শকদেরকেও নিজেদের প্রতি ঝুকাচ্ছে। সুতরাং এধরনের মহিলাদের পরিণাম যে কি হবে- তা রাসূলে কারীম সা. স্পষ্টকরেই বলে গিয়েছেন- জান্নাত তো দূরের কথা! জান্নাতের সুগন্ধিও তারা পাবেনা।

২০১০ সালের শেষের দিকে বলিউডের শাহরুখ খান যখন বাংলাদেশে এসেছিল, সাথে করে উপরোক্ত জাহান্নামী নর্তকীদেরকেও সাথে এনেছিল। শাহরুখ ঢাকার আর্মি ষ্টেডিয়ামে দুই/তিন ঘন্টার পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ঐ সকল নর্তকিদের নিয়ে নেচে নেচে পুরো বাংলাদেশকে অপবিত্র করেছিল। আর বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশের মানুষেরা দুই/তিন ঘন্টার এ অনুষ্ঠান দেখার জন্য দশ হাজার থেকে নিয়ে ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। আমাদের বাংলাদেশের ধর্মীয় পরিস্থিতি কি পর্যায়ে পৌছেছে, এখন আন্দাজ করুন। (আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন- নবী করীম সা. স্বাধীন মহিলাদেরকে (পরপুরুষের সামনে) মাথার চুল ষ্টাইল করা থেকেও নিষেধ করেছেন। (مجمع الزوائد للهيثمي: 8865)

একদিকে দাজ্জালের জাল বিছানো, অপরদিকে মুহাম্মাদে আরাবী সা. এর বাতানো সোজা পথ। প্রতিটি মুসলিম বোন নিজের জন্য যে পথই বেছে নিতে চাইবে, বেছে নিতে পারবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- নিশ্চয় বনী ইসরাইলের নারীগণ পায়ের দিক থেকে আসা

ফেতনায় পড়ে ধ্বংস হয়েছিল। আর এই উম্মতের নারীগণ মাথার দিক থেকে আসা ফেতনায় পড়ে ধ্বংস হবে। (مصنف عبدالرزاق:20609)

অর্থাৎ মাথার চুল ষ্টাইল করা, মাথায় শিখদের ন্যায় চুলের জমাট বানিয়ে মানুষের সামনে প্রকাশ করা, মেশিনে তৈরী পৃথক চুল মাথায় লাগিয়ে রং দেয়া। এসকল বিষয় আল্লাহ তা'লার অসন্তুষ্টি ডেনে আনে। ফলে এগুলো ধ্বংসের কারণ। তাছাড়া এগুলোর মাধ্যমে দুনিয়াবী ক্ষতিও বিদ্যমান। সাইন্টিফিক দৃষ্টিতে মহিলাদের চুল কাটার মাধ্যমে তাদের শরীরে মারাত্মক ধরনের কুপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন- নবী করীম সা. এমন মহিলাদের উপর অভিশাপ করেছেন, যারা পৃথক চুল লাগায় বা অন্যদের লাগিয়ে দেয়। পাশাপাশি ঐ সকল মহিলাদের উপরও অভিশাপ করেছেন, যারা সুই দিয়ে শরীরের চামড়ায় খুত করে দেহে নকশা একেঁ থাকে। (سنن النسائي:5008)

আল্লাম নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ. বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন।

আমার বোনেরা! আপনারা যদি সন্তানদেরকে টেলিভিশনের আদর্শে লালন পালন করে থাকেন, তবে স্মরণ রাখবেন- উপরে যা বর্ণিত হয়েছে, এটাই আপনাদের সর্বশেষ পরিণতি। একটু চিন্তা করুন- আপনার এই ছোট্ট খুকির জন্য সর্বপ্রকার চাহিদায় আগুন লাগিয়েছেন... নয় মাস অতিকষ্ট করে পেটে ধরেছেন... মৃত্যুর উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করে তাকে জন্ম দিয়েছেন... অতপর তার জন্য আপনি আপনার সকল আরামায়েশ ভুলে গেছেন... রাত নয়, দিন নয়... গরম নয়, ঠান্ডা নয়... সার্বক্ষণিক তার দেখাশুনায় কাটিয়েছেন... তার যদি কোন কষ্ট হতো, তবে আপনি ভেঙ্গে পড়তেন। কিন্তু আজকের এই মডার্ন সন্তানের কারণে আপনি আজ কারাগারের দুর্গন্ধময় সেলে বন্দি। হয়ত আপনি সন্তানকে কোন ভুল পথ থেকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সন্তান তার মোবাইল ফোন (যা আপনার স্বামীর কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে কেনা) দিয়ে পুলিশের কাছে আপনার ব্যাপারে অভিযোগ করেছে। অতপর দেখতে দেখতে সকল মহল্লাবাসীর সামনে পুলিশ আপনার ঘরে প্রবেশ করে মান-সম্মানকে মাটির সাথে মিশিয়ে আপনাকে ধরে গাড়ীতে ঢুকিয়ে থানায় নিয়ে গেল।

আমার বোনেরা! আপনি যদি আপনার সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে তাকে দুনিয়ার পূজারী বানাচ্ছেন, তাহলে আগামী কাল এমন পরিস্থিতির জন্য আপনি নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন। এই দিনটি আপনার থেকে বেশি দূরে নয়। আমাদের বাংলাদেশে এমন মায়েরও অস্তিত্ব রয়েছে, যারা তার সন্তানকে "আল্লাহ" ডাকটি পর্যন্ত শেখায়নি। শিশুকাল থেকেই সন্তান এক স্বাধীন শয়তানী ধর্মের অনুসারী। শৈশব থেকে সন্তান যা মন চেয়েছে, তাই করেছে। টেলিভিশনের রিমোট হাতে নিয়ে নিজের কক্ষে যা মনচায়, দেখেছে। আর "মা"-ও অত্যাধিক বিলাসী এবং ঘুরাঘুরির কারণে এতটুকু সময় তার মেলেনি যে, সন্তানকে কিছুটা সময় দেবে। কখনো তার কক্ষে গিয়ে একটু তদারকি করেনি যে, আমার ছোট্ট সন্তানটি কি দেখছে এবং কি করছে।

এসকল সন্তানেরা বড় হয়ে যদি তাদের পিতা-মাতাকে ঘর থেকে বের করে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, তাহলে এক্ষেত্রে সন্তানের কোন ভুল হবে মনে হয়না। সুতরাং পরিস্থিতির ভয়াবহতা এবং দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিজেকে এবং সন্তানকে বাঁচানোর জন্য আপনার অন্তরে "দরদ" তৈরী করতে হবে। শুধু নিজেকেই নয়; বরং আশপাশের অন্যান্য বোনদের, আত্মীয়স্বজন এবং পড়শী বোনদেরকেও দাজ্জালের ফেতনা এবং তার ফাঁদ সম্পর্কে আপনাকেই অবহিত করতে হবে। আপনার প্রতিটি কথা এবং পদক্ষেপে আল্লাহ পাক আপনাকে ছওয়াব দান করবেন। আপনার সন্তানের অন্তরে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা, নামাযের গুরুত্ব, পিতা-মাতার মর্যাদা এবং ইসলামের মহব্বত সৃষ্টি করুন। পক্ষান্তরে গান, মিউজিক, কার্টুন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করা থেকে তার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করুন।

পুরুষদের দায়িত্ব...

সাধারণত পুরুষদের মধ্যে দেখা যায় যে, তারা নিজেরা তো ঠিকই নামায-রোযা ইত্যাদি সঠিকরূপে গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং জান্নাত অর্জনের জন্য পূণ্যের কাজে সময় লাগিয়ে থাকে। কিন্তু নিজের সন্তান, বোন এবং মেয়েদের ব্যাপারে এতটুকু চিন্তা করেনা। যারফলে তাদের এবং আত্মীয়স্বজনদের ধর্মীয় জীবনযাপনে বিস্তর অমনযোগীতা দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষগণ এ অলসতায় মনযোগ না দেয়ার ফলে পরবর্তীতে তা আস্তে আস্তে প্রশস্ত হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে এমন এক সময় এসে উপস্থিত হয় যে, সে তার স্ত্রী-সন্তানকে একটি হারাম বস্তু থেকে নিষেধ করতে থাকলেও স্ত্রী-সন্তান এটাকে যুগের ফ্যাশান বলে কোমর বেধে তা ব্যবহার করতে থাকে।

সুতরাং পুরুষদের উচিত- তাদের নিজেদের আখেরাত নিয়ে ফিকিরের পাশাপাশি পরিবার-পরিজনকেও আগত সম্মুখ ঝড় থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থাপনা তৈরী করে। তাদের কাছে সময় দিয়ে তাদের দ্বীনী শিক্ষা-দিক্ষায় প্রতিপালন করেন। সামনের ভয়ানক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন।

এটা ভেবে বসে পড়বেননা যে, আমি তো একা! আমার কথা কে শুনবে আর কে মানবে!! এমনটি কখনো ভাববেন না। আপনি যখনই উম্মতের দরদ নিয়ে আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে কোন পদক্ষেপ নিবেন, তখন আল্লাহ পাকও আপনার প্রতিটি পদক্ষেপে আপনাকে সাহায্য করবেন। ফলশ্রুতিতে আপনি কল্পনাও করতে পারবেননা- যে কাজটি আপনি একা শুরু করেছিলেন, এখন তা লাখো মুসলমানের কন্ঠ এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কোন ময়দানে সাহস হারিয়ে ফেলা, নিরাশ হয়ে যাওয়া এবং মন ভেঙ্গে দেয়া হক্কের রাস্তায় কখনো বাধা হতে পারেনা। এটা তো এমন এক পথ; যার মধ্যে শুধু অটল থাকাটাই সফলতার লক্ষণ, রাস্তাতো এমনিতেই তৈরী হতে থাকে।

এন,জি,ও

এটা হচ্ছে দাজ্জাল সরকারের নিয়মিত মন্ত্রণালয়, যা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সুন্দর সুন্দর ধ্বনির আশ্রয় নিয়ে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত করছে। এর প্রতিটি স্তর এরকম যে, জনসাধারণ তো দূরের কথা; অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও এখেকে বেখবর। যেমননাকি ইতিপূর্বে আপনি জেনে এসেছেন যে, দাজ্জালের সবচে' বেশি জোর হচ্ছে- বিশ্বের সকল পানীয় নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে ফেলা এবং পান করার প্রাকৃতিক উপাদানগুলো খতম করে দেয়া। পাতালের পানি নিঃশেষ করে দেয়া তার প্রধান টার্গেটগুলোর অন্যতম। সুতরাং এসকল প্রাকৃতিক পানীয় উপাদানগুলো ধ্বংস করার জন্য এমনসব মেশিন ফিট করা হচ্ছে, যা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পানির ভান্ডারগুলিকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন- লিপ্টস এর বৃক্ষ। বৃক্ষটি পানির জাতশত্রু। যেখানেই তা রোপণ করা হয়, সেখানেই পানির সমতা দ্রুততার সাথে মাটির নিচে চলে যেতে থাকে। এ বৃক্ষের জড়গুলো পানির সাথে সাথে চলে। পুরো পাকিস্তান জুড়ে জনসেবার নামে তৎপর এন,জি,ও বাহিনী এজাতিয় বৃক্ষ রোপণ করেছে। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে আপনি এর বিশাল বিশাল বাগিচা প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। হতে পারে যে, এন,জি,ও-র কাজে নিয়োজিত পাকিস্তানী দায়িত্বশীলগণ দাজ্জালের এ চক্রান্ত সম্পর্কে অজ্ঞতাবসতই অপারগ হয়ে এধরনের কাজ করে করে পুরো দেশবাসীকে দাজ্জালের পানির মুকাপেক্ষী করে তুলছে।

নারীজাতির স্বাধীনতার নামে তৎপর এন,জি,ও বাহিনী নারীদের জন্য তৈরীকৃত দাজ্জালের এ কার্যক্রমকে শতভাগ রঙ্গিন করে তুলেছে। এ স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম থেকে মুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা দাজ্জালের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা। এন,জি,ও-র সকল খরচ বহনকারী বেসরকারী সংস্থা এবং গোপন ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে যে, মহিলাদেরকে বেশি বেশি ঘর থেকে বের করে তাদেরকে দাজ্জালী সভ্যতায় রঙ্গিন করার প্রতি মনযোগ দেয়া হোক। পাকিস্তানের মাটিতে তৎপর বেসরকারী এক সংস্থার (যারমধ্যে কর্মরত সকলেই পাকিস্তানী) প্রধান টার্গেট হচ্ছে- ঘরোয়া

পরিবেশে বড় হওয়া মহিলাদেরকে যে কোন উপায়ে ঘরের বাইরে নিয়ে আসা। তাদের প্রচেষ্টা হচ্ছে- যখনই কোন উপায়ে নারীদের বাইরে আসার সুযোগ তৈরী হয়, তখনই এন,জি,ও বাহিনী এটাকে বিভিন্ন প্রোগ্রামে প্রচার করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে কোন কোন এন,জি,ও-র তৎপরতা হচ্ছে শিশুদের টার্গেট করে।

বালাকোট এবং মুজাফফরাবাদের ভূমিকম্পন কবলিত এলাকাগুলিতে এন,জি,ও বাহিনী তাদের আসল চেহারা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। যে সকল ব্যক্তিবর্গ ভূমিকম্পনের পরবর্তী সময় ওখানে অবস্থান করেছে, তারা ভাল করেই জানে যে, দুর্ঘটনার পর ওখানকার পরিস্থিতি দাজ্জালের মহাফেতনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেভাবে তারা মানুষের কাছে লোক লাগিয়ে রেখেছিল এবং যা চেয়েছিল তাই করেছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল যে, দাজ্জালকে আত্মপ্রকাশ করানোর প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। যেই রকমভাবে দাজ্জাল অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদের কাছে খানা-পিনা নিয়ে এসে নিজেকে খোদা বলে বিশ্বাসের দাবী জানাবে, ঠিক তেমনিভাবে এন,জি,ও বাহিনী-ও ওখানকার লোকদের সাথে এরকম আচরণ করেছে। এমনকি কতিপয় বেসরকারী এন,জি,ওদের পক্ষ থেকে লোকদেরকে স্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে যে, "তোমাদের আল্লাহ কোথায় ??" এ সাহায্য তো আমাদের "মাছীহ"এর পক্ষ থেকে এসেছে। তোমরা কি তাকে "মাছীহ" বলে স্বীকার করবেনা ??!!

ওয়াইল্ড লাইফ এবং লাইভষ্টাক...

বন্যপ্রাণীদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার জন্য এ বিভাগে তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। বিশেষত প্রাণীদের স্থান-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। লাইভষ্টাকের একটি স্বতন্ত্র বিভাগই রয়েছে প্রাণীদের নিয়ে গবেষণা ক্ষেত্রে। তাদের টার্গেট হচ্ছে- দুগ্ধ প্রদানকারী প্রাণীদের দেহে কৃত্রিম টিকা লাগিয়ে সময়ের পূর্বেই দুধ দেয়া থেকে বারণ করে দেয়া। পাশাপাশি এর মাধ্যমে স্তনের দুধ নষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। আর জনসাধারণ বেশি দুধ পাওয়ার লোভে এ নকল টিকা গাভীর দেহে ব্যবহার করছে।

আজকাল প্রাণীদের দেহে টিকা লাগানোর কার্যক্রমটি জোরেশোরেই চলছে। দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পূর্বেই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মানুষদেরকে দুধ থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করছে। যাতে করে দুর্ভিক্ষের সময় কারো কাছেই খাওয়ার মত কোন বস্তু বিদ্যমান না থাকে। যারফলে সকলেই দাজ্জালের খানা-পিনার মুকাপেক্ষী হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে নিরেট দাজ্জালী প্রোগ্রাম। এমনকি তাদের নিদর্শনও শয়তানী প্রতিক্রিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন- আপনি "লাইভষ্টাক এন্ড ডেরী ডেভলপমেন্ট"এর মনোগ্রামে তাকান- এটা হচ্ছে শয়তানের ছবি। এটাকে তারা টেবিলের সামনে রেখে সবসময় পূজা করে থাকে। সুতরাং মুসলমান জনসাধারণের প্রতি অনুরোধ- আপনারা স্বীয় গরু-গাভীর দেহে এসকল টিকা লাগিয়ে তার স্বভাবজাত শক্তিকে নষ্ট করবেননা।

জাদু... আত্মীকতার আকৃতিতে...

দাজ্জাল আত্মপ্রকাশের পূর্বে জাদু এবং শয়তানী তৎপরতাগুলোকে সরকারী পাঠ্যগত বিষয় আকারে পড়ানো হবে। বর্তমানে এক্ষেত্রেও জোরেশোরে তাদের তৎপরতা চালু রয়েছে। গোপন আত্মার সাথে কথা বলা শেখানো হচ্ছে। এরকম অসংখ্য পীর আছে; যারা একথার উপর মানুষকে বায়আত করে থাকে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার আক্বীদা পোষন করা সঠিক নয়। অতপর সে কাশফের দাবী করে। আমাকে একজন নির্ভযোগ্য ব্যক্তি জানিয়েছে যে, এ ক্লিনশেভ পীরসাহেব হচ্ছে আমেরিকান। পাকিস্তানের সেনাঅফিসার ও তাদের স্ত্রী-সন্তানেরা দ্রুততার সাথে তার হাতে বায়আত হতে শুরু করেছে।

পেশোয়ারে আরো একজন জাদুগীর পীরসাহেব আছেন, যার মজলিসে মানুষ মাছের মত ছটফট করতে থাকে। আর মানুষেরা একে পীরসাহেবের কারামত মনে করে থাকে। অথচ শয়তানের সাহায্যে সে

মানুষের উপর এরকম অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে। সাবেক আফগান প্রেসিডেন্ট সিবগাতুল্লাহ-ও এদলের একজন বিশিষ্ট সদস্য। বর্তমানে সুইডেন হচ্ছে জাদুবিদ্যার মূল কেন্দ্রস্থল। ওখানে বসে বসে ইহুদী জাদুগীররা মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। বিভিন্ন প্রকার নিদর্শনের উপর জাদু মেরে এগুলোকে ঘরে ঘরে প্রবেশ করানো হচ্ছে। প্রতিটি নিদর্শনের প্রতিক্রিয়া ভিন্নরকম। নরওয়ে'র সামুদ্রিক অঞ্চলও বিভিন্ন প্রকার সাইন্সি এবং শয়তানী গবেষণার কেন্দ্রভূমি। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি,আই,এ প্রতি বৎসর জাদুবিদ্যা এবং আত্মীয় বিষয়ে গবেষণার জন্য কোটি কোটি ডলার সরবরাহ করে থাকে। সি,আই,এ'র সাবেক ডাইরেক্টর "এ্যাডমল স্লীন ফিল্ড" ১৯৯৭ সালের ১৩ আগষ্ট সিনেটে ভাষন প্রদানকালে স্বীকার করেন যে, সি,আই,এ মানুষের অজান্তেই তাদের মস্তিস্কের কন্ট্রোল নিয়ে নিচ্ছে।

ঠিক তেমনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও ১৯৯৫ সালের এক উন্মুক্ত কনফারেন্সে স্বীকার করেন যে, মার্কিন প্রশাসন মস্তিস্কের উপর কন্ট্রোল এবং অন্যান্য চারিত্রিক বিষয়ে গবেষণার কাজে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবত লিপ্ত রয়েছে এবং সে এ ধরনের কাজের জন্য মানুষের সামনে লজ্জিত।

ম্যানট্রিয়াল কানাডা'র পুরাতন পার্কে অবস্থিত এক প্রাচীন বিল্ডিংয়ের ভেতরে একটি প্রোগ্রাম শুরু করা হয়েছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল- মানুষের মস্তিস্কের উপর কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করা। প্রোগ্রামটি বাস্তবায়ন করার জন্য "রফ ফেলার" Rock Feller" মোটা অংকের ফান্ড প্রদান করেছিল। সুতরাং সমস্ত মুসলমানদেরকে ঐসকল ভয়ানক পীর থেকে দূরে থাকা উচিত, যারা শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বা মডার্নাইযেশানের দিকে আহবানকারী। বিগত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে, কারো কারামত দেখে ধোকায় পড়া ঠিক নয়; বরং কোরআন-হাদিসের আলোকে তাকে পরখ করে নেয়া চাই।

শয়তানের পূজারী...(Sanatist)

বিগত অধ্যায়ে আপনি দাজ্জাল এবং ইবলিসের ব্যাপারে পড়ে এসেছেন যে, তারা উভয়েই মানুষ বন্ধুদের সাথে সবসময় যোগাযোগের মধ্যে থাকে এবং তাদেরকে নিয়মিত হেদায়েত দিয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে যথারীতি এমন একটি দল বিদ্যমান; যারা প্রকাশ্যে শয়তানের (ইবলিসের) পূজা করে থাকে। দলটি আমেরিকা ও ব্রিটেনে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। পাশাপাশি তাদের অনেক অনুসারীও রয়েছে। সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনি এ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের একজন। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস, ইরানের প্রেসিডেন্ট মেহমূদ আহমাদিনেজাদ, জর্ডানের শাহ আব্দুল্লাহ...এসকল ব্যক্তিবর্গও এদলের সাথে সম্পর্ক রাখে। ইয়াসির আরাফাতও শয়তানের পূজারী ছিল। মার্কিন চলচ্চিত্র সংস্থা "হলিউডে'র প্রসিদ্ধ অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরও ধর্ম হচ্ছে শয়তানকে সন্তুষ্ট করা। ভারতীয় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন, মিসরের উমর শরীফ, প্রসিদ্ধ জাদুগীর ডিয়োড কপার ফিল্ড এবং সর্বকালের সেরা পরিবেশ নষ্টকারী মাইকেল জ্যাকসনও শয়তানের পূজারী। মাইকেল জ্যাকসনের প্রোগ্রামে শ্রোতারা অচেতন হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উপর শয়তান প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে তাদেরকে অচেতন করে দেয়।

এটা হচ্ছে পূর্ণ একটি শয়তানী দল, তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে "গড" (God) শব্দটি অত্যাধিক হারে ব্যবহার করে থাকে। তারা ইবলিসকে স্বীয় খোদা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। ইহুদী গোপন সংগঠন "ফ্রেমেসন"-ও মূলত দাজ্জালকেই খোদা মেনে থাকে এবং শয়তানকে পূজা করে থাকে। ফ্রেমেসনের ব্যাপারে যথেষ্ট গবেষণা ও অধ্যয়নের পর এবিষয়টি সামনে আসে যে, সে ইবলিস (Lucifer)কে খোদা মেনে থাকে। আমেরিকার সরকারী ধর্মও হচ্ছে শয়তানের পূজা করা। তাদের বক্তব্য- In God we Trust "আমরা খোদার উপর ভরসা রাখি" বাক্যটিতে তারা খোদা বলে দাজ্জালকে উদ্দেশ্য করে থাকে; খৃষ্টানদের খোদাকে নয়। এ দলের একমাত্র লক্ষ এবং টার্গেট হচ্ছে- ধর্মীয় (মানবতার) বিষয়গুলি নিশ্চিহ্ন করে সারা বিশ্বজুড়ে শয়তানী রীতি-নীতি এবং আচার আচরণে মানুষকে ডুবিয়ে দেয়া। মানুষকে পরিপূর্ণরূপে শয়তানী ঢংয়ে রূপান্তরিত করা। যিনা, মদ্যপান, জুয়া, সুদ, হত্যাযজ্ঞ, মানুষের গোশ্ত খাওয়া...ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলোই হচ্ছে শয়তানী

ধর্মের অংশবিশেষ। তবে এসব কিছুই করা হচ্ছে রূহানিয়্যাত তথা আত্মীকতার নামে।

শয়তানের পূজারী প্রায় সারাবিশ্বজুড়েই বিদ্যমান রয়েছে। বড় বড় শিল্পপতি এবং শহরের লোকদের থেকে এর সূচনা হয়ে থাকে। করাচী, লাহোর, ও ইসলামাবাদের নেতৃস্থানীয় এলাকাগুলোতে এদলটি বিদ্যমান রয়েছে। ফিল্মী (চলচ্চিত্র) ইন্ডাষ্ট্রিগুলোর দায়িত্বে থাকা লোকজন অতিদ্রুত শয়তানী ধর্মের অনুসারী হয়ে যায়। কেননা, তারাই শয়তানী চাহিদাকে একটি সুন্দর আকৃতি বানিয়ে মানুষের সামনে পেশ করে থাকে। কতিপয় কমেডি ড্রামা নির্মাণকারী ব্যক্তিবর্গও এ ধর্মের অনুসারী। কয়েকজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ আমাকে জানিয়েছে যে, তারা কিছু কিছু ড্রামায় শয়তানের ইন্টারভিউ পর্যন্ত করেছে। অধিকাংশ দেশের উর্ধ্বতন সেনাঅফিসারদের স্ত্রী-কন্যাদেরকে এ ধর্মে দ্রুত অন্তর্ভুক্ত হতে লক্ষ করা গেছে।

শয়তানের পূজাকারীদের সদর দফতর হচ্ছে আমেরিকায়। ব্রিটেনেও যথারীতি এ ধর্মের অনেক দফতর বিদ্যমান রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে একজন ব্রিটিশ নৌঅফিসার শয়তানের পূজা করার জন্য যথারীতি সরকারী অনুমতিও অর্জন করে ফেলেছে। তাদের উপাসনার নিয়ম হচ্ছে- রাতের মধ্যভাগে সকল পুরুষ-মহিলা কালো পোশাক পরে একস্থানে একত্রিত হয়। পোশাকের উপর শয়তানী চিহ্ন (লোগো) ও শয়তানী ছবি আঁকা থাকে। গলায় বিশেষ ধরনের এক শিকল এবং তামা লটকানো থাকে। সবাই গোল হয়ে দাড়িয়ে মাঝখানে মানুষের মাথার একটি কঙ্কাল রাখে। কঙ্কালের চারপাশে আগুন জালিয়ে দিয়ে অত্যন্ত শক্ত আওয়াজে মিউজিক চালু করা হয়। নেশাসৃষ্টিকারী ঔষধ খেয়ে সকলেই (পুরুষ-মহিলা) একজন আরেকজনের হাত ধরে আগুনের আশেপাশে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকে। অতপর প্র্যাকটিক্যাল পর্যায়ে শয়তানকে সন্তুষ্ট করার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস হচ্ছে- যতবেশি মদ্যপান এবং যিনায় লিপ্ত হবে, তত বেশি শয়তান সন্তুষ্ট হবে। তাদের মতে- যিনার কাজে নিজের মা, কন্যা, বোন সকলেই একসমান। এদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করা মানবস্বাধীনতায় অন্তরায় সৃষ্টি করার শামিল। আর তাই স্ত্রীদের পরিবর্তন করা (একজনের স্ত্রী আরেকজনকে সাময়ীকভাবে দেয়া) এমনকি চাকরীতে প্রমোশন লাভের জন্য স্বীয় স্ত্রী-কন্যাদেরকে অফিসারদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া...ইত্যাদি ব্যাপারগুলো তাদের কাছে নিতান্তই সাধারণ বিষয়। (আল্লাহর সকল লা'নত বর্ষিত হোক এমন শিক্ষিত ব্যক্তিদের উপর, যারা নারীজাতিকে ইসলামের সমুন্নত স্থান থেকে নামিয়ে অপমান ও লাঞ্ছনার গহীন গর্তে নিক্ষেপ করে দিয়েছে)

যদি মানবতার এ দুশমনদের এ বিশ্বাস নাও থাকে, তবুও একথায় কি সন্দেহ থাকতে পারে যে, শয়তান তো প্রত্যেক ঐ কাজেই সন্তুষ্ট হয়; যা মানুষকে মানুষ্যের স্তর থেকে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেয়। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের অনুসারীরা তাদের বন্ধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এ শয়তানী দলটির কার্যক্রম শুধু এতটুকুর ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এসকল যুবকদেরকে মদ এবং যুবতীদের মাধ্যমে এমন পাগল করা হয় যে, সে তা অর্জনের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আর তাই ইসরায়েলের গোপন এজেন্সি "মোসাদ, ব্রিটিশ M-15 এবং ডিক চেনির ব্লেক ওয়াটারের মত গোপন সংগঠনগুলো এদেরকে পয়সার বিনিময়ে কিলার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। শয়তানের আহবানগুলো বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রচার-প্রসার করা হচ্ছে। ফিল্ম, ড্রামা, টেলিভিশন এ্যাড এবং বিশেষত বাচ্চাদের কার্টুনেও শয়তানী চিহ্নগুলোকে পরিচিত এবং প্রিয় করে তুলা হচ্ছে।

সাইনবোর্ড এবং টেলিভিশন বিজ্ঞাপন...গোপন সংকেত

সড়কের সাইডে ব্যানার/সাইনবোর্ড, দোকানের সাইনবোর্ড এবং অন্যান্য এ্যাডসমূহে আপনি আশ্চর্য ও বিরল প্রকৃতির বাক্য লেখা দেখতে পাবেন, যা ঐ বিজ্ঞাপনের সাথে সম্পূর্ণ বেমানান। যেমন- সিগারেট কোম্পানীর একটি বিজ্ঞাপন, কিন্তু তাতে লেখা রয়েছে- "I am present and I am moving on "আমি বিদ্যমান রয়েছি এবং আমি তৎপর রয়েছি"। একটু চিন্তা করুন- বিজ্ঞাপনটি সিগারেটের, কিন্তু বাক্যটিতে কিসের ইঙ্গিত!!। অপর একটি সিগারেট কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে- was I am I will be "আমি গতকালও

ছিলাম, আজও আছি এবং আগামীতেও থাকব"

এগুলো বাস্তবে গোপন সংকেত বহন করছে, যা দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত। এমনিভাবে বিভিন্ন ঢংয়ে বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন সংকেতের মাধ্যমে মানুষের কাছে বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে। যেমন- উদীয়মান সূর্য, লেজবিশিষ্ট তারকার ছবি, দুষিত চোখ, লাল-নীল রং এবং ফিল্ম-গানের মাধ্যমেও এসকল বার্তা প্রেরণ করা হচ্ছে। আপনি যদি চিন্তা করেন- তবে আপনার মনে হবে যে, আপনি এক রহস্যময় পৃথিবীতে বাস করছেন। গোপন ইঙ্গিতসমূহ... গোপন বার্তাসমূহ...গোপন সংকেতসমূহ... চতুর্দিকে ভাসমান দেখা যাচ্ছে।

চলবে.............. (দ্বিতীয় খন্ড দ্রষ্টব্য)